গোয়েন্দাপীঠ

লালবাজার

২

স্টোনম্যানসহ এগারোটি রোমহর্ষক মামলার শেষকথা

সুপ্রতিম সরকার

কুট্টি আর কোকো-কে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার
এক ডজন খুনের রুদ্ধশ্বাস নেপথ্যকথা

•

স্বাধীনতা সংগ্রামে অচেনা লালবাজার
অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের রোমহর্ষক বীরগাথা

মুখবন্ধ

প্রথম দুটি বই বেস্টসেলার হওয়ার পর নিজের তৃতীয় বইটি লেখার সময় সুপ্রতিম কতটা চাপে ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, তবে এই বইটির মুখবন্ধে কী লেখা উচিত সেটা ভাবতে গিয়ে যেন হঠাৎই বেশি সচেতন হয়ে পড়েছি। যদিও খুব বেশিসংখ্যক মনোযোগী পাঠক মুখবন্ধ পড়েন না বলেই আমার দৃঢ় ধারণা, তবু, কোন মুখবন্ধ-লেখকই বা চান হংসমধ্যে বকযথা হয়ে থাকতে? তা ছাড়া, যে বইয়ের প্রভাব যতটা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার মুখবন্ধটি পাঠকের চোখে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে তুলনামূলক ভাবে বেশি। সে কারণেই এই লেখাটি লিখতে বসে বাড়তি সচেতনতা, সংগত উদ্বেগ।

সুপ্রতিমের লিখনশৈলী অবশ্য এতটাই সহজাত, আগের দুটি বইয়ের সাফল্য এবং পরবর্তীর প্রত্যাশা পূরণের কোনও চাপ এই বইটির লেখাগুলোয় চোখে পড়েনি আমার।

'গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার'-এর প্রথম খণ্ডের সার্থক উত্তরসূরি এই দ্বিতীয়টি, যাতে ধরা আছে কলকাতা পুলিশের মহাফেজখানা থেকে বেছে নেওয়া এগারোটি চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্যকথা। প্রথম খণ্ডের তুলনায় এবারের কাহিনিগুলি তুলনায় বেশি সাম্প্রতিক। পাঠক নিশ্চিত লক্ষ করবেন, এই খণ্ডে স্থান পাওয়া মামলাগুলির তদন্তপ্রক্রিয়ায় কীভাবে ধরা পড়েছে বদলে-যাওয়া সময়ের ছাপ, ধরা পড়েছে প্রযুক্তির প্রভাব।

প্রযুক্তির প্রসার আজকের দুনিয়ায় একদিকে যেমন প্ররোচনা দেয় দুঃসাহসিক অপরাধে, আবার রহস্যভেদে তদন্তকারীর হাতিয়ারও হয়ে ওঠে সেই প্রযুক্তিই, যার সৌজন্যে ন্যায়বিচারের পথটিও প্রশস্ত হয়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তদন্তপ্রক্রিয়ায় কতটা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে, তার সেরা উদাহরণ রয়েছে হাতের সামনেই। এ বছরেই ঘটে যাওয়া একটি নৃশংস খুন, যা সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা বিশ্বে। খুনটি একটি গোয়েন্দা সংস্থা করিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।

সৌদি আরবের সাংবাদিক জামাল খাসোগির হত্যার কথা বলছি, যিনি নিয়মিত লিখতেন 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকায়। খাসোগিকে শেষবার জীবিত দেখা গিয়েছিল তুরস্কে, সৌদি আরবের দূতাবাসে ঢোকার সময়। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর প্রেমিকা হ্যাটিস সেনগিজ। তুরস্কের নাগরিক হ্যাটিসের কাছে গচ্ছিত ছিল খাসোগির আই ফোন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র।

খাসোগি সৌদি দূতাবাস থেকে আর বেরিয়ে আসেননি। সৌদি আধিকারিকরা দাবি করেছিলেন, খাসোগি অন্য কোনও গেট দিয়ে দূতাবাসের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন।

খাসোগির মতো দেখতে একজন ইস্তাম্বুলের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সিসি টিভি ফুটেজও ঘটনার কয়েকদিন পর বাজারে ছেড়েছিলেন সৌদি অফিসাররা, কিন্তু তাতে এতটুকু চিঁড়ে ভেজেনি। সারা দুনিয়া অচিরেই জেনে গিয়েছিল খাসোগি-হত্যার চিত্রনাট্য। ঘটনার একদিন আগে রিয়াধ থেকে একটি বিশেষ বিমানে সৌদি সরকারের 'সিক্রেট সার্ভিস'-এর পনেরো সদস্যের একটি দল যে তুরস্কে এসেছিল, এবং খাসোগির দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে দেহাংশ পুড়িয়ে ফেলেছিল অ্যাসিড দিয়ে, সবই প্রকাশ্যে এসেছিল।

সত্যিটা প্রকাশ্যে আসত না প্রযুক্তি সহায় না হলে, চাপা পড়ে যেত সৌদি আরব আর তুরস্কের পারস্পরিক চাপান-উতোরে। খাসোগির অন্তর্ধানের রহস্যভেদ করেছিল তাঁরই ঘড়ি, তাঁরই ফোন। 'অ্যাপল'-এর ঘড়ি পরতেন খাসোগি। ব্যবহার করতেন আই ফোন। দূতাবাসে ঢোকার আগে খাসোগি ঘড়ির সঙ্গে নিজের ফোনকে 'কানেক্ট' করে নেন, প্রযুক্তি-সংযোগে যা এক সেকেন্ডের ব্যাপার। তারপর হাতের ঘড়িকে 'রেকর্ডিং মোড'-এ রেখে ঢোকেন দূতাবাসের ভিতরে। ফোন রেখে যান বাইরে অপেক্ষমাণ প্রেমিকার কাছে।

যিনি ফোনটি তুরস্কের আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন খাসোগি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার দিনকয়েক পরে।

বলা বাহুল্য, খাসোগির সঙ্গে দূতাবাসের ভিতরে যা যা ঘটছিল, যা যা কথোপকথন হচ্ছিল, সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল ফোনেও। খাসোগির মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ পরও সক্রিয় ছিল ঘড়িটি। খাসোগির জামাকাপড় সহ ঘড়িটিও অ্যাসিডে পুড়িয়ে ফেলার পরই তা নিষ্ক্রিয় হয়। খাসোগি-হত্যার অকাট্য প্রমাণ যখন প্রকাশ্যে আসে ফোনের রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে, সৌদি আরব হত্যার দায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং দাবি করে, খাসোগিকে খুনের সিদ্ধান্ত 'জুনিয়র লেভেল'-এর আধিকারিকরা নিয়েছিলেন।

কল্পনার ক্রাইম থ্রিলারে ব্যর্থতার স্থান নেই। সব মামলারই সমাধান হয়ে যায় সেখানে। বাস্তব আলাদা। সেখানে সাফল্যের গা ঘেঁষেই থাকে ব্যর্থতাও। এই বইয়ে আমাদের ব্যর্থতার কাহিনিও ঠাঁই পেয়েছে। সুপ্রতিম এই খণ্ডে 'স্টোনম্যান' মামলার কথা লেখায় খুশি হয়েছি। এই সূত্রেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই আর একটি 'সিরিয়াল-কিলিং' মামলার প্রতি, যা ঘটেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকো বে-তে।

আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। ১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বর দু'জন স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী গুলিতে খুন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেক হেরম্যান রোডে। এরপর কিছুদিনের মধ্যে আরও অন্তত তিনটি খুন হয় একই কায়দায়। সিরিয়াল-হত্যার এই মামলাগুলির নেপথ্যঘাতককে 'Zodiac Killer' নাম দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তামাম আমেরিকায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল খুনগুলি। 'Zodiac Killer'-কে নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কৌতূহলকে উস্কে দিতে তৈরি হয়েছে হলিউড ছবি, টিভি সিরিজ।

'Zodiac' সাংকেতিক ভাষায় পুলিশকে এবং সংবাদপত্রে চিঠিও পাঠাত। প্রথম চিঠিটির অর্থ বোঝা গেলেও দ্বিতীয়টির মর্মার্থ উদ্ধার করা যায়নি।

পুলিশ একটা পর্যায়ের পর মামলার তদন্ত থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছু নতুন তথ্য পাওয়ার পর, তদন্তপদ্ধতির প্রযুক্তিগত প্রসারের পর, মামলাটির তদন্ত নতুন করে শুরু হয় ২০০৪ সালে। 'Zodiac'-এর আসল পরিচয় অবশ্য এখনও অজ্ঞাত, এখনও তদন্তকারীরা চেষ্টা চালিয়ে যান সংকেত-সমাধানের। একটি চিঠিতে 'Zodiac' তার নিজের নামও সাংকেতিক ভাষায় জানিয়েছিল বলে দাবি করেছিল। পাঠকের হাতে তুলে দিলাম সেই বহুচর্চিত 'কোড', যার রহস্যভেদ আজও অধরা।

কলকাতা পুলিশও সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন করে 'স্টোনম্যান' মামলা নিয়ে ভাবনাচিন্তার, নতুন ভাবে তথ্যানুসন্ধানের। আশা করি, মামলাগুলির যৌক্তিক নিষ্পত্তির পথে এগোতে পারব আমরা।

এই বই পাঠকের মনে রোমাঞ্চ জাগাক।

২০ ডিসেম্বর, ২০১৮

রাজীব কুমার, আই. পি. এস
নগরপাল, কলকাতা

লেখকের কথা

একের পরে দুই। প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয়। 'গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার', আবার।

লেখকের দৃষ্টিকোণে ভাবলে, এ ধরনের সিরিজ লেখার ভাল-খারাপ দুইই আছে। ভাল এই, প্রথমটা পাঠকদের সমর্থন পেলে দ্বিতীয়তে হাত দেওয়ার ভরসা জোটে কিছুটা। উৎসাহ মাথাচাড়া দেয়, তা হলে দেখাই যাক লিখে। আর খারাপটা হল, আশঙ্কা। দ্বিতীয়টা যদি পাঠক-প্রশ্রয় না পায় প্রথমের মতো, অবচেতনে এই উদ্বেগ।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে শেষমেশ লিখে ফেলা গেল, দুই মলাটে বাঁধা পড়ল এগারোটি মামলার নেপথ্যকথা।

এই খণ্ডের মামলাগুলির সময়কাল বিস্তৃত ১৯৪৮ থেকে হালের ২০১০ পর্যন্ত। খুব পুরনো মামলা বলতে একটিই, ওই স্বাধীনোত্তর '৪৮-এর। বাকিগুলি গত তিন দশকের সময়সীমায়।

মামলাগুলি বাছার কাজটা সহজসাধ্য ছিল না, স্বীকার্য অকপটে। লালবাজারের মহাফেজখানায় মামলার সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। সমস্যা সংখ্যা নিয়ে নয়। সমস্যা শ'খানেক মামলার কেস ডায়েরি ঘেঁটে এমন ঘটনাগুলি বাছাই করা, যাতে বাস্তবের তদন্তপ্রক্রিয়ার অচেনা-অজানা দিকগুলোর সঙ্গে কিছুটা আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় রহস্যপিপাসু পাঠকের। কল্পনার রহস্যগল্পের সংকলন যেহেতু নয়, যেহেতু আদতে মামলাগুলির আখ্যান 'Police Procedural' শ্রেণিভুক্ত, তাই আজ এবং আগামীর তদন্তশিক্ষার্থীদের ভাবনার রসদ জোগানোর একটা দায়ও ছিল বাছাইপর্বে।

দায় ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের চরিত্রবদলের ছবিটাও তুলে ধরার। খুন-ডাকাতি-লুঠপাট বা পরিচিত ছকের চুরি-বাটপাড়িতে তো আর সীমায়িত নেই আজকের অপরাধের দুনিয়া। প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেহারা বদলেছে অপরাধের। বদলেছে প্রয়োগ-পদ্ধতি। বদলাচ্ছে রোজ।

সারা বিশ্বের পুলিশের কাছেই গত কয়েক দশকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে তর্কাতীতভাবে দেখা দিয়েছে 'সাইবার ক্রাইম'। গুলি-বন্দুক-ছুরি নিয়ে 'হা রে রে রে' জাতীয় ডাকাতির প্রয়োজন পড়ে না আজকের ই-মেল-হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক শাসিত পৃথিবীতে, হাতের কাছে যদি থাকে একটা ডেস্কটপ-ল্যাপটপ বা নিদেনপক্ষে একটা মোবাইল ফোন। মাউসের একটা ক্লিকে, মোবাইলের কি-প্যাডের খুচরো খুটখাটে দূরতম মহাদেশ থেকে আমার-আপনার মেল 'হ্যাক' হয়ে যেতে পারে যখন-তখন। নিমেষে লোপাট হয়ে যেতে পারে আজীবনের সঞ্চয়, হাতবদল হয়ে যেতে পারে আপনার যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য। প্রতারণার ফাঁদ পাতা ইন্টারনেটের ভুবনে। যাতে পা দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোজ বহু মানুষ অসাবধানতার মাশুল গুনছেন সর্বস্বান্ত হয়ে। পরিণতি, প্রযুক্তি-প্রহরা আজকের তদন্তকারীদের সিলেবাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার।

প্রযুক্তির উন্নতির সুবিধে-অসুবিধে, দুইয়ের সঙ্গেই এখন সংসার করতে হচ্ছে বাস্তবের ফেলু-ব্যোমকেশদের। নয়ের দশকের মাঝামাঝি ভারতে মোবাইল ফোন এসে যাওয়ার পর 'ইলেকট্রনিক সার্ভেল্যান্স'-এর মধ্যস্থতায় অনেক অপরাধের কিনারা যেমন সহজতর হয়েছে, মুদ্রার অন্য দিকটাও উপেক্ষার নয়। প্রযুক্তিপটু সাইবার-অপরাধীদের কথা ছেড়েই দিলাম, নেহাতই ছিঁচকে চোরের মনেও একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে মোবাইল ফোনের 'কল ডিটেলস রেকর্ডস' বা ' টাওয়ার লোকেশন'-এর ব্যাপারে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে পুলিশ যাতে নাগাল না পায়, সেই ফন্দিফিকিরের খোঁজে নিত্যদিন ব্যস্ত থাকছে অপরাধ জগতের চুনোপুঁটি থেকে রাঘববোয়ালরা। ফল? টি-টুয়েন্টির আবির্ভাব যেমন অনেকটাই বদলে দিয়েছে প্রথাসিদ্ধ

ক্রিকেটের ব্যাকরণ, তদন্তের সন্ধি-সমাসও তেমন অনেকাংশে পালটে দিয়েছে সাইবারস্পেস। দেশের ইতিহাসে অন্যতম চাঞ্চল্যকর সাইবার-অপরাধের একটি কাহিনির অন্তর্ভুক্তি তাই এই বইয়ে একরকম অনিবার্যই ছিল। যেমন অনিবার্য ছিল সূচিপত্রে স্টোনম্যান মামলার ঢুকে পড়া। বহু জটিল মামলার সমাধান যেমন কলকাতা পুলিশকে 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' অভিধা দিয়েছে, পাশাপাশি কিছু কেস তো রয়েইছে, যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছি আমরা সর্বস্ব উজাড় করে ঝাঁপানো সত্ত্বেও। যে তালিকায় নিঃসংশয় শীর্ষবাছাই স্টোনম্যান মামলা। যা নিয়ে কৌতূহলের জোয়ারে এতটুকু ভাটা পড়েনি ঘটনার ত্রিশ বছর পরেও। যা ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল, প্রামাণ্য বিবরণ থাকল এই খণ্ডে।

যাঁর উৎসাহ ছাড়া এই বই পাঠকের কাছে পৌঁছনো অসম্ভব ছিল, তিনি কলকাতার নগরপাল শ্রীরাজীব কুমার। যাঁকে অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতাই জানাতে পারি শুধু। পারিবারিক দায়িত্ব একপ্রকার বিসর্জন দিয়েই বিনিদ্র রাতের লেখায় শর্তহীন সমর্থন পেয়েছি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার। ধন্যবাদ দেওয়ার সম্পর্ক নয়। দিলাম না।

এর বেশি আর কী লেখার? মৌলিকতার ন্যূনতম দাবি নেই এই বইয়ের। যা আছে, দ্বিমুখী উদ্দেশ্য। এক, গ্রন্থিত রাখা গোয়েন্দাপীঠ লালবাজারের রহস্যভেদের ঐতিহ্য। দুই, তদন্তপথের কিছু দিকনির্দেশ লিপিবদ্ধ রাখা ভাবীকালের স্বার্থে।

উদ্দেশ্য আদৌ কিছুমাত্র সাধিত হল কি না, বিচার পাঠকের। দিনের শেষে পাঠকই পরম।

১ জানুয়ারি, ২০১৯
কলকাতা

সূচিপত্র

ডক্টর জেকিল, না মিস্টার হাইড?

—'কেয়া ফেকতা হ্যায় বাবু? কেয়া ফেকতা হ্যায়?'

দৃশ্যটা দেখে সহসা থমকে গিয়েছিলেন ত্রিলোচন। কম দিন তো হল না এ তল্লাটে। এই জায়গাটা বরাবরই নির্জন। আজ যেন একটু বেশিই শুনশান, হাঁটতে হাঁটতেই মনে হয়েছিল ত্রিলোচনের। গত রাতের তুলকালাম বৃষ্টির জন্য? লোক একটু কম যেন? অন্তত অন্যদিনের তুলনায়?

দক্ষিণ কলকাতার বহুপরিচিত সরোবর-প্রাঙ্গণ। সাধারণের কথ্যভাষায়, লেক। যেখানে দৈনিক প্রাতঃভ্রমণে আসেন নগরবাসীরা। যাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদের সাক্ষী থাকাটা একরকম অভ্যাসেই পরিণত হয়েছে ত্রিলোচনের।

সেই সময়ের ঢাকুরিয়া লেক

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে লেক এলাকার নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিটা পেয়েছিলেন। সেই থেকে একই রুটিন দৈনন্দিন। সূর্য আড়মোড়া ভাঙতে না ভাঙতেই বেরিয়ে পড়া, লেকের বিস্তীর্ণ এলাকায় পাক দেওয়া পদব্রজে। দিনের পর দিন একই কাজ একই রাস্তায় বছরের পর বছর করে গেলে যা হয়, চোখ বেঁধে দিলেও এই রোজকার টহলদারি মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না, জানেন ত্রিলোচন।

যেখানে থমকে গেলেন ত্রিলোচন, সেই জায়গাটা লেকের এক প্রান্তে। এই সীমা পর্যন্ত খুব স্বল্পসংখ্যক হাতেগোনা মানুষই আসেন। বস্তুত, সচরাচর কেউ আসেনই না এতদূর। সংগত কারণ ছিল ত্রিলোচনের অবাক হওয়ার। উনি কে? ওই ভদ্রলোক? বেঞ্চে বসেছিলেন এক মহিলার পাশে। হঠাৎ উঠে এদিক-ওদিক তাকালেন, হাতে একটা বড় চটের ব্যাগ নিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন লেকের ধারে। ফের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন চারপাশে।

ব্যাগটা ফেলতে যাচ্ছেন জলে? ভদ্রলোক ওভাবে চারদিক দেখছেন কেন? উদ্বেগ কেন এত চোখেমুখে? কী ফেলতে যাচ্ছেন? কী আছে ব্যাগে? ত্রিলোচন থমকান দেখে। সন্দেহ হয়। হাঁক দেন বাজখাঁই গলায়, 'কেয়া ফেকতা হ্যায় বাবু, কেয়া ফেকতা হ্যায়?'

'ওরে বাবা দেখ চেয়ে, কত সেনা চলেছে সমরে!'

এ দৃশ্য আগে দেখেছে কলকাতা? স্রেফ একটা মামলার জন্য এহেন যুদ্ধং দেহি সাজ? টগবগ টগবগ ধ্বনি আলিপুর আদালতের সামনের রাস্তা জাজেস কোর্ট রোডে। ঘোড়াপুলিশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজপথে। সন্ত্রস্ত পথচারীরা দেখছে নিরাপদ দূরত্ব থেকে। পুলিশের গাড়ি এসে থামছে একে একে। আদালত প্রাঙ্গণে 'পজিশন' নিচ্ছেন উর্দিধারীরা। আজ রায় ঘোষণা হবে। 'জাজমেন্ট ডে'।

'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা এজলাসে। বাইরের রাস্তাও জনাকীর্ণ। আরও অনেকে ঢুকতে চান, দেখতে চান, শুনতে চান। কোর্ট চত্বরের মূল প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। লালবাজারের তরফে পূর্ণাঙ্গ পুলিশি বন্দোবস্ত করা হয়েছে শ'য়ে শ'য়ে উৎসাহী জনতাকে দূরবর্তী রাখতে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নেহাতই স্বল্পপরিসরের ওই এজলাস, অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া মানে অনর্থকেই আমন্ত্রণ।

তর সইছে না জনতার। সত্যি কথা বলতে, পুলিশেরও। আর কত দেরি? যখন বিচারক পড়তে শুরু করলেন দীর্ঘ রায়, অনন্ত অপেক্ষার পর যখন পৌঁছলেন শাস্তিদানের অনুচ্ছেদে, এজলাসের দখল নিয়েছে

পিনপতন নীরবতা। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর।

'Taking into account the facts and circumstances of the case...'

এ কাহিনি প্রায় সত্তর বছর আগের। সন ১৯৪৮, স্বাধীনতার সঙ্গে তখনও আলাপ-পরিচয়ের পর্ব চলছে দেশের।

রহস্যভেদের রোমান্স-রোমাঞ্চ অমিল এ আখ্যানে। তবু আলোচ্য মামলার মতো চাঞ্চল্যকর এবং বহুচর্চিত কেস এদেশের অপরাধ-ইতিহাসে খুব বেশি নেই।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা অশীতিপর, তাঁদের স্মরণে থাকলেও থাকতে পারে এই মামলা। স্মরণে থাকতে পারে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সমসাময়িক জল্পনা-কল্পনা-চর্চার তীব্রতা। শুধু সমসময়ই বা লিখি কেন, দেশের বিভিন্ন পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আজও যখনই আলোচিত হয় স্বাধীনোত্তর যুগের সাড়া-জাগানো মামলাগুলির ইতিবৃত্ত, অবধারিত উল্লেখিত হয় সাত দশক আগের এই ঘটনা।

সমস্যা হল, মামলার বিস্তারিত নথিপত্রের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে সময়ের প্রকোপে। একাধিক অফিসার বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্তের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যাঁদের কয়েকজনের নাম নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। যতটুকু জানা যায় এই মামলা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় পদস্থ অফিসারদের লেখালেখি থেকে, যতটুকু উদ্ধার করা যায় শতচ্ছিন্ন কেস ডায়েরির হলুদ হয়ে-আসা পাতাগুলির পাঠযোগ্য অংশ থেকে, পেশ করলাম।

কৃষ্ণহরি শর্মা। বয়স যখন কুড়ি, দার্জিলিং জেলার আর্মড পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন তারও বছর তিনেক পরে। যশোদাদেবীকে। এই দম্পতির তিন সন্তান। দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড়মেয়ের নাম মণি। ছোটমেয়ে বেলা। সবার ছোট হল অমল।

দীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যভাগে কৃষ্ণহরিকে গ্রাস করল বিবিধ রোগব্যাধি। ১৯৪১-এ যখন মারা গেলেন, বড়মেয়ে মণি তখন একুশ বছরের সুন্দরী যুবতী। দার্জিলিংয়ে কলেজের পাট চোকার পর নার্সিং কোর্সে ভরতি হয়েছেন সদ্য। ছোটমেয়ে বেলা তখন উনিশ। অমলের সবে ষোলো পেরিয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন যশোদা। কলকাতায় যশোদার এক বোন থাকতেন। নাম ডলি। যাঁর বিয়ে হয়েছিল কিরণ দে নামের এক বঙ্গসন্তানের সঙ্গে। সম্ভ্রান্তবংশীয় কিরণ পদস্থ চাকুরে ছিলেন। সানন্দে আশ্রয় দিয়েছিলেন যশোদা এবং তাঁর তিন সন্তানকে। অমল এবং বেলা কলকাতার কলেজে ভরতি হল। মণির নার্সিং-এর পড়াশুনো চালু হল নতুন উদ্যমে। বঙ্গীয় জীবনধারার সঙ্গে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন যশোদা। মণি-বেলা-অমলও।

নিরুদ্বেগ জীবন কাটল কয়েক বছর। উদ্বেগের সূত্রপাত হল ১৯৪৬ সালে, যখন অমলের ফুসফুসে ধরা পড়ল যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ। যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসায় অমলের কিছুটা স্বাস্থ্যোদ্ধার হওয়ায় যশোদা কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু সে স্বস্তি স্থায়ী হল স্বল্পকালই। '৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বেঘোরে প্রাণ হারালেন কলেজপড়ুয়া অমল। একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে যশোদা সাময়িক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মণি এবং বেলা আপ্রাণ শুশ্রূষায় ক্রমে স্বাভাবিকতায় ফেরালেন মা-কে।

যশোদাদেবী

মণি

বেলা

যশোদার বোন ডলি এর কিছুদিন পরেই মারা গেলেন মাত্র সপ্তাহখানেকের জ্বরে। মানসিকভাবে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন যশোদা। ডলির স্বামী কিরণ আদ্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। মুখে কখনও কিছু বলেননি, তবে ডলির মৃত্যুর পর আশ্রিতা হয়ে সপরিবারে তাঁর বাড়িতে বসবাস করার অস্বস্তি ক্রমে গ্রাস করল যশোদাকে। কিন্তু গেলেও যাবেনই বা কোথায়? কে জায়গা দেবে সপরিবারে দুই মেয়েকে নিয়ে থাকার? বাড়ি ভাড়া করে থাকার মতো আর্থিক সংগতি নেই। নিরুপায় আশ্রিতার দিনগত পাপক্ষয়কেই ভবিতব্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী আর?

'৪৬ সালেরই শেষ দিকে আলিপুর মিলিটারি হাসপাতালে নার্সের চাকরি পেলেন মণি। বেতন ভদ্রস্থ। যশোদা ভাবলেন, মানসিক কষ্ট কমাটা দুষ্কর, অন্তত অর্থকষ্টটা এবার কিছুটা কমবে।

মিলিটারি হাসপাতালে ইএনটি বিভাগে নার্স হিসাবে নিযুক্ত হলেন মণি। ওই বিভাগের দায়িত্বে তখন মেজর রোশনলাল সিং। মণি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়লেন আপাদমস্তক, রোশনলালের চোখে দেখলেন নিজের সর্বনাশ।

দোষ দেওয়া যায় না মণিকে। একটা অমোঘ আবেদন ছিল রোশনলালের ব্যক্তিত্বে, যার চৌম্বকীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করা কঠিন হত মেয়েদের পক্ষে। কাহিনি আরও অগ্রসর হওয়ার আগে, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই রোশনলালের সঙ্গে।

রাজা রোশনলাল সিং সুয়েজভান— পুরো নাম। কাশ্মীরের মহারাজা সুয়েজভান সিং-এর বংশজাত। বরাবরই প্রখর মেধাবী। সসম্মানে ডাক্তারি পাশ করার পর যুবক রোশনলাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোগ দিয়েছিলেন Indian Army Medical Corps-এ। অসামান্য কর্মদক্ষতা পথ সুগম করেছিল দ্রুত পদোন্নতির। ডাক্তার রোশনলাল মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে। কলকাতার আলিপুরে সেনাবাহিনীর হাসপাতালে E. N. T. বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

রোশনলালের চরিত্রের কাটাছেঁড়ায় মনে পড়তে বাধ্য ১৮৮৬ সালে রচিত রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের সেই কালজয়ী উপন্যাস, 'Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde'।

Dr. Henry Jekyll, শান্ত, ধীরস্থির, হৃদয়বান এক চিকিৎসক। যিনি দিনের বেলায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু এক রাসায়নিক তরলের প্রভাবে রাত্রিবেলা জেগে ওঠে যাঁর অন্য সত্তা। Dr. Jekyll হয়ে ওঠেন Mr. Edward Hyde, যিনি স্বভাবে-আচারে-আচরণে Dr. Jekyll-এর সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে। নৃশংস-বিবেকবর্জিত-দয়ামায়াহীন এক খুনি। একই মানুষ, দ্বৈত সত্তা।

রোশনলালও ছিলেন তা-ই। এক গবেষণাযোগ্য চরিত্র। একই অঙ্গে দ্বৈত রূপ। দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার তরুণ ডাক্তার। সুদর্শন। চশমার পিছনে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। চলনে-বলনে-পোশাকে-আশাকে দৃশ্যমান, রাজরক্ত বইছে এই লোকটির শরীরে।

এক একজন থাকেন, যে-কোনও সামাজিক সমাবেশে হাজির হলেই সব আলো কেড়ে নেন অবলীলায়। রোশনলাল ছিলেন সেই গোত্রের। সাহিত্য বলুন বা বিজ্ঞান, দর্শন বলুন বা নৃতত্ত্ব, যে-কোনও বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল প্রশ্নাতীত। যখন কথা বলতেন মার্জিত বাচনভঙ্গিতে, লোকে শুনত মন্ত্রমুগ্ধ। যখন রোগীর চিকিৎসায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে হাসপাতালে কাটিয়ে দিতেন রাতের পর রাত, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম কুড়িয়ে নিতেন অনায়াসে।

নিজের লেটারহেডে ছাপিয়ে রেখেছিলেন, 'Worship God by servicing the ailing humanity'। দুঃস্থ মানুষকে দানধ্যান করতেন নিয়মিত। মদ-সিগারেটের সঙ্গে কোনওরকম সংস্রব ছিল না নিত্যদিন পূজাপাঠ করা রোশনলালের। হুবহু ড. জেকিল। যাঁর প্রেমে না পড়ে উপায় ছিল না মণির। জানতেন না প্রেমিকপুরুষের দ্বৈতসত্তার কথা। যখন জেনেছিলেন, দেরি হয়ে গিয়েছিল বিস্তর।

মণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল রোশনলালের। মানসিক এবং শারীরিক। '৪৬-এর ডিসেম্বরে মণি সন্তানসম্ভবা হলেন। এবং রোশনলালকে বললেন, 'এবার বিয়েটা করে নেওয়া দরকার।' যখন বলেছিলেন, জানতেন না

রোশনলালের গোপন করে যাওয়া দুটি তথ্য। এক, রোশনলাল বিবাহিত। স্ত্রী-র নাম কৌশল্যা। দুই, ওঁদের একটি পুত্রসন্তানও বর্তমান। নাম, সুদর্শন কুমার।

বধূবেশে মণি

মণির বিবাহ-প্রস্তাবে রোশনলাল রাজি হলেন এক কথায়। নির্দিষ্ট দিনে এক বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন মণিকে নিয়ে। এক পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, সাক্ষী রইল অগ্নিকুণ্ড। মণি যারপরনাই অবাক হলেন বৈবাহিক ক্রিয়াকর্মের রীতিনীতিতে। আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে আশৈশব দেখে এসেছেন হিন্দু ধর্মমতে বিয়ের পরিচিত আচারবিধি। এ তো আলাদা সম্পূর্ণ!

রোশনলাল স্মিতহাস্যে জানালেন, হিন্দুমতে বিবাহের আয়োজন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ব্যয়বহুলও। তার চেয়ে আপাতত এই ভাল। আর্যসমাজ মতে এভাবেই হয় বৈবাহিক প্রক্রিয়া। মণি তখন মোহাচ্ছন্ন রোশনলালের প্রেমে। প্রিয়তম পুরুষের প্রতি সন্দেহের ন্যূনতম অবকাশই নেই।

মণি যখন প্রশ্ন করলেন বিয়ের আইনসিদ্ধ রেজিস্ট্রি নিয়ে, রোশনলাল ফের সহাস্যে বললেন, 'ওটা তো যে-কোনওদিন করে নেওয়া যাবে। সত্যি বলো তো, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?' আবেগবিহ্বল মণি আনন্দাশ্রু ব্যয় করলেন কিছু। সমর্পণ সম্পূর্ণ হল।

৪/ডি, মতিলাল নেহরু রোডের সেই চারতলা বাড়ি

পরের বছর, '৪৭-এ জন্ম হল রোশনলাল-মণি-র শিশুপুত্রের। নাম রাখা হল মুন্না। '৪৮-এ ফের গর্ভবতী হলেন মণি। এবার কন্যাসন্তান। মুন্নি। '৪৭-এর মাঝামাঝি রোশনলাল ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন ৪/ডি মতিলাল

নেহরু রোডে একটি বাড়ির চারতলায়। যশোদা-মণি-বেলা উঠে এলেন দেশপ্রিয় পার্কের থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের

সেই ফ্ল্যাটে। পরাশ্রিত থাকার থেকে মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে দিনাতিপাতই শ্রেয়তর মনে করলেন যশোদা।

রোশন-মণির সম্পর্কে চিড় ধরা শুরু দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কিছুকাল পর থেকে। মণির সঙ্গে রোশনলাল ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন স্রেফ শরীরী আকর্ষণে। মন ছিল বহু আলোকবর্ষ দূরে। আর্যসমাজ মতে বিয়ের ছদ্মচিত্রনাট্য সাজিয়েছিলেন মণি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায়।

মানসিক সংযোগ না থাকলে 'আদিম রিপু'-র তাড়না একটা সময় স্তিমিত হয়ে আসেই। শরীরী মোহ কাটিয়ে ওঠার পরই নিজমূর্তি ধরলেন রোশনলাল। বদলির নির্দেশ এল রাঁচির নামকুম হাসপাতালে। মণি এবং দুই সন্তানকে নিয়ে পাড়ি দিলেন রাঁচি। যেখানে অন্য রোশনলালকে চিনতে শুরু করলেন মণি। যিনি আর ডক্টর জেকিল নন। সর্বার্থেই মিস্টার হাইড।

প্রতি পদে রোশনলাল বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, মাঝে মাঝে শরীরী চাহিদা মেটানোর ভোগ্যবস্তুর বেশি মর্যাদা তিনি মণিকে দিতে নারাজ। মণি যখনই বিয়ের রেজিস্ট্রির কথা তুলতেন, নির্বিচার গালিগালাজ করতেন রোশনলাল। সমাজের চোখে সুভদ্র হিসাবে পরিচিত ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে অকথা-কুকথার বন্যা বয়ে যেত। কথায় কথায় মণির গায়ে হাত তোলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল রোশনলালের। একটা পর্যায়ের পর মণি বুঝে গিয়েছিলেন, বিবাহিতা স্ত্রী-র স্বীকৃতি পাবেন না কোনওদিনই। কানাঘুষোয় শুনতেন অন্য একাধিক নারীর সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতার কথা। এমনও হত, রাতের পর রাত বাড়িই ফিরতেন না রোশনলাল। প্রশ্ন করলে বরাদ্দ থাকত উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্য।

বিনিদ্র রাতে মণি চোখের জল ফেলতেন আর ভাবতেন, কী পরিচয়ে তা হলে দিন কাটাচ্ছেন রোশনলালের সঙ্গে? সোজা বাংলায়, রক্ষিতাই তো! জীবন কি এ ভাবেই কাটবে, অবহেলা-অনাদর-

অত্যাচারের গ্লানি মুখ বুজে সহ্য করে? ছেলেমেয়ে এখনও দুধের শিশু। তাদের পরিচর্যার দায়িত্ব সামলে নার্সের চাকরির চেষ্টা করাটাও অসম্ভবের পর্যায়েই। আরও অসম্ভব, কারণ, এরই মধ্যে ফের সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছেন।

পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা মণি দাঁতে দাঁত চেপে তবু মেনে নেওয়ার এবং মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছিলেন। এবং হয়তো করেই যেতেন, যদি না এক সন্ধেয় হঠাৎই দেখে ফেলতেন ওঁদের দু'জনকে।

বেশ কয়েক মাস ধরে পাওলিন নামের এক অতীব সুন্দরী মহিলার গলার সংক্রমণের চিকিৎসা করছিলেন রোশনলাল। রাঁচির টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অপারেটরের কাজ করতেন তেইশ বছরের পাওলিন। মাঝেমধ্যে রোশন-মণির ফ্ল্যাটেও আসতেন। মুন্না-মুন্নির জন্য উপহার আনতেন। রান্না করেও আনতেন ভালমন্দ।

এমনই এক সন্ধেয় এসেছেন পাওলিন। ঘণ্টাদুয়েক গল্পগুজবের পর বেরলেন। রোশনলাল কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলেন পাওলিনকে। বেশ কিছুক্ষণ পরও যখন ফিরলেন না, কৌতূহলবশত মণি বাইরের ঘরের জানালায় চোখ রাখলেন। এবং আধো অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝলেন, কোয়ার্টারের গেটের কাছে রোশনলাল আর পাওলিন পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ। দু'জনের ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান অন্তর্হিত।

সে-রাতে বাদানুবাদ হল রোশন-মণির। একটা সময় রোশনলাল নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'পাওলিন আমার বোনের মতো। ভাই-বোনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ায় দোষের কিছু নেই। নিজের মান্ধাতার আমলের চিন্তাভাবনা বদলাও।'

স্বামীর এহেন ব্যাখ্যায় বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন মণি। পরনারীতে রোশনলালের আসক্তির ব্যাপারে আন্দাজ করতেন মণি, সন্দেহও। কিন্তু নিজের ফ্ল্যাটের চৌহদ্দির মধ্যেই যখন চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন ঘটল, মণি মনস্থির করে ফেললেন।

পরের দিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে রওনা দিলেন কলকাতায়। উঠলেন মতিলাল নেহরু রোডের সেই ভাড়ার ফ্ল্যাটে, যেখানে যশোদাদেবী বসবাস করতেন ছোটমেয়ে বেলার সঙ্গে। মণির মুখে সব শুনলেন যশোদা। অদৃষ্টকে দোষারোপ আর অশ্রুপাত ছাড়া কী-ই বা করার ছিল প্রৌঢ়ার?

কূটবুদ্ধির অভাব আছে, রোশনলালের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তাঁর চরম শত্রুর পক্ষেও করা অসম্ভব ছিল। মণি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর ছক কষলেন বরফশীতল মস্তিষ্কে। অসম্ভব ইমেজ-সচেতন মানুষ ছিলেন রোশনলাল। জানতেন, মণি যদি তাঁর কীর্তিকলাপের ব্যাপারে আলোচনা করেন পরিচিত মহলে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে আঁচড় পড়তে পারে। তাই মণির আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আপাতত প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলেন। দুটো চিঠি লিখলেন মণিকে। পাঁচ দিনের ব্যবধানে। অগস্টের ১৪ এবং ১৯ তারিখে। যা লিখলেন, তুলে দিচ্ছি অংশবিশেষ।

১৪.০৮.৪৮

'প্রিয়তমা মণি,

... তুমিই আমার জীবন, আমার সব কিছু। তুমি আমাকে চিঠি লিখছ না কেন? তোমার চিঠি না পেলে আমার নিজেকে শূন্য মনে হয়। ডার্লিং প্লিজ়, এবারের মতো আমায় মাফ করে দাও। দেখবে, আমি অনেক বদলে গেছি। ভুল বুঝো না আমায়। তোমার কোনওরকম ক্ষতি হয় এমন কাজ আমি কখনও করব না। মন থেকে প্লিজ় সমস্ত সন্দেহ দূর করে দাও... দেখবে আমরা আগের মতো সুখী জীবন কাটাতে পারব। আমাদের তৃতীয় সন্তান কিছুদিন পরেই পৃথিবীতে আসতে চলেছে। অন্তত তার কথা ভেবে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝিকে চলো মুছে ফেলি আমরা...

তোমার রোশন'

১৯.০৮.৪৮

‘ডার্লিং,

...তোমাকে আমি আর কতবার বলব যে আমি তোমাকে মিথ্যে বলার কথা ভাবতেও পারি না। আমি তোমাকে কখনও ঠকাব না। আমি তোমাকে ভালবাসি... এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালবাসব।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে বিয়েতে রেজিস্ট্রিটাই সব? বিয়ের আসল জিনিস তো ভালবাসা। রেজিস্ট্রি বিয়েতে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, ডিভোর্স করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার যে বিয়ে, তাতে কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না। আমার কথাগুলো মন দিয়ে ভেবে দেখো।

তোমারই রোশন’

এই কুম্ভীরাশ্রুতে যে বিশেষ বরফ গলছে না, বুঝতে পারছিলেন রোশনলাল। একটি চিঠিরও উত্তর দিচ্ছিলেন না মণি। এবং উদ্বেগ বাড়ছিল রোশনলালের। সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতায় আসার। রাঁচির সেনা হাসপাতালের চাকরিটা ছাড়লেন। কলকাতায় এসে যোগ দিলেন লেক মিলিটারি হাসপাতালে। উঠলেন হাসপাতালের নির্দিষ্ট কোয়ার্টারেই। কলকাতায় পৌঁছনোর সন্ধেতেই গেলেন মতিলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটে মণির সঙ্গে দেখা করতে। এবং বুঝলেন, যা আশঙ্কা করছিলেন, সত্যিই। এ মণি আর সেই মণি নয়, যিনি স্বামীর মিষ্টি কথার জাদুতে আগের মতো মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বেন।

রোশনলালের প্রতি মণির ভালবাসা ছিল নিখাদ। স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গে চিন্তাতীত আঘাত পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সে আঘাত মণির মানসিক কাঠিন্যের বুনিয়াদ অনেকটাই পোক্ত করে দিয়েছিল। রোশনলালকে বললেন, প্রায় তিন বছর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একত্রে বসবাসের পর, দুই সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর এবং তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার পরও যদি বিয়েকে আইনি বৈধতা দেওয়া নিয়ে এতটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন রোশনলাল, তা হলে তো এই সম্পর্কের কোনও মানেই দাঁড়ায় না। পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অনাচারের বিচার চাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না আর। নিজের মানসম্মানের দায়িত্ব তখন রোশনলালকে নিজেকেই নিতে হবে।

রোশনলাল সব শুনলেন চুপ করে। এই প্রথম স্বামীর শরীরী ভাষায় অনুতাপের চিহ্ন দেখলেন মণি। দেখলেন, চোখ আর্দ্র হয়ে এসেছে রোশনলালের। মণিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ‘বেশ, তুমি যা চাইছ, তা-ই হোক। এতে যদি তুমি শান্তি পাও, তবে তা-ই হোক। আমি রেজিস্ট্রেশনের দিনক্ষণ ঠিক করছি। কাশ্মীরের বাড়িতে আজই টেলিগ্রাম করব। আমাদের রাজবাড়িতেই রেজিস্ট্রেশন হবে বিয়ের। তারপর ধুমধাম করে অনুষ্ঠান। তুমি শুধু আমাকে আগের মতোই ভালবেসো।’ শোনামাত্র মণি কেঁদে ফেললেন স্বামীর বুকে মাথা রেখে। প্রেম বড় বিষম বস্তু।

রোশনলাল

রোশনলাল ভক্তিনিষ্ঠ প্রণাম করলেন শাশুড়িকে। চোখের জল বাধা মানল না যশোদারও। দিদির মানসিক কষ্টের অবসানের সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বেলাও।

দিনক্ষণ স্থির হল কাশ্মীর যাওয়ার। মণি যখন মা-কে প্রণাম করে বেরচ্ছেন রোশনলালের সঙ্গে, যশোদাদেবী ঘোরতর দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, মেয়ের সঙ্গে এই তাঁর শেষ দেখা।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে রোশনলাল মণিকে বললেন, ‘চলো দু’-একদিনের জন্য পুরী ঘুরে আসি। সেখান থেকে কাশ্মীর যাব।’ হঠাৎ এই প্ল্যান পরিবর্তন? জানতে চাইলেন মণি। রোশন হাসলেন, ‘তুমি কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমরা কোথাও কখনও একসঙ্গে বেড়াতে যাইনি। তাই ভাবলাম, দু’দিন সমুদ্রের ধারে একটু সময় কাটাই দু’জনে। আমি তোমাকে সারপ্রাইজ় দিতে চেয়েছিলাম। তুমি রাজি হবে না জানলে টিকিট কাটতাম না।’

মণি রাজি হলেন রোশনের কথায়। সন্দেহ হয়েছিল কি কিছু? হয়তো হয়েছিল। তবু রাজি হয়েছিলেন,

বহুকাঙ্ক্ষিত রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে পাছে মত বদলান রোশন, সেই আশঙ্কাতেই সম্ভবত। ট্রেনে উঠে বসলেন দু'জনে।

পুরী। আজকের পুরীর সঙ্গে সে-কালের পুরীর তফাত ছিল আকাশপাতাল। শহরের যত্রতত্র হোটেল গজিয়ে ওঠেনি গায়ে গা লাগিয়ে। হরেক পশরা সাজিয়ে তট বরাবর মাথা তোলেনি অসংখ্য দোকানপাট। পর্যটকদের ভিড়ে তখন অষ্টপ্রহর থইথই করত না সমুদ্রতট। নির্জনতাই নিরঙ্কুশ।

সমুদ্রের ধারেই একটি সাদামাটা ছিরিছাঁদহীন হোটেলে ঘর ভাড়া নিলেন রোশনলাল। হোটেলের রেজিস্টারে মিথ্যে নাম-ঠিকানা লিখলেন নিজের আর মণির।

সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসে সন্ধেটা দিব্যি কাটল দু'জনের। হোটেলে ফেরার আগে রোশন প্রস্তাব দিলেন, 'চলো, একটু হেঁটে আসি।'

মণি তখন আট মাসের গর্ভবতী। বালিপথ ধরে হাঁটাহাঁটির ইচ্ছে ছিল না বিশেষ। তবু রোশনকে বিমুখ করতে মন চাইল না। স্বামীর হাত ধরে ধীরপায়ে হাঁটা দিলেন। যখন ফিরে আসছেন, পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে তীব্র। রোশন যন্ত্রণাকাতর স্ত্রী-কে ভরসা দিলেন, 'এ সময় এমন হয়। এই অবস্থায় এতটা না হাঁটলেই বোধহয় ভাল হত। আমারই দোষ। যাক গে, চিন্তা কোরো না। স্বামী যখন ডাক্তার, চিন্তা কীসের? হোটেলে ফিরেই ব্যথা কমার ওষুধ দিচ্ছি।'

ওষুধ দিলেন রোশনলাল। ডাক্তারি ব্যাগ থেকে বার করলেন ইনজেকশন। বিছানায় শুয়ে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন মণি, 'কই, ওষুধটা দাও, খুব কষ্ট হচ্ছে!' মণির হাতে সূচ ফোটালেন রোশনলাল। সূচ বেয়ে তরল প্রবেশ করল মণির শরীরে। ছড়িয়ে গেল শিরা-উপশিরায়। মরফিয়া!

রোশনলাল মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মণির, 'ওষুধ পড়েছে, দেখো এবার, যন্ত্রণা কমবে। ঘুম এসে যাবে।'

ঘুম এল মণির। গভীর ঘুম। রোশনলাল নিজের গলার স্কার্ফটা খুললেন। পেঁচিয়ে ধরলেন ঘুমন্ত মণির গলায়। সর্বশক্তি দিয়ে। শ্বাসরোধ করে খুন। একটা নয়, দুটো। মণির গর্ভস্থ সন্তানের দিনের আলো দেখার সময় তো হয়েই এসেছিল প্রায়।

রাত বাড়তে মণির দেহ একটা বেডশিটে মুড়ে বেরলেন ঘর থেকে। নিরাপত্তারক্ষীর বালাই থাকে না এসব সস্তার হোটেলে। অর্ধেক ঘরও খালি পড়ে থাকে। কেউ কারও খোঁজ রাখে না। নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন গেট দিয়ে, দেহ পুঁতে দিলেন সমুদ্রতটে বালির স্তূপের নীচে। যেটা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন বিকেলেই। মণির স্লিপার, চুড়ি, মুক্তোর নেকলেস এবং ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ফেলে দিলেন হোটেল-সংলগ্ন একটা মজে যাওয়া কুয়োয়।

ফিরে এলেন ঘরে, এবং নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন হোটেল থেকে। রাত তখন সোয়া তিনটে। কোনও সাক্ষী থাকল না গভীর রাতের অন্তর্ধানের। সমুদ্র ছাড়া কে-ই বা জেগে থাকে ওই নিশুত রাতে?

রোশনলাল ফিরে এলেন কলকাতায়। মতিলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটে গেলেন তারও সপ্তাহখানেক পরে। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে না দেখে যশোদা অবাক, 'ভালয় ভালয় সব মিটে গেছে তো? মণি কই?'

—ওকে কাশ্মীরেই রেখে এলাম কিছুদিনের জন্য।

—কেন?

রোশনলাল বোঝানোর চেষ্টা করলেন যশোদাকে, যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় ফিরিয়ে আনবেন মণিকে। বললেন, বিয়ের পর নববধূর মুখই দেখেননি তাঁর মা। তা ছাড়া মায়ের শরীরটা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। গিয়েই চলে এলে বড় বিসদৃশ দেখায়। শত হোক, রাজকুলবধূ, সামাজিকতারও দায় থাকে একটা। দায় থাকে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচিতির।

দিনের পরে দিন যায়। সপ্তাহ যায়। আশঙ্কা আর অস্বস্তি ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছিল যশোদার।

একদিন রোশনলালকে চেপে ধরলেন, ‘মণিকে নিয়ে এসো এবার। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।’

—আর সপ্তাহখানেক পরে কাজের চাপ কমলেই নিয়ে আসব। আপনি অযথা চিন্তা করছেন। আমাদের বাড়িতে আপনার মেয়ের কোনও অযত্ন হবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

নিশ্চিন্ত থাকতে বললেই কি আর থাকা যায়? যশোদা পালটা প্রশ্ন করলেন, ‘বেশ তো, কিন্তু চিঠি লিখছে না কেন? এতদিন হয়ে গেল, একটা চিঠিও লিখবে না মেয়ে? সেই মেয়ে, যে মা-অন্ত প্রাণ একরত্তি বয়স থেকে?’

এ প্রশ্নের উত্থাপন একটা সময় অবধারিতই, বিলক্ষণ জানতেন রোশনলাল। প্রস্তুত রেখেছিলেন উত্তর।

—আসলে কী হয়েছে জানেন মা, কাশ্মীরের নিয়ম বাকি দেশের মতো নয়। ওখান থেকে ইংরেজি বা হিন্দিতে চিঠি পাঠানো যায় না। একমাত্র উর্দুতেই ও রাজ্য থেকে চিঠি পাঠানো যায়। মণির উর্দু শেখার ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি এবার। ওখানের এক উর্দুর অধ্যাপক আমার বহুদিনের পরিচিত। উনি এক সপ্তাহ হল মণিকে উর্দু শেখানো শুরু করেছেন। চিঠি এল বলে।

যশোদা শুনলেন। এবং বিশ্বাস করার কণামাত্র কারণও খুঁজে পেলেন না। জামাতার বহুরূপী চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয়ে গিয়েছে ততদিনে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের থেকে যে ঘোর দূরবর্তী রোশনলালের অবস্থান, সেটা বুঝে গিয়েছিলেন। মুখের উপর মিথ্যেবাদী বলতে বাধে। যশোদা তাই বাক্যব্যয় করলেন না বিশেষ। রাত্রি গভীর হলে চিঠি লিখতে বসলেন ছোটভাই ভীমপ্রসাদকে। যাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ভাইকে লেখা দিদির চিঠির অংশবিশেষ রইল।

স্নেহের ভীম,

আমার আশীর্বাদ নিয়ো। মণি দুই সপ্তাহ আগে রোশনলালের সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিল। রোশন ন’দিন পরে ফিরে এসেছে মণিকে কাশ্মীরেই রেখে। মণি খুব অসুস্থ ছিল যাওয়ার সময়। আট মাস হয়ে গেছে গর্ভবতী। এখনও একটাও চিঠি লেখেনি। রোশন বলছে, উর্দু ভাষা ছাড়া ওখান থেকে চিঠি লেখা যায় না। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তুমি একটু গণনা করে তাড়াতাড়ি জানিয়ো, মণি কী অবস্থায় আছে, কেমন আছে? ও ভাল আছে তো? আমি খুব কষ্টে আছি। দিনরাত শুধু কাঁদি। খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করেছি। তুমি তাড়াতাড়ি জানিয়ো গণনা করে, মণি কেমন আছে। খুবই দুশ্চিন্তায় সময় কাটছে। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

আশীর্বাদিকা দিদি

শাক দিয়ে মাছ ঢাকারও একটা সময়সীমা থাকে। সপ্তাহে দিনদুয়েক মনোহরপুকুর রোডের ফ্ল্যাটে এসে যথাসম্ভব স্বাভাবিক আচরণ করতেন রোশনলাল। এবং যখনই আসতেন, উদ্বিগ্ন যশোদা আকুল উৎকণ্ঠায় চেপে ধরতেন জামাতাকে, ‘মণিকে নিয়ে এসো এবার? বাচ্চার জন্মের সময় তো হয়ে এল।’ সন্দিগ্ধ বেলা প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দিতেন জামাইবাবুকে, ‘দিদি চিঠি লিখছে না কেন? দিদি ভাল আছে তো?’

রোশনলালের দুঃসহ ঠেকছিল এই অতলান্ত চাপ। যা থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায় ছিল। সেটাই কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলেন রোশনলাল।

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মতিলাল নেহরু রোডের চারতলার ফ্ল্যাটে গেলেন রোশনলাল। বেলা অফিসে। সদ্য চাকরি পেয়েছেন বেঙ্গল টেলিফোনস-এ। ফিরবেন ছ’টার পরে। ফ্ল্যাটে যশোদা এবং রোশনলাল-মণির দুই সন্তান, মুন্না এবং মুন্নি। খেয়ালখুশিতে খেলছে দু’জন। যেমন খেলে রোজ।

যশোদা চা করে আনলেন রোশনলালের জন্য। ফের মণি-প্রসঙ্গ পাড়তে যাবেন, এমন সময় রোশনলাল ঝাঁপিয়ে পড়লেন শাশুড়ির উপর। গলা টিপে ধরলেন। সবলদেহী রোশনলালের বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী হল মধ্যপঞ্চাশের যশোদার যৎসামান্য প্রতিরোধ। প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হল। মুন্না এবং মুন্নি আতঙ্কে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে

রইল। যশোদার দেহ ছাদে নিয়ে গেলেন রোশনলাল। মাদুরচাপা দিয়ে রাখলেন এক কোণায়। মুন্না-মুন্নিকে চকোলেট আর খেলনা দিয়ে খানিক শান্ত করে অন্য একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। এবং অপেক্ষায় থাকলেন বেলার ফেরার। যশোদার ছোটমেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

বেলা অফিস থেকে ফিরলেন সাড়ে ছ'টা নাগাদ। অপেক্ষায় ছিলেন রোশনলাল। ঘরে ঢুকতেই ভারী হাতুড়ি দিয়ে পিছন থেকে মারলেন মাথায়। আকস্মিক আঘাতের তীব্রতায় জ্ঞান হারালেন বেলা। এরপর সংজ্ঞাহীন বেলার গলা টিপে খুন করা তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে উপর্যুপরি দুটো খুনের পর রোশনলাল শুরু করলেন অধীত চিকিৎসাবিদ্যার নিখুঁত প্রয়োগ।

প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখেননি রোশনলাল। নিয়ে এসেছিলেন চপার, দা, তার, দড়ি, রেশনের ঢাউস ব্যাগ, ডাক্তারির ছুরি-কাঁচি। ভেবেই রেখেছিলেন, ছাদের উপর পড়ে থাকা কাঠের পাটাতনটা ব্যবহার করবেন যথাসময়ে। করলেনও। পাটাতন নিয়ে এলেন ছাদ থেকে। রাখলেন বিছানার উপর। বেলার মৃতদেহ শুইয়ে দিলেন কাঠের উপর। 'অপারেশন থিয়েটার' সম্পূর্ণ।

অপারেশন থিয়েটার, না কসাইখানা? দৃশ্যপট বলবে, দ্বিতীয়টাই। কেসের কিনারা হওয়ার পরে ওই ঘরের ফরেনসিক পরীক্ষা চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন, এমন এক পদস্থ অফিসারের ভাষায়, 'The room bore a horrid look. It had the impression of a butcher's shop kept uncleaned with blood and fat and pieces of flesh sticking to the floor and wall, stinking with putrid smell.'

রোশনলাল চপার দিয়ে গুঁড়োগুঁড়ো করে দিলেন বেলার হাড়। হাতে উঠে এল surgical knife। টুকরো টুকরো করে কাটলেন বেলার দেহ। দেহাংশ মুড়ে রাখলেন রেশনের ব্যাগে। তার দিয়ে বাঁধলেন ব্যাগের মুখটা। জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন মেঝেতে বইতে থাকা রক্তস্রোত, যতটা সম্ভব। টুকরো হাড়, অস্থি-মজ্জা-চর্বি, মৃতার শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য তরল.. সব মিলিয়ে ওই ঘর তখন চূড়ান্ত বিবমিষা উদ্রেককারী। কসাইখানাই!

এই ঘরেই রোশনলাল খুন করেছিলেন শাশুড়ি এবং শ্যালিকাকে

বেলার দেহাংশ ব্যাগে ভরে মুন্না-মুন্নিকে নিয়ে রোশনলাল ঘর তালাবন্ধ করে বেরিয়ে এলেন রাত্রি দশটা নাগাদ। যশোদার লাশ পড়ে রইল ছাদে। রোশনলাল ভেবেছিলেন, আগে তো বেলার গতি করা যাক, যশোদার কাটাছেঁড়া কাল করা যাবে। তারপর ধোয়ামোছা সাফসুতরো করবেন ঘর। তালাবন্ধই থাকছে। কেউ ঢোকার নেই।

ফিরলেন কোয়ার্টারে। হাসপাতালেরই এক ইলেকট্রিক মেকানিকের জিম্মায় রাখলেন দুই শিশুকে। বললেন, 'কিছু সমস্যা হয়েছে। ওদের মা হাসপাতালে। দিনদুয়েকের জন্য তোমার কাছে থাক।'

পাওলিনকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন রোশনলাল ১৩ তারিখ দুপুরেই, 'Come quickly'। পাওলিন রাঁচি থেকে এসে পৌঁছলেন ১৫ তারিখের কাকভোরে। রোশনলাল স্টেশনে গেলেন আনতে। সঙ্গে রেশনের ব্যাগ। যাতে বেলার দেহাংশ। পাওলিনকে নিয়েই সরাসরি পৌঁছলেন দক্ষিণ কলকাতার লেকে।

আজকের লেকের যে সুসজ্জিত পরিপাটি রূপ দেখে আমি-আপনি অভ্যস্ত, সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতেই মর্নিং ওয়াকে আসা নারীপুরুষের যে জনস্রোত দেখে চোখ সয়ে গেছে, তেমনটা ছিল না তখন। শহরবাসী আসতেন প্রাত্যহিক, তবে কাতারে কাতারে নয়। স্বল্পসংখ্যায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কাঠের বেঞ্চ যা ছিল, তার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। শান্ত সরোবর ঘিরে গাছগাছালির অবশ্য তেমন অভাব ছিল না। কোলাহলশূন্য পরিবেশ। প্রকৃতি অবকাশই পেত না পরিশ্রান্ত হওয়ার।

নির্জন জায়গা দেখে সবে ব্যাগটা ফেলতে যাবেন জলে, ত্রিলোচন নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর নজরে পড়ে গেলেন রোশনলাল, 'কেয়া ফেকতা হ্যায় বাবু, কেয়া ফেকতা হ্যায়?'

বিপদ বুঝে রোশনলাল দৌড়লেন ব্যাগ ফেলে। ধাওয়া করে ধরে ফেললেন নিরাপত্তাকর্মী। ব্যাগ থেকে আবিষ্কৃত হল দেহাংশ। খবর গেল টালিগঞ্জ থানায়। পুলিশ এল। রোশনলাল-পাওলিনকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। তারপর লালবাজারে।

একঝাঁক গোয়েন্দাদের জেরার মুখোমুখি হয়েও রোশনলাল প্রাথমিক ভাবে না ভাঙলেন, না মচকালেন। আজগুবি গপ্পো ফাঁদলেন একের পর এক। 'খুন আমি করিনি। করেছেন পি কে কাপুর বলে এক ব্যবসায়ী, যাঁর সঙ্গে বেলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঘনিষ্ঠতার ফলে বেলা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। কাপুর নামের ভদ্রলোক বেলাকে বিয়ে করায় নারাজ ছিলেন। তিনিই খুনটা করেছেন। কাপুর আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। ওঁর কথায় ব্যাগটা লেকের জলে ফেলতে এসেছিলাম। খুনটা আমি করিনি।' উন্মাদেও বিশ্বাস করবে না এই গাঁজাখুরি গল্প, তবু একচুলও নড়ছিলেন না মেজর রোশনলাল।

মতিলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে যশোদার দেহ উদ্ধারের পরেও রোশনলাল ছিলেন অবিচলিত।

—মণি কোথায়? আপনার স্ত্রী?

—আমি কী করে বলব? আমাকে বলে তো যায়নি। আমার ওর চরিত্রের ব্যাপারে বরাবরই সন্দেহ হত। অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেলে অবাক হব না।

মতিলাল নেহরু রোডের বাড়ির ছাদ, যেখানে রাখা ছিল যশোদার লাশ

ফ্ল্যাটে পাওয়া গিয়েছিল বিভিন্ন সময়ে দিদি যশোদাকে লেখা ভীমপ্রসাদের চিঠি। পুলিশ টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠাল ভীমপ্রসাদকে। যিনি কলকাতায় এলেন সাম্প্রতিক অতীতে দিদির লেখা চিঠিগুলি নিয়ে। যার মধ্যে একটা ..'মণি দুই সপ্তাহ আগে রোশনলালের সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিল ..'

সেই চিঠির ব্যাখ্যা যখন চাওয়া হল, রোশনলাল দেখলেন, মিথ্যাচারে লাভ নেই আর। অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন 'Ok gentlemen, enough of it. No more waste of time. I have murdered Moni and left her buried under the sand at Puri.' যখন স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, কৃতকর্মের জন্য লেশমাত্র অনুতাপের আভাসও খুঁজে পাননি গোয়েন্দারা। সাধে কী লিখেছি আগে, গবেষণাযোগ্য চরিত্র!

রোশনলালকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দারা পাড়ি দিলেন পুরী। বয়ান অনুযায়ী হোটেলের পাশের সেই কুয়ো থেকে উদ্ধার হল মণির স্লিপার-চুড়ি-নেকলেস, যা চিহ্নিত করলেন ভীমপ্রসাদ। বালির স্তূপের ভিতর থেকে উদ্ধার হল মণির দেহাবশেষ। হাড়গোড়ই মূলত। মণিকে নিয়ে যে ওই হোটেলে উঠেছিলেন রোশনলাল, তার সাক্ষী তো ছিলেনই হোটেলকর্মীরা। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের আর বাকি ছিল না কিছু।

চার্জশিট জমা পড়ার পর যথানিয়মে শুরু হল বিচার। আদালতকক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সাক্ষ্যদান এবং সওয়াল-জবাবের প্রক্রিয়ায় উত্তেজনার উপাদান থাকে না সিংহভাগ ক্ষেত্রে। রোশনলালের মামলার বিচারপর্ব অবশ্য দেখা দিল ব্যতিক্রমী চেহারায়। যেমনটা আদালতে অদৃষ্টপূর্ব।

যেন নাম-কা-ওয়াস্তে নিযুক্ত হয়েছেন অভিযুক্তের তরফের আইনজীবী। যাঁর ভূমিকা বস্তুত ক্রীড়নকের। যিনি কখন কী বলবেন, কোন যুক্তির প্রতিরোধে তুলবেন কোন তর্ক, কোন সওয়ালের প্রত্যুত্তরে আশ্রয় নেবেন কোন জবাবের, সব তো ঠিক করে দিচ্ছেন অভিযুক্ত নিজেই। রোশনলাল স্বয়ং। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই হোক বা বা কোর্ট লক-আপে বন্দি অবস্থায়। অত্যুৎসাহে কখনও কখনও আইনজীবীকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক জুড়ছেন। থামাতে হচ্ছে বিচারককে। কখনও দু' পক্ষের যুক্তিজাল শুনতে শুনতে ভ্রূকুঞ্চিত। কখনও আবার ফেটে পড়া অট্টহাস্যে। মামলার চড়াই-উতরাইয়ে অশেষ আগ্রহী কখনও, কখনও নিরাসক্ত নিস্পৃহ। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিককে আদালতে দাঁড়িয়েই কথায় কথায় বলেছিলেন, দিব্যি উপভোগ করছেন '... fun of a trial.'

সমাজের সর্বস্তরে প্রবল কৌতূহল উৎপন্ন হয়েছিল এই মামলার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে। বিচার চলাকালীন রোশনলালের আচরণে সেই ঔৎসুক্য তীব্রতর হয়েছিল। বিচারের দিনগুলিতে আলিপুরের দায়রা আদালতের স্বল্পপরিসর বিচারকক্ষে পা রাখার জায়গা হত না। এজলাসে ঠাসা ভিড় থাকত আমজনতার। যাঁদের যত না কৌতূহল ছিল বাদী-বিবাদীর প্রশ্নোত্তরে, তার ঢের বেশি ঔৎসুক্য ছিল রোশনলালকে একবার চোখের দেখা দেখায়। সেই লোকটিকে দেখায়, যে অচিন্তনীয় নৃশংসতায় হত্যা করেছে স্ত্রী-শাশুড়ি-শ্যালিকাকে। এবং অন্তত বহিরঙ্গে যাঁর বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ নেই অনুতাপ-অনুশোচনার। বরং মরিয়া প্রয়াস রয়েছে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার।

নিধননাট্যের খুঁটিনাটি কাটাছেঁড়ার পর রায় যেদিন ঘোষিত হল, আলিপুর কোর্টের ভিড় সেদিন কল্পনাতীত মাত্রাছাড়া। পরিস্থিতি আঁচ করে আগেভাগেই মোতায়েন বাড়তি পুলিশ। কৌতূহলী জনজোয়ার নিয়ন্ত্রণে নজিরবিহীনভাবে আদালতের বাইরের রাস্তায় ঘোড়সওয়ার পুলিশের দাপাদাপি। যানবাহনের গতি বাধ্যতই শ্লথ, সংলগ্ন রাস্তাগুলিতেও।

জুরিদের মতামতের সঙ্গে সহমত হয়ে বিচারপতি কে এন ভট্টাচার্য যখন ঘোষণা করতে চলেছেন চূড়ান্ত রায়, উত্তেজনার পারদ তখন বেহিসেবি রকমের ঊর্ধ্বমুখী। 'Taking into consideration the facts and circumstances of the case...' বিচারসিদ্ধান্ত পাঠ যখন শুরু হল, এজলাসে নীরবতা নিশ্ছিদ্রতম।

'As the accused deliberately and in cold blood murdered Jashoda Sharma, Moni Sharma and Bela Sharma and as there are no extenuating circumstances, the only sentence that can be awarded to the accused in this case is death. I, therefore, sentence the accused Roshanlal to death and direct that he be hanged by the neck till he is dead...'

ফাঁসির হুকুম শোনার পর যখন জনতার সহর্ষ উল্লাস এজলাসকক্ষে, মুহূর্তের জন্য বিচলিত দেখিয়েছিল রোশনলালকে। কিন্তু ওই মুহূর্তের জন্যই। সামলে উঠে ক্ষণিক পরেই দৃপ্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন আইনজীবীকে, 'Let's appeal to higher courts.' পাওলিন দোষী সাব্যস্ত হননি। আদালতের বিচারে বেকসুর খালাস।

উচ্চতর আদালতে রোশনলাল আবেদন করেছিলেন শাস্তি হ্রাসের। কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার ট্রেভর হ্যারিস পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিলেন সে আর্জি। বড়লাটের শরণাপন্ন হয়েছিলেন রোশনলাল। ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। 'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা', সেখানে নিষ্ঠুর হতে পেরেছিলেন বড়লাট। অপরিবর্তিত থেকেছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ। যা কার্যকর হয়েছিল ১৯৫১ সালের ২০ অক্টোবরের উষাকালে।

হাতে গোনা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী কারাকর্মীর বয়ান অনুযায়ী, ফাঁসিকাঠের পাটাতনে পা রাখার ঘণ্টাখানেক আগেও রোশনলাল ছিলেন শান্ত-স্থিতধী। বলেছিলেন, 'যা করেছি, তাতে ফাঁসিই উপযুক্ত শাস্তি।'

ডক্টর জেকিল।

কিন্তু মৃত্যুমুহূর্ত যখন উপস্থিত হয়েছিল, সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, 'আমি হিন্দু। আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি হাজারবার জন্ম নেব।'

মিস্টার হাইড।

মুন্না

কী হয়েছিল মুন্না-মুন্নির? রোশন-মণির দুই সন্তানের? 'Society for the Protection of Children in India' নামের এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই শিশুর পরিচর্যার। মুন্না এবং মুন্নি প্রত্যক্ষদর্শী ছিল দিদা যশোদাদেবীর খুনের। শক-এর তীব্রতায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল মুন্না। কেউ কাছে এলেই পরিত্রাহি চিৎকার করে কাঁদত শুধু। কিছু খেতে চাইত না। ১৯৫০ সালে মারা গিয়েছিল ক্যাম্পবেল

হাসপাতালে। বাঁচেনি মুন্নিও। রোগজীর্ণ অবস্থায় দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল এক বছর পর।

আরও লেখাই যায়। লিপিবদ্ধ তো রয়েইছে দুই শিশুর তিলেতিলে মৃত্যুযাপনের রোজনামচা। লেখাই যায়, কীভাবে আক্ষরিক অর্থেই জীবন্মৃত হয়ে গিয়েছিল অভিভাবকহীন দুই শিশু। লেখাই যায় আরও।

থাক। মৃত্যু-রোমন্থন থাক।

'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?'

মেলাবেন তিনি মেলাবেন

শুধু 'হোলি হ্যায়' চিৎকারটাই যা বাকি!

আবির হরেক রঙের। লাল-নীল-সবুজ, বেপরোয়া উড়ছে হাওয়ায়। আলিপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে উদ্দাম উল্লাসে উর্ধ্ববাহু একদঙ্গল যুবক। দুধসাদা পাজামা-পাঞ্জাবি সবার। হাতে ঠোঙা ভরতি আবিরের স্টক অফুরান। অকৃপণ ওড়াচ্ছে জয়োৎসবে। ফুর্তির উপলক্ষ? তিন যুবক, যারা নায়কোচিত ভঙ্গিতে বেরচ্ছে এজলাস থেকে।

একটু আগে রায় ঘোষণা করেছেন বিচারক। ওরা তিনজন বেকসুর খালাস পেয়েছে খুনের মামলা থেকে। বছর চারেক জেলবন্দি থাকার পর। আদালত চত্বরে ভিড় জমানো অনুরাগীরা সাদরে স্বাগত জানাচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের। আবিরে নিমেষে রংবেরং করে দিচ্ছে একে-অন্যের সাদা পাঞ্জাবি।

অতনু দেখছিলেন স্তব্ধ হয়ে। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার তরুণ সাব-ইনস্পেকটর। জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছিল '৯৭-এর ৬ ডিসেম্বর। রায় বেরল আজ, ২০০১-এর ৩০ অগস্ট। খুনের কিনারা তো ঘটনার দিনই হয়ে গিয়েছিল। মাথা খাটানোর বিশেষ ব্যাপার ছিল না। খুনটা যারা করেছিল, ধরতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।

কিন্তু এটা কী হল? কী ভাবে সম্ভব? হোমিসাইড শাখার চার্জশিট চিরাচরিত ভাবে নিশ্ছিদ্র হয় বলেই গুরুত্বপূর্ণ খুনের মামলার ভার গোয়েন্দাবিভাগের উপর পড়ে। ডিপার্টমেন্ট ধরেই নেয়, হোমিসাইড কেসটা দেখছে মানে অভিযুক্তদের শাস্তি একশো শতাংশ নিশ্চিত। কোনও গল্পই থাকবে না সাক্ষ্যপ্রমাণের চক্রব্যূহ ভেদের।

এই কেসের 'মেমো অফ এভিডেন্স' আর চার্জশিটে মাছি গলার মতো ফাঁকও রাখেননি অতনু। গত রাতেও নিশ্চিত ছিলেন, চার অপরাধীর দোষী সাব্যস্ত হওয়া তো স্রেফ নিয়মরক্ষা। মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনা নেই, তবে যাবজ্জীবন তো অবধারিত।

অথচ সব হিসেব উলটে গিয়ে বেকসুর খালাস! তাচ্ছিল্যের হাসি ছুড়ে দিচ্ছেন অভিযুক্তদের আইনজীবী। যাঁর শরীরী ভাষায় দিব্যি পড়া যাচ্ছে, 'কী? কেমন দিলাম!' ইচ্ছে করেই গা ঘেঁষে মুঠো মুঠো আবির ওড়াচ্ছে খালাস হওয়া তিন যুবকের চেলাচামুন্ডারা। উড়ে আসছে কান গরম করে দেওয়া বক্রোক্তি, 'লালবাজার তো ফুটে ফুলকপি রে!' বাকিরা সুর করে গলা মেলাচ্ছে সোৎসাহে, 'ফুটে কী? ফুটে ফুলকপিইইই!'

ক্ষোভ-দুঃখ-অপমান একত্রে সঙ্গী হলে যা হয়, মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ছত্রিশ বছরের অতনুর। কালকের খবরের কাগজে ফলাও করে বেরবে এই রায়, 'পুলিশি তদন্তে ফাঁক, মুক্তি পেল উদয় সিং হত্যামামলার অভিযুক্তরা, তীব্র ভর্ৎসনা তদন্তকারী অফিসারকে' ইত্যাদি প্রভৃতি। ডিপার্টমেন্টে মুখ দেখাবেন কী করে? পরিশ্রমী এবং অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের জন্য ওসি হোমিসাইড বিশেষ স্নেহ করেন অতনুকে। জটিল মামলা এলে খোদ ডিসি ডিডি প্রায়ই বলে থাকেন, 'এটা অতনু করুক!' এ যা হল, কেরিয়ারেই তো কালো দাগ পড়ে গেল!

দুম! দ্রাম!

প্রথমে বিকট শব্দে গোটাকয়েক বোমা। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার চারদিক। তারপর গুলি কয়েক রাউন্ড।

ফ্ল্যাশব্যাকে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। সকাল দশটা। ওয়াটগঞ্জ থানা এলাকার রামকমল স্ট্রিটের লাগোয়া রকে

বসেছিলেন উদয় সিং। রোজকার মতো আড্ডা দিচ্ছিলেন চায়ের কাপ হাতে। পাশে সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নরেশ, কল্যাণ, বোম্মাইয়া। উলটোদিকের ফুটপাথে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিলেন উদয়ের ছোটভাই রঞ্জিত আর স্থানীয় যুবক নিতাই, যিনি উদয়ের ব্যবসায় দীর্ঘদিনের কর্মী।

যেখানে খুন হয়েছিল উদয়-নরেশ

হঠাৎই হাতে বোমা-পিস্তল নিয়ে আবির্ভাব চার যুবকের। সোজা উদয়ের দিকে ধেয়ে এসে বোমা-গুলির দুম-দ্রাম, নির্বিচারে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, বোমা নয়। একাধিক স্প্লিন্টার ঢুকল উদয় আর নরেশের শরীরে। রক্তাক্ত শরীর দুটো ঢলে পড়ল মাটিতে। অল্পের জন্য অক্ষত থাকলেন আড্ডার অন্য দুই সঙ্গী, কল্যাণ আর বোম্মাইয়া।

আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উলটোদিকের ফুটপাথ থেকে যতক্ষণে রঞ্জিত-নিতাই ছুটে এসেছেন রাস্তার এপারে, গুলি ছুড়তে ছুড়তে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে চার আততায়ী। ঘটনা যেখানে ঘটছে, সে-রাস্তা দিনভর ব্যস্ত থাকে লোকজনের আনাগোনায়। তার উপর সময়টা ভাবুন, সকাল দশটা! জনতা ধাওয়া করল ঘাতক চতুষ্টয়ের পিছনে। তিনজন পালাল নাগালের বাইরে। চতুর্থ আততায়ী পিছিয়ে পড়ল কিছুটা, পিছনে রে-রে করে ছুটে আসা দঙ্গলটার সঙ্গে কমতে থাকল ব্যবধান।

উদয় আর নরেশের রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর দুটো যখন স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলছেন, ততক্ষণে আশেপাশে খবর ছড়িয়ে পড়েছে উল্কাগতিতে। উদয় সিং বোমার আঘাতে গুরুতর আহত, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। সেই উদয় সিং, যার অঙ্গুলিহেলনে চালিত হয় বন্দর এলাকার একটা বড় অংশের অন্ধকার জগৎ। স্থানীয়দের কাছে যিনি হয় 'উদয় ভাই', নয় 'উদয় ভাইয়া'।

সোয়া দশটা নাগাদ ফোনে খবর এল ওয়াটগঞ্জ থানায়। উদয় সিং-এর উপর গুলিবোমার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে এলাকায়, আন্দাজ করতে তিরিশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না ওসি-র। প্রথম ফোনটা করলেন ডিসি পোর্টকে, দ্বিতীয়টা লালবাজার কন্ট্রোল রুমে। ডিসি রওনা হলেন রামকমল স্ট্রিটের উদ্দেশে। পোর্ট ডিভিশনের সমস্ত থানার ওসিদের ওয়ারলেস মারফত জরুরি নির্দেশ পাঠালেন ডিসি হেডকোয়ার্টার, 'স্পটে যান।' গার্ডেনরিচ-একবালপুর-মেটিয়াবুরুজ-নর্থ পোর্ট-ওয়েস্ট পোর্ট-সাউথ পোর্ট, সব থানার গাড়ি ছুটল। হাতের কাছে যা ফোর্স-অফিসার আছে, তাই নিয়ে। লালবাজার থেকেও তড়িঘড়ি ওয়াটগঞ্জে রওনা দিল RAF।

'ধুন্ধুমার' আজকাল মিডিয়ার খুব প্রিয় শব্দ। চ্যানেলে হোক বা খবরের কাগজে, দু'-চারজনের মধ্যে কোথাও সামান্য খুচরো খুনসুটির ঘটনা ঘটলেও অবলীলায় ব্যবহৃত হয় 'ধুন্ধুমার', পরিস্থিতি সে যতই হোক তেমন কিছুর যোজনখানেক দূরে।

থানা থেকে খুনের জায়গাটা খুব বেশি হলে পৌনে এক কিলোমিটার। পুলিশ যখন পৌঁছল, রামকমল স্ট্রিটে তখন আক্ষরিক অর্থেই ধুন্ধুমার। দোকানপাট যত ছিল রাস্তার দু'ধারে, ঝাঁপ পড়ছে দ্রুত। উদয় সিং-এর অনুগামীরা জড়ো হয়েছে শয়ে-শয়ে। হাতে লাঠি আর পাকানো বাঁশ। পথচলতি গাড়িঘোড়ায় এলোপাথাড়ি ভাঙচুরে ঘটছে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি চলছে লাগাতার।

এ অবস্থায় যা করতে হয়, যা করা উচিত, করল পুলিশ। বেধড়ক লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস এবং ধাওয়া করে ধরপাকড়, যতজনকে পারা যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় যখন পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে এল, ফের শুরু হল যানচলাচল, খবর এল ক্যালকাটা হসপিটাল (বর্তমানের সিএমআরআই) থেকে। উদয় সিং মৃত। নরেশ লড়ছেন, তবে সে লড়াইয়ে হার প্রায় নিশ্চিত। ডাক্তাররা জানিয়েই দিয়েছেন একরকম, আর কয়েক ঘণ্টা বড়জোর।

ওয়াটগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ২৭৫, তারিখ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩০৭/৪২৭/৩৪, খুন, খুনের চেষ্টা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা,

২৫ (১বি)(A)/২৭ অস্ত্র আইন, ৩ এবং ৫ বিস্ফোরক পদার্থ আইন।

দুষ্কৃতীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণতিতে গুলি, বোমাবাজি এবং খুন। ঘটনা আজ থেকে একুশ বছর আগের। এবং একেবারেই অভূতপূর্ব নয়। দুষ্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াইয়ে এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। পরেও। উপরন্তু এ মামলাতে প্রথাগত রহস্য নেই, কিনারাপর্বে নেই মস্তিষ্কের কসরত।

তবু এ কাহিনি বহু আলোচিত কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে। তথাকথিত 'ওপেন অ্যান্ড শাট' মামলাও যে কী গভীর বিড়ম্বনায় কখনও কখনও ফেলে দিতে পারে বাস্তবের গোয়েন্দাদের, কী দুঃসহ পরীক্ষা যে নেয় ধৈর্যের-স্থৈর্যের-মনোবলের, আলোচ্য কেসের ইতিবৃত্ত তার প্রামাণ্য দলিল।

ঘটনায় ফিরি। যেমন ভাবা গিয়েছিল, উদয়ের সঙ্গী হলেন আহত নরেশও। মারা গেলেন বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ। ময়নাতদন্তে নতুন কিছু পাওয়ার ছিল না। রুটিন কাটাছেঁড়ার পর রুটিন রিপোর্ট, শরীরের বিভিন্ন অংশে স্প্লিনটারের আঘাতে মৃত্যু।

মারমুখী জনতাকে হঠিয়ে দিয়ে যখন এলাকার দখল নিয়েছে পুলিশ, খবর এল, কাছেই মণিময় ব্যানার্জি রোডে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে আছে এক যুবক। ওসি ছুটলেন।

ড্রেনের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা যুবকের শার্ট রক্তে মাখামাখি। পাশে একটা দেশি রিভলভার পড়ে আছে। তুলে দেখা গেল, সেমি-লোডেড। চেম্বারে এখনও তিন রাউন্ড গুলি। স্থানীয় মানুষ এসব ক্ষেত্রে এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, মুখ খুলতেই চান না কেউ। যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক, কাটা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকে, 'আমি তো কিছু দেখিনি সেভাবে।' স্বাভাবিকই। কে আর চায় খামোখা খুনখারাপির মামলায় জড়াতে? কিছু বললেই পুলিশ বয়ান নেবে। তাতে সইসাবুদ করতে হবে। কোর্টে ডাক পড়বে সাক্ষী দিতে। কী লাভ অত ঝামেলায় গিয়ে? এমনি এমনি কি আর বলে, 'পুলিশে ছুঁলে...!'

কথাবার্তা বলে তবু জানা গেল যতটুকু, এই আহত যুবককে ধাওয়া করেছিল জনা কুড়ি-পঁচিশের একটা দল। হাতে রিভলভার উঁচিয়ে পালাচ্ছিল যুবক। একটা সময় আর পেরে ওঠেনি দৌড়ে। ধরে ফেলেছিল পিছু-নেওয়া জনতা। কিল-ঘুষি-লাথি কিছুক্ষণ চলেছিল যা খুশি, যেমন খুশি। কৌতূহলী স্থানীয় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকলে ওই অবস্থায় যুবককে ফেলে রেখে উধাও হয়ে যায় ওই কুড়ি-পঁচিশ।

রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। তবে যুবক তখনও বেঁচে। গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তবে তার আগেই জানা হয়ে গেছে পরিচয়। ওসি একঝলক দেখেই চিনেছিলেন। এর নাম বাদল। বাদল মুখার্জি। বেহালার পাঠকপাড়ায় বাড়ি। খিদিরপুর এলাকায় একটা দোকান আছে। আগে একাধিকবার ধরা পড়েছে তোলাবাজি-মারদাঙ্গার অভিযোগে। উদয়ের বিরোধী গোষ্ঠীর মস্তানদের মধ্যে এই বাদল বরাবরই প্রথম সারিতে। নির্ঘাত উদয়কে যারা মারতে এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল। পালাতে পারেনি, মার খেয়েছে বেধড়ক। মরেই যেত আর একটু হলে। অবশ্য চোট-আঘাতের যা অবস্থা, মরে যে যাবে না, গ্যারান্টি নেই কোনও।

বাদল পালাতে পারেনি। কিন্তু যারা পেরেছে, তারা কারা? কোথায় পালাল? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া নিয়ে চিন্তিত দেখাচ্ছিল না ওসি-কে। দিনের আলোয় মেরেছে। পালানোর সময় একজন গণপিটুনিতে হাসপাতালে। অন্যদের নাম জানা যাবে দ্রুতই। এবং জানার পর গ্রেফতার তো স্রেফ সময়েরই ব্যাপার। গ্যাং-ওয়ারের ঘটনায় যেমন হয়।

খুনিরা পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? আর গেলেই বা কতদিন? এখন ঢের বেশি জরুরি এলাকার আইনশৃঙ্খলার স্থিতাবস্থা, ফের যাতে গোলমাল না বাধে, সেটা নিশ্চিত করা। কোথায় কোথায় পুলিশ পিকেট বসবে আগামী সাতদিন, টহলদারি গাড়ি কোথায় কোথায় নজর রাখবে বেশি, ওসি তৈরি করতে শুরু করলেন ব্লু প্রিন্ট। থানার এত কাছে গুলি-বোমা-খুন, এমনিতেই লজ্জার। ফের একটা কিছু ঘটে গেলে চাকরি

নিয়েই টানাটানি হওয়ার সম্ভাবনা।

এ মামলা ডিডি নেবে, জানাই ছিল। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাব-ইনস্পেকটর অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে গোয়েন্দাপ্রধান জানিয়ে দিলেন, 'কেসটা তুমি করছ। ডিটেকশন তো হয়েই গেছে ধরে নাও। অ্যারেস্টগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার চেষ্টা করো। অতনু, আই ওয়ান্ট আ কুইক চার্জশিট, অ্যান্ড কনভিকশন অ্যাট এনি কস্ট।'

—রাইট স্যার।

অতনু মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। আপাতত প্রথম কাজ, উদয় সিং-এর ঠিকুজিকুষ্ঠি একটু ঝালিয়ে নেওয়া। অপরাধজগতের পরিচিত নাম, গুন্ডাদমন শাখায় খুঁজলেই পুরনো রেকর্ড পাওয়া যাবে নিশ্চিত।

উদয় সিং। তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজো। সংগ্রাম-উদয়-রঞ্জিত, তিন ছেলেকে নিয়ে বছর পঁচিশ আগে বাবা ছোটু সিং উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন জীবিকার খোঁজে। ছোটু কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন ঠিকাশ্রমিকের।

তিন ছেলেকে ভরতি করে দিয়েছিলেন স্কুলে। সংগ্রামের পড়াশুনো বেশিদূর এগোয়নি। রঞ্জিত তুলনায় বেশি মনোযোগী ছিল লেখাপড়ায়। উদয়ের অবশ্য তীব্র বিরাগ ছিল বইখাতার প্রতি। পাড়া-বেপাড়ায় ফুটবল খেলে বেড়ানো, সন্ধেবেলায় গঙ্গার পাড়ে বসে বিড়ি-সিগারেট-চোলাই আর পয়সাকড়ি জুটিয়ে এলাকার সিনেমা হলে নুন শো-য় অ্যাডাল্ট ফিলমের আঁচ পোহানো, মোটামুটি এই ছিল উদয়ের কিশোরবেলা।

এই সেই উদয় সিং

বড়ছেলে সংগ্রামের বয়স যখন বছর কুড়ি-বাইশ, পরিচিত একজনকে বলেকয়ে ফ্যান্সি

মার্কেটের একটা দোকানে হেল্পারের কাজে লাগিয়ে দিলেন ছোটু সিং। বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু তো কাজকর্ম করুক। সে মাইনে যত কমই হোক। সংগ্রাম ক্রমশ টাকা জমিয়ে বছরকয়েকের মধ্যে ফ্যান্সি মার্কেটে একটা দোকান চালু করলেন। নিজের মতো থাকতেন। ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বিশেষ।

উদয়ের জন্যও ছোটু সিং কাজ দেখলেন গুলমোহর ঘাটের ফুলপট্টিতে। সাপ্লাই যখন আসবে, ট্রাক থেকে দোকানে মাল নামানোর কাজ। উদয় কাজে গেল সুবোধ বালকের মতো। সন্ধেবেলা বাড়ি বয়ে এসে মালিক জানিয়ে দিয়ে গেল ছোটু সিং-কে, 'কাল থেকে ওর আর আসার দরকার নেই। পাঠাবেন না।'

—কেন?

—আপনার ছেলে অত্যন্ত বেয়াদব। ফুলের ডালা নামানোর সময় ট্রাকের হেল্পারের সঙ্গে সামান্য কারণে তর্ক করেছে। মা-বাবা তুলে যা-তা গালাগালি দিয়েছে। হেল্পারের গায়েও হাত তুলেছে। ওকে আমি কাজে রাখব না।

ছোটু সিং বিস্তর বকাঝকা করলেন উদয়কে। যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না বাবার গালমন্দে। আঠারো বছরের উদয় ততদিনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, এসব দু'পয়সার খালাসির কাজ তার জন্য নয়। কে খাটবে এত ফাইফরমাশ? অনেক বড় মাঠ পড়ে আছে তার খেলার জন্য। খেলার নিয়মগুলো শুধু ভাল করে জেনে নিতে হবে।

'বড় মাঠ' বলতে কলকাতা বন্দর। 'খেলা' বলতে লোহার ছাঁটের নিলাম। 'নিয়ম' বলতে সিন্ডিকেটের প্যাঁচপয়জার। না ছিল পড়াশুনোর বালাই, না ছিল কাজকর্ম কোনও। হাতে যে অঢেল সময় থাকত, তার অনেকটাই উদয় কাটাত ডক-এলাকায়। দেখত অবাক হয়ে, লোহার ছাঁট নিলামের দিনের সপ্তাহখানেক আগে থেকে কীভাবে রাতারাতি বদলে যেত জাহাজের আসা-যাওয়া আর রুটিনমাফিক মাল খালাসের রোজকার শান্ত ছবিটা। এলাকায় টেনশনের গন্ধ পেতে ঘ্রাণশক্তি প্রখর হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না।

গলায় চেন, হাতে বালা, শরীরে উল্কি, চোখে রোদচশমা। ষন্ডামার্কা চেহারার যুবকদের বাইক-সফর যেন হঠাৎই বেড়ে যেত এলাকায়, লক্ষ করত উদয়। কখনও আসলাম ভাইয়ের ছেলেরা এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কখনও জিতেন্দর ভাইয়ের লোকজনকে বাইক নিয়ে দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র। বাইক-আরোহীদের কোমরের কাছে যেটা উঁচু হয়ে আছে, সেটা কী, বুঝতে বুদ্ধি খরচ করতে হত না। মেশিন!

যত এগিয়ে আসত নিলামের দিন, রাত বাড়লেই ইতিউতি আওয়াজ পাওয়া যেত বোমাবাজির। গুলিরও। নিলামের পরদিন সব শান্ত হয়ে যেত ভোজবাজির মতো। বন্দর এলাকার প্রতিটা গলিঘুঁজি চেনা হয়ে-যাওয়া উদয় দেখত, কোনও না কোনও জায়গায় মোচ্ছব চলছে যুদ্ধজয়ের। বিদেশি মদের ফোয়ারা ছুটছে। উড়ে যাচ্ছে দেদার মুরগি-মটন। ঝাঁ-চকচকে গাড়ি এসে রাতের দিকে থামছে ঠেকের সামনে। 'ভাই'-দের গাড়ি। কখনও সে 'ভাই'-এর নাম আসলাম, কখনও জিতেন্দর, কখনও আনোয়ার, কখনও-বা রামাধীর। আসর জমে উঠছে ফের, সুর আর সুরায়। রাত গভীর হলে হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, ভ্রুমমম শব্দে স্টার্ট নিয়ে ছুটছে বাইকের সারি। কোথায় যাচ্ছে ওরা এত রাতে? কানাঘুষোয় শুনত উদয়, গন্তব্য নাকি সোনাগাছি। যেখানে রাত যত বাড়ে, তত নাকি রঙিন হয় দুনিয়া। সুন্দরীদের মেহফিল বসে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে উদয় ভাবত, আহ, এই তো জীবন। জিন্দগি হো তো অ্যায়সা!

সিনেমায় যা দেখে থাকি আমরা সচরাচর, এরপর অন্ধকার জগতের মোহে আচ্ছন্ন এই জাতীয় ছেলেরা নজরে পড়ে যায় কোনও এক 'ডন'-এর, কোনও এক 'ভাই'-এর। তারপর ক্রমশ নিজের যোগ্যতায় 'ভাই'-এর বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠা। দায়িত্ব আর ক্ষমতা, দুইয়েরই পরিধি স্বাভাবিক নিয়মে বাড়তে থাকা। এবং একটা পর্যায়ের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজেই 'ভাই' হয়ে ওঠার, তৈরি করে ফেলা নিজস্ব অনুগামীদের বলয়। যার ছত্রছায়ায় বড় হয়ে ওঠা, তাকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া।

তারপর মাৎস্যন্যায়। ছোট মাছ যে 'বড়' হয়ে গেছে, সেটা বড় মাছ যতক্ষণে বুঝতে পারে, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে বেশ খানিকটা। শুরু হয়ে গেছে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। যেখানে দয়ামায়ার জায়গা নেই, নেই নীতিনিয়মের বালাই। আছে শুধু 'জোর যার, মুল্লুক তার'-এর আপ্তবাক্য। রামগোপাল বর্মার 'কোম্পানি' সিনেমার সেই গানটাই এ দুনিয়ার রিংটোন, 'সব গন্দা হ্যায় পর ধান্দা হ্যায় ইয়ে'।

সিনেমা এক, আর বাস্তব আরেক। তবে এটা স্বীকার্য, ফিলমের প্রয়োজনে আমদানি করা নাটকীয়তার উপাদানগুলো বাদ দিলে বাস্তবের উদয়দের উত্থানের চিত্রনাট্যও মোটামুটি একই রাস্তা ধরে পথ হাঁটে। পুলিশ রেকর্ডস ঘেঁটে উদয়ের কোনও 'গডফাদার'-এর খোঁজ অতনু পেলেন না বটে, কিন্তু একটা রেখচিত্র পাওয়া গেল আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে বন্দর এলাকার অপরাধজগতে উদয়ের উল্কাসদৃশ উত্থানের।

গার্ডেনরিচ এলাকায় তুমুল মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে বাইশ বছর বয়সে প্রথম হাজতদর্শন। বছরখানেকের মধ্যেই দোলের দিন ক্লাবে-ক্লাবে মারামারি আর বোমাবাজিতে নেতৃত্ব দিয়ে ফের শ্রীঘরে কিছুদিন। জামিন পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এক শ্রমিকনেতাকে ভরদুপুরে গুলি করে খুনের চেষ্টা। চেষ্টা নয়, সরাসরি খুনই এর বছরখানেক পরে। দেড় বছর হাজতবাসের পর জামিনে মুক্তি, প্রভাব খাটিয়ে মামলাকে সময়ের হিমঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া। ক্রমে ঢুকে পড়া লোহার ছাঁটের সিন্ডিকেটে, বাহুবলে কায়েম করা দাদাগিরি, হু হু করে সংখ্যা বেড়ে যাওয়া অনুগামীর, এবং উদয় সিং থেকে 'উদয় ভাই' হয়ে ওঠা। হিন্দি ছবির ভাষায়, এলাকার 'বেতাজ বাদশা'।

লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। পাথরে কোঁদা শরীর। চওড়া কপাল, ঝাঁকড়ানো চুল। বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একই পোশাক। ধবধবে সাদা শার্ট-প্যান্ট। এক কথায়, নায়কোচিত চেহারা ছিল উদয়ের। আর ছিল পোর্ট ডিভিশনের নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকায় 'রবিনহুড' ইমেজ। মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় হচ্ছে না, দরিদ্র পিতা শরণাপন্ন হতেন 'উদয় বেটা'-র। সম্পন্ন বাড়িওয়ালা মস্তান লাগিয়ে উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে, নিরীহ ভাড়াটিয়ার মুশকিল আসান বলতে তখন 'উদয় ভাইয়া'। পুজোর বিচিত্রানুষ্ঠানে বোম্বের শিল্পী আনার টাকা জোগাড় হচ্ছে না, ভরসার ঠিকানা সেই 'উদয় ভাই'। যে দু'-চারটে ফোন করলেই স্থানীয় শিল্পপতিরা টাকার থলি নিয়ে

হাজির। এবং পুজোয় দেদার নাচাগানা, ব্র্যাকেটে বোম্বে-মার্কা শিল্পীদের উপস্থিতিতে। জনপ্রিয়তায় বন্দর মহল্লায় একজনই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উদয়ের। উদয় নিজে।

একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর পুলিশ এবং আইনকে এড়াতে উদয়দের মতো লোকের প্রয়োজন পড়েই সামাজিক আব্রুর। সে আব্রু কখনও সরবরাহ করে থাকে ব্যবসাদারের পরিচিতি, কখনও-বা রাজনীতিকের মোড়ক। উদয় প্রথমটা বেছেছিলেন। বাড়ি কিনেছিলেন ১/১ রামকমল স্ট্রিটে। পাশেই আরেকটি দোতলা বাড়ির উপরটা ভাড়া নিয়ে ব্যবসায়িক সংস্থার অফিস খুলেছিলেন। নাম 'বিকি এন্টারপ্রাইজ'। রঞ্জিতের অফিসও ওখানেই ছিল, 'মা তারা এন্টারপ্রাইজ'। রঞ্জিত ঝুটঝামেলায় থাকা পছন্দ করতেন না। সোজা পথে ব্যবসা করতেন।

উদয়ের ব্যবসা ইমারতির। বাড়ি তৈরির মালমশলা সাপ্লাইয়ের। সকাল দশটায় রোজ অফিস খোলে, ঝাঁপ পড়ে যায় সন্ধে সাতটা নাগাদ। উদয়কে অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে নরেশ-কল্যাণ-বোম্মাইয়ারা। দিনভর লেগে থাকে লোকের ভিড়। সবাই জানে অলিখিত নিয়মটা, এলাকায় বাড়ি তৈরি করতে গেলে ইট-বালি-সিমেন্ট উদয়দের থেকেই নিতে হবে। যার ঘাড়ে মাথা থাকবে না নেওয়ার, তার বাড়িই উঠবে না। বাংলা হিসেব।

ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন উদয়। লোহার ছাঁটের নিলামেও কায়েম রেখেছিলেন একাধিপত্য। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো ছিলই। কারও সাহস ছিল না পুলিশে অভিযোগ করার। পুলিশের কিছু আইনত করারও ছিল না উদয়ের ব্যাপারে, যতক্ষণ না জমা পড়ছে লিখিত অভিযোগ, যতক্ষণ না উদয় নতুন করে সরাসরি জড়াচ্ছেন মারদাঙ্গায়। উদয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ব্যবসার আড়ালেই সব কিছু যখন নির্বিঘ্নে চলছে রক্তপাতহীন, ভালই তো! গত তিন-চার বছরে সবরকম ঝামেলার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।

স্ত্রী সমর্থন করতেন না উদয়ের কাজকর্ম। তিতিবিরক্ত হয়ে একটা সময় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে উঠে গিয়েছিলেন হাজরার কাছে বাপের বাড়িতে। পরিবার আর ব্যবসা সমার্থক হয়ে গিয়েছিল ঝাড়া হাত-পা উদয়ের কাছে।

তবে ওই যে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। উদয় গত সাত-আট মাস ধরেই খবর পাচ্ছিলেন, এক তরুণ তুর্কির উদয় হয়েছে এলাকায়। ধমকে-চমকে যে তোলাবাজি চালাচ্ছে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে। একদিন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দল বেঁধে অভিযোগ জানিয়ে গেলেন উদয়ের দরবারে, 'ভাইয়া, একটু দেখুন। আমরা তো টিকতে পারছি না অত্যাচারে।' উদয় নড়েচড়ে বসলেন একটু। বোম্বাইয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম রে ছেলেটার? খোঁজখবর নিস তো একটু।'

—নিয়েছি ভাইয়া।

—নামটা কী?

—বামা।

—বামা?

অতনুর প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে হয় না খুনের প্রত্যক্ষদর্শী রঞ্জিত-গোপাল-কল্যাণ-বোম্বাইয়াদের।

—স্যার, বামার ছেলেরা মেরেছে। বামা, বাদল, পটা আর টুটি, চারজনকে স্পষ্ট দেখেছি। এল, আর বোম মারতে শুরু করল ভাইয়াকে লক্ষ্য করে। গুলিও চালাল।

বামা, পটা, টুটি। এদের আসল নাম জানতে চেয়ে লাভ নেই। অতনু বোঝেন, বলতে পারবে না এরা। জেনে নিতে হবে থানার রেকর্ড থেকে, নিশ্চয়ই দু'-চারবার ধরা পড়েছে আগে। তা ছাড়া মস্তানদের তো এরকমই নাম হয়। মা-বাবার দেওয়া ভাল নামটা নিজেরাই ভুলে যায় এরা একটা সময়। নাম হয়তো গোপালচন্দ্র অমুক। পরোটা ভেজে বিক্রি করত। কোনও একটা ঝামেলায় পরোটা ভাজার তাওয়া দিয়েই মাথায় মেরে খুন করেছিল কাউকে। সেই থেকে নাম 'পরোটা গোপাল'। কিংবা ধরুন, নাম ছিল হরেন্দ্রনাথ

তমুক। বোম বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনিবার্য নামকরণ, হাফচোখো হরেন। কিংবা কোনও না কোনও বিচিত্র সংযোগে কারও না কারও নাম 'বোম বিশু', 'ত্যাবড়া তপন', 'উল্লু রাজু'। অথবা, গালকাটা গদাই, কানকাটা কানাই, বা হাতকাটা দিলীপ।

থানার নথিপত্র থেকে জানা গেল ভাল নামগুলো। প্রণব নাগ ওরফে বামা, খিদিরপুর এলাকারই হরিসভা লেনের বাসিন্দা। শংকরসুন্দর দত্ত ওরফে টুটি, বাড়ি খিদিরপুরেই। শুভাশিস মুখার্জি ওরফে পটা, স্থানীয় যুবক।

বাদল চিকিৎসাধীন এসএসকেএম-এ। পটা-টুটি-বামা, তিনজনের বাড়িতেই রেইড করা হল। জানাই ছিল, থাকবে না কেউ। পাওয়া গেল না। সোর্স লাগানো হল একাধিক। এলাকার বিভিন্ন ঠেকে সাদা পোশাকে নজরদারি শুরু করলেন গুন্ডাদমন শাখার অফিসাররা। তিনজনই স্থানীয় মস্তান। যত দাদাগিরি, এলাকাতেই। আজ নয় তো কাল, পরশু নয় তরশু, ফিরবেই মহল্লায়। যাবে কোথায়?

যা ভাবা গিয়েছিল, তাই। টুটি এবং পটা ধরা পড়ল ঘটনার দিন পনেরো পর, ২২ ডিসেম্বর। হাওয়া এখনও কতটা গরম, সেটা বুঝতে গভীর রাতে দু'জনে ঢুকেছিল গার্ডেনরিচ এলাকায়। গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পিছনে এক গোপন ডেরায় মদের বোতল খুলে বসার আধঘণ্টার মধ্যে খবর চলে এসেছিল সোর্স মারফত। যে রিভলভার দিয়ে পটা গুলি চালিয়েছিল খুনের দিন, সেটা উদ্ধার হল। নিজের বাড়ির কাছেই একটা পুকুরের ধারে পুঁতে রেখেছিল। বাকি ছিল প্রণব ওরফে বামা। জালে উঠল মাঝেরহাট এলাকা থেকে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই। '৯৮-এর জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই হেফাজতে নেওয়া হল বাদলকে। সম্পন্ন হল গ্রেফতারি-পর্ব।

খুনের কারণ? জেরায় জানা গেল, বামার নেতৃত্বে পটা-টুটি-বাদল এবং আরও বেশ কয়েকজন যুবক বছরখানেক হল নিজেদের 'গ্যাং' তৈরি করেছিল। যে 'গ্যাং'-এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল, উদয়ের একচ্ছত্র রাজ্যপাটে ভাগ বসানো। মাসছয়েক আগে পোর্টের মালপত্র সরবরাহের একটা বড় অঙ্কের টেন্ডার হয়। এসব টেন্ডারে উদয়ের অর্ডার পাওয়াটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এতদিন। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল বামা-বাহিনী। তারাও টেন্ডার ফর্ম তুলেছিল, সমানে-সমানে লড়েছিল। অর্ডার শেষ পর্যন্ত উদয়ের টিমই পেয়েছিল, কিন্তু গোকুলে যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেড়ে উঠছে, সে ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছিলেন 'উদয় ভাইয়া'। সে-রাতেই উদয় স্বয়ং দলবল নিয়ে বামার বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছিলেন, 'এই দুঃসাহস যেন আর না হয়!'

ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আরও ঘোরতর দুঃসাহস দেখিয়েছিল পটা-টুটি-বাদলরা। পরদিন বিকেলে, উদয় তখন অফিসে অনুপস্থিত, সদলবলে হানা দিয়েছিল রামকমল স্ট্রিটে। অফিসে যারা ছিল, তাদের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে হুমকি দিয়েছিল, 'ভাইয়াকে বলে দিস, সে জমানা আর নেই। তোরা থাকলে আমরাও থাকব। কে কবে মাছের চারা ছাড়বে, তার ভরসায় পুকুর কাটব না, বলে দিস।'

এ হুমকির পালটা প্রত্যাঘাত কেন উদয় করেননি, শক্তির বিচারে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও, আন্দাজ করতে পেরেছিলেন অতনু। মারপিট-খুনজখমে জড়িয়ে ফের পুলিশি ঝামেলায় পড়তে চাননি। লোক লাগিয়ে শায়েস্তা করতে পারতেন বামাদের, ইচ্ছে করলেই। করেননি, কারণ, জানতেন, শেষ পর্যন্ত নাম জড়াবেই। অন্য চাল চেলেছিলেন। নিজে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন পটাদের নামে। যে খবর আরও খেপিয়ে তুলেছিল বামা-পটার দলবলকে।

চাপা টেনশন একটা ছিলই। যা তুঙ্গে উঠেছিল দিনদশেক আগে। উপলক্ষ, আরেকটা টেন্ডার। দু'পক্ষই ফর্ম জমা দিয়েছিল। কিন্তু বামা-পটা খবর পেয়েছিল, উদয় পোর্ট ট্রাস্টের উপরমহলে কলকাঠি নেড়েছেন। যার ফলে বামাদের জমা দেওয়া ফর্ম বাতিল হতে চলেছে টেকনিক্যাল কারণ দেখিয়ে। ফের বামা-পটা-টুটি-বাদল সটান উদয়ের অফিসে গিয়েছিল। এবারও এমন একটা সময়ে, যখন উদয় অফিসের বাইরে। অ্যাকাউন্ট্যান্টের কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে বামা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'আমাদের টেন্ডার যদি বাতিল হয়ে যায়, তোর ভাইয়াকেও পেতে দেব না। পরেরবার যখন আসব, চেম্বার খালি করে দিয়ে যাব, মনে রাখিস।'

উদয় শুনেছিলেন সব, খুব গুরুত্ব দেননি। ভেবেছিলেন, রক্ত গরম, তাই ছেলেগুলো একটু বেড়ে খেলছে। থানায় ফের ডায়েরি করিয়েছিলেন নিতাইকে দিয়ে। পুলিশ রেইড করেছিল বামার গ্রুপের প্রত্যেকের বাড়িতে। পায়নি কাউকেই। সেই রেইডের সাতদিনের পরই দুঃসাহসিক উদয়-হত্যা।

অক্লান্ত পরিশ্রমে তিন মাসের মধ্যেই চার্জশিট পেশ করেছিলেন অতনু। রঞ্জিত-নিতাই-কল্যাণ-বোম্মাইয়া প্রত্যক্ষদর্শী ছিল খুনের। ঘটনাস্থলের পাশেই ছিল দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের একটা দোকান। সেই দোকানের কর্মী বাচ্চুও দেখেছিল ঘটনাটা। ঘটনাস্থলের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাদলের গণপিটুনিতে আহত হওয়ার প্রমাণ তো ছিলই।

উদয়ের সঙ্গে অভিযুক্তদের পুরনো শত্রুতা এবং অফিসে এসে হুমকির উল্লেখ ছিল চার্জশিটে, মোটিভ এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে। অনেক জটিল খুনের মামলার তদন্তের অভিজ্ঞতা ছিল অতনুর। সে তুলনায় এটা ছিল ঢের বেশি সরল, সোজাসাপটা। চার্জশিট জমা দেওয়ার সময় ভেবেছিলেন, কনভিকশন নিশ্চিত। ভুল ভেবেছিলেন।

ঘটনার পর ফুটপাথে জমাট-বাঁধা রক্ত

তদন্তপ্রক্রিয়া একটা বৃত্তের মতো। যে বৃত্তের তিনটে অংশ। প্রথম, ঘটে যাওয়া অপরাধ। দ্বিতীয়, অপরাধটা কীভাবে ঘটল, কেন ঘটল, কে ঘটাল, তার অনুসন্ধান। এবং অপরাধীকে চিহ্নিত করা। লিখলাম বটে ‘অপরাধী’, আসলে তো অভিযুক্ত। যতক্ষণ না আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে ধৃত, অভিযুক্তের গায়ে তকমা লাগানো যায় না অপরাধীর। এখানেই বৃত্তের তৃতীয় অংশের প্রবেশ। সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্রিত করে পেশ করা চার্জশিট। এবং বিচারপর্বের চাপানউতোর।

আদ্যন্ত রসকষহীন এই তৃতীয় অংশটা। তদন্তপর্বে পুলিশের কাছে বয়ান দেওয়ার সময় যে যা বলেছিলেন, বিচারপর্বে তার অর্ধেকের বেশি সাধারণত মনেই থাকে না সাক্ষীর। কারণ, পুলিশকে বয়ান আর আদালতে সাক্ষ্যদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে অনেক। দু’-তিন বছর গড়িয়ে যায় কখনও কখনও, কখনও তার ঢের বেশি। বিচারের সময় যখন দিন ধার্য হয় কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের, তদন্তকারীকে খেয়াল রাখতে হয়, দুই বয়ান যেন মিলে যায় হুবহু, অসংগতি যেন না থাকে। মনে করিয়ে দিতে হয়, ‘তখন আমাদের এই বলেছিলেন।’ আগাগোড়াই যোগাযোগ রাখতে হয় সাক্ষীদের সঙ্গে। সে যে যেখানেই থাকুন।

আরও ঝক্কি আছে হাজার। চার্জশিট জমা করার সময় যে সাক্ষীদের সত্যনিষ্ঠ মনে হয়, তাদেরই কেউ কেউ বিচারপর্বে উলটো গাইতে শুরু করে, প্রভাবিত হয়ে পড়ে তদন্ত আর বিচারের মধ্যবর্তী সময়ে। এমনও দেখেছি আমরা, চার্জশিট দেওয়া আর সাক্ষ্যদান শুরু হওয়ার মধ্যে মূল সাক্ষীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে প্রধান অভিযুক্তের বোনের। এখন সাক্ষী যে শ্যালকের বিরুদ্ধে বিরূপ সাক্ষ্য দেবে না, জানা কথাই।

গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয় পদ্ধতিগত বিলম্ব। যে ডাক্তার কলকাতায় পোস্টমর্টেম করেছিলেন ঘটনার পর, তিনি হয়তো মাঝের বছরগুলোয় বদলি হয়ে গেছেন প্রত্যন্ত কোনও জেলায়, আসতে পারলেন না সাক্ষ্যদানের নির্দিষ্ট দিনে। পরের দিন ধার্য হল মাসদুয়েক পরে। আর, জটিল মামলায় সাক্ষীর সংখ্যা তো থাকে ন্যূনতম পঞ্চাশ-ষাট। প্রত্যেকের সাক্ষ্য, বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলের জেরা... সময় লাগে। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। বস্তুত, বছরের পর বছর যায়। ধৈর্যের ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙতে ভাঙতে পুঁজি একসময় তলানিতে এসে ঠেকে।

তবু মাঠ ছাড়া যায় না। পুরো প্রক্রিয়াটায় লেগে থাকতে হয় শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত। কিনারার কেরামতি অর্থহীন, যদি না দোষী সাব্যস্ত করা যায় অপরাধীকে। বিচারে যদি ছাড়া পেয়ে যায় অভিযুক্ত, দিনের শেষে হাতে পেনসিলও পড়ে থাকে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায়, প্রি-টেস্টে স্টার মার্কস, টেস্টে সব সাবজেক্টে লেটার, কিন্তু মাধ্যমিকে গিয়ে কম্পার্টমেন্টাল।

৩০ অগস্ট, ২০০১, যেদিন রায় বেরবে।

আদালত চত্বরে ঢুকেই খটকা লাগে অতনুর। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা একদল যুবকের জটলা এজলাস কক্ষের বাইরে। চেহারায় উগ্রতা, হইহই আড্ডা দিচ্ছে অভিযুক্তদের আইনজীবীর সঙ্গে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এরা বামার আশ্রয়পুষ্ট খুচরো মস্তান। সে হোক, কিন্তু এত ফুর্তি কীসের, আর এত সাজগোজের ঘটাই বা কেন? শাস্তি যাদের আসন্ন, তাদের কাছের লোকদের মুখ চুন করে আদালতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছেন এতদিন। আজ উলটপুরাণ?

কেন ফুর্তি, কেন সাজগোজ, রায়দান শুরু হতেই বুঝতে পারেন অতনু। হতভম্ব হয়ে যান দেখে, আটের দশকের সেই দুই কুখ্যাত পাকিস্তানি আম্পায়ার শাকুর রানা আর খিজার হায়াতকেও লজ্জা দিচ্ছে বিচারকের বক্তব্য। অভিযুক্তদের পক্ষে যিনি যুক্তিজাল সাজাচ্ছেন দৃষ্টিকটু রকমের একপেশে।

গুলিই যদি চলেছিল, কার্তুজের খোল পাওয়া গেল না স্পটে? এই দিয়ে শুরু। সওয়াল-জবাবের সময়ও এ প্রশ্ন উঠেছিল। সরকারি আইনজীবী বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, খোল পাওয়া যায়নি, ঠিকই। কিন্তু তা থেকে গুলি চলেইনি, এটা ভাবা সরলীকরণ হবে। ওইরকম জনবসতিপূর্ণ জায়গা। বোমা-গুলি চলার অন্তত আধঘণ্টা পর পুলিশ এসেছে। আগে গণ্ডগোল সামলেছে। ঘটনার দেড়-দু'ঘণ্টা পরে ভাল করে দেখতে পেরেছে ঘটনাস্থল। যেখানে কমপক্ষে দু'-তিনশো লোক আসা-যাওয়া করেছে তার আগে। খোল কার পায়ের ধাক্কায় কোথায় ছিটকে পড়েছে হয়তো। পাওয়া যায়নি। হতেই তো পারে, অসম্ভব কি?' রায়ে বিচারক উড়িয়ে দিলেন সেই যুক্তি। লিখলেন, ঘটনায় আদৌ ব্যবহৃতই হয়নি আগ্নেয়াস্ত্র। পুরোটাই সাজিয়ে বলেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

কেন সাজিয়ে বলবে? বিচারকের রায়ে যুক্তি, নিহিত স্বার্থের জন্য বলবে। উদয়ের দলের সঙ্গে ব্যবসায়িক শত্রুতা তৈরি হয়েছিল বামার দলের। উদয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের ছেলেদের ফাঁসানোর এই সোনার সুযোগ হাতছাড়া করেনি রঞ্জিত-নিতাই এবং অকুস্থলে উপস্থিত উদয়ের অনুগামীরা। এদের বয়ানের উপর কোনওভাবেই নির্ভর করা চলে না। উদয়কে মেরেছে অন্য কোনও দল, অন্য আততায়ীরা। বামার দল নয়। আর, উদয়ের যা পূর্বইতিহাস, শত্রুসংখ্যা অনেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। খুনের মামলা চলছে এখনও উদয়ের নামে। এই লোক অনেকেরই টার্গেট হতে পারে। রঞ্জিত নিজের ভাই, আর নিতাই বহু বছরের কর্মী। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

নিম্ন আদালতের সেই বিতর্কিত বিচারসিদ্ধান্তের শেষাংশ

দোসার দোকানের কর্মচারী বাচ্চু বিচারপর্বে 'hostile witness'-এর (বিরূপ সাক্ষী) ভূমিকা নেওয়ায় 'সাজানো গল্পের' তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সুবিধে হয়েছিল বিচারকের। বাচ্চু পুলিশকে বলেছিলেন, অভিযুক্তদের দেখলে চিনতে পারবেন। Test Identification Parade-এ বেমালুম অস্বীকার করেছিলেন বামা-টুটিদের চিনতে। অতনু অনেক পরে জানতে চেয়েছিলেন এই ভোলবদলের কারণ। বাচ্চু করজোড়ে জানিয়েছিলেন, 'উপায় ছিল না স্যার। সাক্ষ্য দেওয়ার আগের দিন বামার দলের ছেলেপুলেরা বাড়িতে এসে বলে গিয়েছিল, "কোর্টে উলটোসিধে বললে বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।"'

কিন্তু গণপিটুনিতে রিভলভার সমেত বাদলের আহত হওয়া? এসএসকেএম-এর ডাক্তারের কাছে দেওয়া বয়ান, 'আমাকে ধাওয়া করে প্রচণ্ড মেরেছে কিছু লোক।' নস্যাৎ করে দেওয়া হল রায়ে। বলা হল, পুরোটা পুলিশ বানিয়েছে। না হলে পুলিশ বাদলের গণপিটুনির ব্যাপারে একজনও প্রত্যক্ষদর্শীকে আদালতে হাজির করাতে পারল না কেন? বাদল যেটা বলেছে বিচারপর্বে, সেটাই বরং বিশ্বাসযোগ্য। কী? না, পুলিশ কেস সাজাতে বাদলকে তার বাড়ি থেকে তুলে এনে মারধর করে রিভলভার গুঁজে দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে কী বয়ান দিতে হবে, সেটা শিখিয়েছে। কথা না শুনলে পুরো পরিবারকে মিথ্যে কেসে জড়িয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে। আসলে বাদল স্পটে ছিলই না। বামা-পটা-টুটিও ছিল না।

তা হলে কারা মারল উদয় আর নরেশকে? বিচারকের জবাব তৈরিই ছিল রায়ে। এক ভদ্রলোকের সেলুন

ছিল ঘটনাস্থলের ফুটবিশেক দূরে। চার্জশিটে তাঁকে সাক্ষী করেছিলেন অতনু। জেরার সময় অভিযুক্তদের আইনজীবী প্রচুর প্রশ্ন করেছিলেন নেহাতই সাদাসিধে সেলুনমালিককে। যার একটা ছিল, 'বোমের আওয়াজ শুনেছিলেন যখন, তারপর কোনও গাড়ি যেতে দেখেছিলেন সেলুনের পাশ দিয়ে?' কত গাড়িরই তো যাতায়াত ওই রাস্তা দিয়ে প্রতি মিনিটে। উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, গাড়ি তো গিয়েছিল একটা বোমের আওয়াজ শোনার পর।'

কিমাশ্চর্যম, সব বাদ দিয়ে শুধু এই সাক্ষ্যকেই হাতিয়ার করে বিচারক রায়ে লিখলেন, আসলে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা গাড়ি করে এসে বোমা মেরে পালিয়েছে। মিথ্যে কেস সাজিয়ে অভিযুক্তদের ফাঁসানোর অপচেষ্টার জন্য ভর্ৎসনা প্রাপ্য তদন্তকারী অফিসারের।

সুতরাং, 'after considering all the evidences, oral and documentary, I am of the view that prosecution has failed to prove that the accused persons have committed the murder beyond reasonable doubt.' বামা-পটা-টুটি বেকসুর খালাস। শাস্তি শুধু বাদলের, অস্ত্র আইনে। মাত্র দু'বছরের কারাদণ্ড।

অতঃপর বেকসুর খালাস, আলিপুর কোর্টে আবির-উৎসব এবং বাক্‌রুদ্ধ অতনুর প্রতি যথেচ্ছ শ্লেষ-বিদ্রুপ-কটাক্ষ। লালবাজার 'ফুটে ফুলকপি!'

এতটাই হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন অতনু, প্রায় ডিপ্রেশনে চলে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। সাহস জুগিয়েছিলেন নগরপাল স্বয়ং, সিদ্ধান্ত হয়েছিল রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ার। ফের শুরু হয়েছিল লড়াই। যে লড়াইয়ে ফের ধৈর্য বন্ধক রাখতে হয়েছিল, যে লড়াই স্থায়ী হয়েছিল প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি। শেষমেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একত্রিশ পাতার রায়ে তুলোধোনা করেছিলেন নিম্ন আদালতের রায়কে। স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আগের রায় ছিল প্রভাবিত এবং পূর্বনির্ধারিত, 'and we believe it will not be unfair on our part if we bring on record that appreciation of evidence done by the learned Judge was, in fact, perverse and in a preconceived manner'... বদলে গিয়েছিল রায়। অতনুর যুক্তিজাল পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল হাইকোর্টের বিচারকদের। যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হয়েছিল চার অভিযুক্ত।

হাইকোর্টের তীব্র ভর্ৎসনা নিম্ন আদালতের বিচারককে

হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে একটু আগে। অতনু বেরিয়ে আসেন আদালত চত্বর থেকে। পৌনে পাঁচটা বাজে। বিকেল একটু একটু করে সন্ধেকে জায়গা করে দিচ্ছে ড্রেস রিহার্সালের। গাড়ি ছেড়ে দেন অতনু। কতটাই বা দূরত্ব হাইকোর্ট থেকে লালবাজারের? মাথাটা হালকা লাগছে বহুদিন পর। হাঁটা যাক আজ। বেরনোর মুখে শুনেছেন, অভিযুক্তদের আইনজীবী বলছেন সদম্ভে, সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। সে যান। আইনের উপর ভরসা ফিরে এসেছে আজকের রায়ে। যাক না ওরা সুপ্রিম কোর্টে, যাক না!

সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেছিল হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গে। ফের সমালোচিত হয়েছিল নিম্ন আদালতের বিচার।

বলা হয়, জাস্টিস ডিলেইড ইজ় জাস্টিস ডিনায়েড। ন্যায়বিচারে দেরির অর্থ ন্যায় থেকে বঞ্চিত হওয়াই। ভুল, এই মামলার চূড়ান্ত পরিণতিতে মনে হয়েছিল অতনুর (বর্তমানে গোয়েন্দা বিভাগেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার)। দেরি হয়েছিল, অনেকটাই দেরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি শেষমেশ। বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর মিলে গিয়েছিল অপরাধ আর শাস্তির হিসেব। মনে হয়েছিল অতনুর, কেউ না কেউ বোধহয় সবার অলক্ষ্যে জীবনের পাওনাগন্ডার ব্যালান্সশিটে নজর রাখেন আগাগোড়া, দিনের শেষে সব মিলিয়ে দেবেন বলে।

মেলাবেন তিনি মেলাবেন!

‘দরজা ভাঙলেই গুলি করব!’

তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত...

নয়ের দশকের সেই সুপারহিট গান। লাস্যময়ী রবিনা ট্যান্ডনের লিপে। বাজছে ফুল ভলিউমে। তালে তালে উদ্দাম নাচছেন এক স্বল্পবাস সুন্দরী। যাঁর শরীরী বিভঙ্গের চুম্বক আচ্ছন্ন রেখেছে দর্শকদের। যিনি নাচতে নাচতেই উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিচ্ছেন মোহিনী ভঙ্গিতে। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে নিশিবাসর। ঠোক্কর লাগছে গ্লাসে-গ্লাসে। চিয়ার্স! উল্লাস!

ম্যানেজার ব্যস্তসমস্ত তদারকিতে। মধ্য কলকাতার এই বার-কাম-রেস্তোরাঁয় প্রায় দশ বছর হয়ে গেল তাঁর। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদেরই ভিড় মূলত এখানে। ‘পুশ-পুল’ লেখা সুইংডোর নেই। এসি নেই। ফটফট করে ইংরেজি-বলা ওয়েটার নেই। যা যা থাকে অভিজাত এলাকার নিশিনিলয়ে, তার কিছুই নেই। তবু শনিবার সন্ধে হলেই স্বল্প পরিসরের এই বার কালো মাথায় টইটম্বুর। রাত ন’টার পর এখানে টেবিল খালি পাওয়া আর রাজ্য লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজের মধ্যে তফাত নেই বিশেষ।

—এক মিনিট শুনবেন?

ম্যানেজার ফিরে তাকান প্রশ্নকর্তার দিকে। মধ্যতিরিশের এক সপ্রতিভ যুবক। চোখে রিমলেস চশমা।

—হ্যাঁ বলুন, জায়গা তো এখন দেখছেনই খালি নেই। বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।

যুবক হাসেন। গানবাজনা চলছে যা তারস্বরে, হ্যান্ডশেকের দূরত্বেও একে অন্যের কথা শুনতে পাওয়া দুষ্কর। যুবক কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনেন ম্যানেজার ভদ্রলোকের, কিছু একটা বলতে। শোনামাত্র মুখের ভাব বদলে যায় ম্যানেজারের। দ্রুতপায়ে পৌঁছে যান বারের এক প্রান্তের কাঠের পাটাতনের কাছে। যেখানে কোমর দোলাচ্ছেন সুন্দরী যুবতী, গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে বসে আছেন বাদ্যযন্ত্রীরা।

গানটা শেষ হওয়ার যা অপেক্ষা। যুবতীর কানে ফিসফিস করেন ম্যানেজার। ত্রস্ত পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসেন যুবতী। স্বল্পবেশেই বেরিয়ে আসেন বাইরে। চশমা-পরা যে যুবক একটু আগে ম্যানেজারকে কানে কানে কিছু বলার পরই এইসব, তিনিও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। এবং তাঁর পাশে উদয় হয়েছেন শক্তসমর্থ চেহারার আরও চারজন। যাঁদের মধ্যে দু’জন মহিলা।

সোজাসুজি নির্দেশ জারি করেন রিমলেস চশমার যুবক, নর্তকী যুবতীর চোখে চোখ রেখে।

—আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

যুবতী হতভম্ব। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগে একটু।

—মানে? যেতে হবে মানে? কোথায় যেতে হবে? আপনারা কারা? কোথা থেকে আসছেন?

—লালবাজার।

.৩৮ রিভলভার। লোডেড। বুশ শার্টের নীচে কোমরে গোঁজা রয়েছে ওঁদের।

‘ওঁদের’ মানে ওঁদের আটজনের। উর্দি পরে আসেননি কেউই। সবাই প্লেন ড্রেসে আজ।

ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার আগে চোখাচোখি হয় ওঁদের। শুধু চোখাচোখিই। কথা হয় না কোনও। যা

কথা হওয়ার, হয়ে গেছে আগে। কী কথা?

ঘরের ভিতর যারা আছে, তারা অত্যন্ত মারাত্মক প্রকৃতির। বেপরোয়া। সামান্যতম বিপদের গন্ধ পেলেই ধুমধাড়াক্কা গুলি চালাবে। বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে পালটা গুলি চালাতে হবে। ঘরে ঢোকার এবং বেরনোর এই একটাই রাস্তা। অনেক ভুগিয়েছে এরা। হাড়মাস কালি করে দিয়েছে। যা-ই হয়ে যাক, পালাতে দেওয়া যাবে না। হয় এসপার, নয় ওসপার।

মাঝরাত পেরিয়ে ঘড়িতে প্রায় তিনটে। এমন একটা সময়, যখন স্ট্রিট লাইটগুলো পর্যন্ত সামান্য স্তিমিত। ঢুলছে। এমন একটা সময়, যখন রাস্তার কুকুরগুলোও সাময়িক স্থগিত রেখেছে অপরিচিত আগন্তুক দেখলেই 'ঘেউ ঘেউ'। জিরিয়ে নিচ্ছে দু'দণ্ড। পাড়া জাগিয়ে চিলচিৎকার করার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে।

ভেবেচিন্তেই বাছা হয়েছে সময়টা। নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে কোনও দুর্ধর্ষ অপরাধীর আস্তানায় রেইড করতে গেলে ওটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। ওটাই ব্রাহ্মমুহূর্ত। যাকে ধরতে যাওয়া, তার ঘুমিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। আর একটা সুবিধে, আশেপাশের বাড়ি-ঘরদোরেও ঘুমিয়ে থাকেন বাসিন্দারা। রাস্তা থাকে শুনশান। পুলিশের গতিবিধির আগাম খবর অপরাধী পেয়ে যাবে স্থানীয় সূত্রে এবং চম্পট দেবে, সে আশঙ্কাও থাকে না বড় একটা।

কড়া নাড়া হল দরজায়। নেড়ে দরজার দু'পাশে ভাগ হয়ে গেলেন ওঁরা। সিনেমায় যেমন হয়। একদিকে চার, অন্যদিকে বাকি চার। উত্তর নেই ভিতর থেকে। ফের ঠক্ ঠক্ দরজায়। এবার জবাব এল।

—কে?

—পুলিশ। লালবাজার থেকে আসছি। দরজাটা খুলুন। দরকার আছে।

সেকেন্ড দশেকের নীরবতার পর ভিতর থেকে ফের ছিটকে এল উত্তর। গলার স্বরে মরিয়া ভাবটা স্পষ্ট।

—পুলিশ হোক আর যে-ই হোক, ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করব।

গুলি করার হুমকি যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, জানতেনই ঘরের বাইরে থাকা অফিসাররা। যাঁদের কোমরে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উঠে এল নিমেষে। ট্রিগার স্পর্শ পেল আঙুলের।

দরজা যে ভাঙতে হতে পারে, সেটাও জানার মধ্যেই ছিল। এবং ছিল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও। শাবল-গাঁইতি আনা হয়েছিল ব্যাগে করে।

প্রয়োজন হল না অবশ্য। তেমন পোক্ত দরজা নয়। সজোরে গোটা দশেক লাথিতেই কলকবজা দেহ রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ছুটে এল গুলি। কাঁধ চেপে বসে পড়লেন এক অফিসার। পালটা গুলি চালানো ছাড়া উপায় কী আর?

সত্যিই এসপার-ওসপার!

—অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি জাস্ট একটা প্রশ্ন করে মিটিং শেষ করব!

নগরপালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান লালবাজারের কনফারেন্স রুমে উপস্থিত অফিসাররা। কী প্রশ্ন? থেমে থেমে ঠান্ডা গলায় বলতে থাকেন সিপি।

—হোয়াট নেক্সট? আমরা কি ছ'নম্বর ডাকাতিটার জন্য অপেক্ষা করব? আর ছয়ের পর সাত নম্বরের জন্য?

লালবাজারের কনফারেন্স রুমে নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে আসে। পিন পড়লেও মনে হবে, চকলেট বোম ফাটল বুঝি। গোয়েন্দা বিভাগের Anti-dacoity বিভাগের সমস্ত অফিসার উপস্থিত। আছেন ডিসি ডিডি। সবার ঠোঁটে যেন সাইলেন্সার লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।

কী-ই বা বলবেন ওঁরা সিপি-র প্রশ্নের উত্তরে? বলার মুখ থাকলে তো বলবেন! তিন মাসের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা ডাকাতি শহরের বুকে! এবং ডাকাতদের ধরা তো দূরস্থান, চিহ্নিতই করা যায়নি এখনও। অথচ জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে যখন প্রথম ডাকাতিটা হয়েছিল, গোয়েন্দারা দূরতম কল্পনাতেও ভাবেননি, পরের

কয়েক মাসে তাঁরা পেশাগত জীবনের কঠিনতম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছেন।

১৯ জুলাই, ১৯৯৭। শনিবার। ট্যাংরা অঞ্চলের ৫২ডি, রাধানাথ চৌধুরী রোডের ফেডারাল ব্যাংকে কোলাপসিবল গেট বন্ধ করার প্রস্তুতি চলছে। বেলা বারোটা প্রায় বাজতে চলল। শনিবার গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় বারোটায়। জনাচারেক গ্রাহক এখনও কাউন্টারে আছেন। ওঁরা কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেই ঝাঁপ ফেলে দেওয়া হবে রুটিনমাফিক।

কোথায় কাউন্টার বন্ধ করা, আর কোথায় ঝাঁপ ফেলা! বারোটা বাজার আগেই ব্যাংকের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ছ'জন যুবক। যাদের চারজনের হাতে রিভলভার। বাকিদের হাতে ছুরি। যে চারজন গ্রাহক ক্যাশ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের দিকে রিভলভার তাক করে আদেশ দিল এক যুবক।

—একটাও শব্দ করবেন না। করলে জানে মেরে দেব। চুপচাপ ওখানে গিয়ে বসে থাকুন। যান ওখানে!

'ওখানে' মানে দেওয়ালের এক কোণে। কাঁপতে কাঁপতে সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন চারজন। পাহারায় সামনে দাঁড়িয়ে রইল রিভলভারধারী।

ততক্ষণে ব্যাংকের ল্যান্ডলাইনের তার কেটে দিয়েছে যুবকের দল। দুই ক্যাশিয়ারকে টেনে বার করে এনেছে কাউন্টারের ভিতর থেকে। এবং টাকার গোছা গোছা বান্ডিল তিন যুবক ভরতে শুরু করেছে সঙ্গে আনা থলেতে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রামচন্দ্রন নায়ার আর দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গণপতি পেরুমল এবং সি জে অগাস্টিন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন কেবিন থেকে। বাইরে কিছু একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে। দুই যুবক নিমেষে রিভলভার মাথায় ঠেকিয়ে দিল রামচন্দ্রন আর পেরুমলের। অগাস্টিন থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নিজেই মাটিতে বসে পড়লেন।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মাথায় রিভলভার ধরে এরপর স্ট্রংরুমে নিয়ে যাওয়া, ভল্ট খোলানো এবং ডাকাতদলের থলি দ্রুত ভরতি হয়ে যাওয়া টাকার বান্ডিলে। রামচন্দ্রন কিছু একটা বলতে গেলেন। 'বারণ করলাম না শব্দ করতে?' বলে রিভলভারের বাঁট দিয়ে সজোরে ভদ্রলোকের কপালে আঘাত করল এক যুবক। রক্তপাত অঝোরে। ব্যাংকের সমস্ত কর্মচারী নিথর বসে রইলেন নিজের নিজের চেয়ারে। চোখেমুখে প্রবল আতঙ্কের আঁকিবুকি নিয়ে।

আধঘণ্টার মধ্যে অপারেশন কমপ্লিট। আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা লুঠ করে তিনটে মোটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে উধাও ডাকাতরা। এন্টালি থানার অফিসাররা যখন খবর পেয়ে এলেন, যখন এসে পৌঁছলেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা, তখনও আতঙ্কের ঘোর কাটেনি এলাকায়। তখনও ঘটনার বিবরণ দিতে গলা কাঁপছে ব্যাংকের কর্মচারীদের।

পোশাক কেমন ছিল?— হাফ শার্ট আর ট্রাউজার। চেহারা?— মাঝারি হাইট এবং দোহারা গড়ন সবারই। একজন ছাড়া। যে তুলনায় বেঁটে, মোটাসোটা। রামচন্দ্রনের ভাষায়, 'hefty and bulky'।

কী ভাষায় কথা বলছিল?— পরিষ্কার জড়তাহীন বাংলায়।

কেউ কাউকে নাম ধরে ডেকেছিল, যতক্ষণ ব্যাংকের মধ্যে ছিল? —না।

কারও চেহারায় কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়েছিল? টাকমাথা বা গালে আঁচিল? কপালে কাটা দাগ বা টেনে টেনে হাঁটা? কোনও কিছু এমন, যা দিয়ে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করা যায়? — না, তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না!

বয়স? —এই পঁচিশ-তিরিশের মধ্যে হবে আন্দাজ। শুধু ওই বেঁটে মোটা লোকটাকে দেখে বয়স সামান্য বেশি বলে মনে হয়েছে।

আবার দেখলে ওদের চিনতে পারবেন? —হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ডেফিনিটলি পারব।

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধের স্তরবিভেদ আছে। Offences against body, অর্থাৎ শারীরিক আঘাতজনিত

অপরাধ। খুচরো মারামারি থেকে শুরু করে খুন পর্যন্ত। Offences against property, সম্পত্তির ক্ষতি সংক্রান্ত অপরাধ। পকেটমারি, ছিঁচকে চুরি থেকে ডাকাতি পর্যন্ত।

সম্পত্তিজনিত অপরাধের তালিকায় শীর্ষবাছাই, লেখা বাহুল্য, ডাকাতিই। Offences against property-র মধ্যে সাধারণভাবে কোন অপরাধকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত? বিশ্বের সমস্ত পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের এই প্রশ্নের জবাবে তিন অক্ষরের একটা শব্দই বরাদ্দ থাকে। ডাকাতি।

কেন, সহজবোধ্যই। একটা খুন হওয়ার নানারকম কারণ থাকতে পারে। সে টাকার লোভ বলুন, ব্যক্তিগত দ্বেষ বলুন, প্রেমঘটিত আক্রোশ বলুন বা যৌন-ঈর্ষা। কারণ সে যা-ই হোক, একটা বিচ্ছিন্ন খুন সামগ্রিকভাবে আমার-আপনার মধ্যে নিরাপত্তাবোধের তীব্র অভাব জাগিয়ে তোলে না। কিন্তু ডাকাতি? পাড়ায় যদি একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে যায়, মারধর করে লুঠপাট চালিয়ে যায় ডাকাতরা? প্রতিবেশীদের মনে অবধারিত তৈরি হয় ভয় আর আতঙ্কের যুগলবন্দি। কাল ওই বাড়িটায় হয়েছে, পরশু যে আমার বাড়িতে হবে না, কী গ্যারান্টি?

এই কারণেই ভারতীয় দণ্ডবিধিতে 'ডাকাতি'-র চারটি পর্যায় চিহ্নিত করে শাস্তির বিধান রয়েছে। ডাকাতির জন্য জড়ো হওয়া। ডাকাতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র সমেত প্রস্তুতি নিয়ে একত্রিত হওয়া। ডাকাতির চেষ্টা। এবং ডাকাতি সংঘটিত করা।

ডাকাতির মধ্যে আবার চরিত্রভেদ রয়েছে। বাড়িতে হতে পারে। দোকানে হতে পারে। পথচলতি গাড়ি থামিয়ে হতে পারে। কিনারা করা কতটা দুরূহ, সেটা যদি মানদণ্ড হয়, তবে পুলিশের কাছে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হল ব্যাংক-ডাকাতি।

কেন তুলনায় বেশি চ্যালেঞ্জিং? গোপন কিছু নয়। দুর্বোধ্যও নয়। প্রথমত, সব ডাকাত ব্যাংক-ডাকাত নয়, কেউ কেউ ব্যাংক-ডাকাত। ব্যাংক-ডাকাতি একটা 'specialized crime', বাড়ি-গাড়ি-দোকানে ডাকাতির থেকে আলাদা। অন্য কোথাও ডাকাতির তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকি আর সাহস লাগে ব্যাংকলুঠে। যা করতে হয়, দিনের বেলায় করতে হয় ডাকাতদের। রাতবিরেতে আচমকা হানা দিয়ে কাজ হাসিল করার গল্প নেই কোনও। এবং যেহেতু দিনের বেলায়, যেহেতু গ্রাহক এবং কর্মীদের উপস্থিতিতে দুষ্কর্ম, ধরা পড়ে যাওয়ার চান্স ঢের বেশি। চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি। ডাকাতির সময় প্রতিরোধের মুখে পড়লে কী করব, লুঠের পর কীভাবে কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় পালাব যত দ্রুত সম্ভব, কোথায় কীভাবে গা ঢাকা দেব, লুঠের টাকা কার কাছে কতটা থাকবে, সব নিখুঁত ভেবে রাখতে হয় আগে থেকে। সামান্য ভুলচুক হলেই ভরাডুবি অনিবার্য এবং শ্রীঘরযাত্রা।

দ্বিতীয়ত, কোনও বাড়ি বা দোকানে অতর্কিত হামলা করে 'আলমারির চাবি কোথায়?' বলা আর ভয় দেখিয়ে টাকাপয়সা-গয়নাগাটি কেড়ে নেওয়ার তুলনায় ব্যাংকলুঠ অনেক বেশি কঠিন। প্রথমটা পাস কোর্স হলে দ্বিতীয়টা অনার্স। আগে থেকে ব্যাংকের অবস্থানগত খুঁটিনাটি জেনে রাখতে হয়। সরেজমিনে দেখে যেতে হয় একাধিকবার। যাকে বলে recce করা।

ঢোকা-বেরনোর গেট কতটা প্রশস্ত, ক'টা ক্যাশ কাউন্টার, কতজন কর্মী, কে কোথায় বসেন, ম্যানেজারের ঘর কোনটা, স্ট্রং রুম কোথায়, সব মাথায় রেখে তবে প্ল্যান করে ব্যাংক-ডাকাতরা। এবং সবচেয়ে জরুরি, ব্যাংকে চড়াও হওয়ার সময়টা। পুরনো রেকর্ড খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, হয় ব্যাংক খোলার সময়, বা বন্ধ হওয়ার সময়, বা ভরদুপুরে সিংহভাগ ব্যাংক-ডাকাতি ঘটে থাকে। এমন একটা সময়ে, যখন গ্রাহকের ভিড় জমাট বাঁধেনি ব্যাংকে। দিনের শুরু বা শেষে যখন কর্মীরাও একটু অগোছালো, একটু ঢিলেঢালা। পেশাদারি প্ল্যানিংয়ে অপরাধটা হয় বলেই ব্যাংক-ডাকাতির কিনারা দুরূহতর হয়ে দাঁড়ায় তুলনামূলক ভাবে।

ফেডারাল ব্যাংকের ডাকাতিটার পর প্রথাসিদ্ধ পথেই এগিয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগ। এক, ব্যাংকের কর্মী এবং গ্রাহক যাঁরা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী ব্যাংক-ডাকাতদের ছবি আঁকানো, 'Portrait Parle'। এবং আঁকানোর পর সেই ছবি মিলিয়ে দেখা অতীতে ধরা পড়া ব্যাংক-ডাকাতদের সঙ্গে।

ছবি ছড়িয়ে দেওয়া সোর্সদের মধ্যে। সোর্সদের ভূমিকায় পরে আসছি বিস্তারিত। এক লাইনে সেরে দেওয়া যাবে না এই কাহিনিতে।

দুই, শহরে তো বটেই, গত দশ বছরে রাজ্যের সমস্ত ব্যাংক-ডাকাতির রেকর্ড দেখা খুঁটিয়ে। যারা ধরা পড়েছিল পুরনো মামলায়, তাদের ছবির সঙ্গে কোনও মিল আছে ডাকাতদের? পুরনো গ্যাংগুলোর 'মোডাস অপারেন্ডি'-র সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য? পুরনো কেসে ধৃত ডাকাতদের কারা কারা এখন জামিনে জেলের বাইরে? কী তাদের গতিবিধি? দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনা বাস্তবে তো আর খুব বেশি ঘটে না!

চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না anti-dacoity বিভাগের অফিসারদের। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সূত্র ছিল অমিল। প্রায় দু'মাস কেটে গিয়েছিল ট্যাংরার ডাকাতির পর। সমাধান ছিল অধরাই। এবং যত দেরি হচ্ছিল, প্রমাদ গুনছিলেন অফিসাররা। পুলিশে বলা হয়, 'The best way to prevent the recurrence of a crime is to detect it.' অপরাধের পুনরাবৃত্তিকে প্রতিহত করার সেরা রাস্তা একটাই। অপরাধের কিনারা করে ফেলা যথাসাধ্য দ্রুত। এক্ষেত্রে 'ডিটেকশন' এখনও দূর অস্ত। শহরে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে কয়েকশো ব্যাংক। সর্বত্র সবসময় নজরদারি সম্ভব, সম্ভব এভাবে 'প্রিভেনশন'? যা মনে হচ্ছে, নতুন কোনও গ্যাং। বেপরোয়া এবং মরিয়া। একটা ক্রাইম করে সাধারণত থেমে যায় না এরা।

থামলও না। ১৯ জুলাইয়ের পর ৬ সেপ্টেম্বর। ট্যাংরার পর আলিপুর। ফেডারাল ব্যাংকের পর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। মোমিনপুর ব্রাঞ্চ। সকাল ১১-২৫ থেকে ১১-৪৫, কুড়ি মিনিটের অপারেশন একই কায়দায়। রিভলভারের বাঁটের আঘাত ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেন্টের মাথায়। চার লক্ষ আট হাজার চারশো তেরো টাকা লুঠ করে ছ'জনের ডাকাতদল উধাও! একটা মারুতি এবং দুটো মোটরসাইকেলে করে।

আলিপুরের ডাকাতির সপ্তাহ তিনেক পরেই, ২৮ সেপ্টেম্বর, লেক থানা এলাকার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় হানা দিল ডাকাতরা। একটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে। সেই পাঁচ-ছয় জনের দল, সেই একই পদ্ধতি। আচরণ অবশ্য হিংস্রতর। ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিতে গেছিলেন, সটান গুলি চালিয়ে দিল এক ডাকাত। ভোজালির আঘাতে রক্ত ঝরল আরও তিনজন ব্যাংককর্মীর। গুলিবিদ্ধ নিরাপত্তারক্ষীকে এবং আহত হওয়া বাকিদের যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শরৎ বোস রোডের রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে, তখন বাজে প্রায় দেড়টা। যার পনেরো মিনিট আগে, সোয়া একটা নাগাদ তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা লুঠ করে চম্পট দিয়েছে ডাকাত দল।

ডাকাতি নম্বর চার, অক্টোবরের ২০ তারিখ। এবার ব্যাংকে নয়। অরবিন্দ সরণির একটা দোকানে। নাম, 'ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি'। দুপুর একটার পরে তিনটে মোটরসাইকেল এসে ব্রেক কষল দোকানের সামনে। দোকানের কর্মচারীদের রিভলভার দেখিয়ে ক্যাশবাক্স ভেঙে পাঁচ লক্ষ টাকা লুঠ। এবার রিভলভার-ভোজালির পাশাপাশি নতুন সংযোজন, বোমা। পালানোর আগে দুটো বোমা রাস্তায় ছুড়ল ডাকাতরা। স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হলেন দু'জন পথচারী। ডাকাতদের চেহারার বিবরণ? আশঙ্কা সত্যি হল, মিলে গেল আগের তিনটে ঘটনার সঙ্গে।

পঞ্চম ঘটনা নভেম্বরের সাত তারিখে। এবার টার্গেট সিইএসসি-র গাড়ি। যাচ্ছিল শ্যামবাজারের অফিস থেকে ধর্মতলার সদর দফতর ভিক্টোরিয়া হাউসে। গাড়িতে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ছিল। ছিলেন সিইএসসি-র তিনজন কর্মী এবং এক বন্দুকধারী রক্ষী। দুপুর একটা নাগাদ মহাত্মা গাঁধী রোড আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ক্রসিংয়ের কাছে ক্যাশভ্যানের পথ আটকে দাঁড়াল তিনটে মোটরসাইকেল। ড্রাইভারের মাথায় এরপর রিভলভার ঠেকানো, রক্ষীর বন্দুক কেড়ে নেওয়া, এক কর্মীর মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তপাত ঘটানো এবং পঁচিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো বারো টাকা নিয়ে তিরবেগে উধাও হয়ে যাওয়া পাঁচ-ছ'জনের দলের। যাদের চেহারার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে শুনে পুলিশের সন্দেহের ন্যূনতম অবকাশও থাকল না, এরা ওরাই। একই গ্যাং। পাঁচজন মাঝারি হাইটের, দোহারা চেহারার। একজন বেঁটে, মোটাসোটা।

১৯ জুলাই, ৬ সেপ্টেম্বর, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০ অক্টোবর, ৭ নভেম্বর। চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পাঁচটা দুঃসাহসিক ডাকাতি। লুঠ প্রায় পঞ্চাশ লাখের কাছাকাছি। যথেচ্ছ গুলি-বোমার ব্যবহার। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নড়ে গিয়েছিল লালবাজার। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল শহরে। আশঙ্কা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ত্রিভুজে দমবন্ধ অবস্থা হয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের। কারা এরা? এরপর কবে? কোথায়? কখন?

দীর্ঘ বৈঠকের পর লালবাজারের কনফারেন্স রুমে কটাক্ষের সুরে এই প্রশ্নটাই ছুড়ে দিয়েছিলেন সিপি।

—হোয়াট নেক্সট? আমরা কি ছ'নম্বর ডাকাতির জন্য অপেক্ষা করব? আর ছয়ের পর সাত নম্বরের জন্য?

সরকারের উপরমহলে ডাকাতির ঘটনাগুলোর দ্রুত সমাধানে কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতার জবাবদিহি করতে করতে সাময়িক ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল সিপি-র। যদিও নগরপাল জানতেন বিলক্ষণ, কী প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। যাঁদের কাছে দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ডাকাতির ঘটনাগুলোর চুলচেরা পোস্টমর্টেমে।

এক, কলকাতার বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 'গ্যাং' এরা। রাজ্যের বাইরের নয়। বিহারের ডাকাত-অধ্যুষিত গয়া-পাটনা-বেগুসরাই-জামুইয়ের নয়। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলেছে প্রত্যেকটা ঘটনায়। খোঁজখবরের কেন্দ্রস্থল তাই হওয়া উচিত শহর আর আশেপাশের জেলায়।

'আশেপাশে' শব্দটা শুনলে এমনিতে মনে হয় কাছেপিঠেই। খুব দূরে নয়, এমন কোনও জায়গা যেন। এক্ষেত্রে কিন্তু নামেই শুধু 'আশেপাশে'। আসলে হাজার হাজার বর্গকিলোমিটারের বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তর ২৪ পরগনায় ব্যারাকপুর মহকুমার টিটাগড়, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, নৈহাটি, বীজপুর। বারাসত সংলগ্ন এলাকার মধ্যমগ্রাম, আমডাঙা, দেগঙ্গা। সঙ্গে যোগ করুন বসিরহাট এবং বনগাঁ মহকুমার ব্যাপ্ত ভূখণ্ড। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারুইপুর-জয়নগর-কুলতলি-গোসাবা-বাসন্তী-ক্যানিং-ধামাখালি এবং সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চল। হাওড়া-হুগলি তো আছেই। একদিকে সাঁতরাগাছি-ডোমজুড়-আন্দুল ইত্যাদি। অন্যদিকে চুঁচুড়া-পোলবা-ধনেখালি-মগরা-পাণ্ডুয়া-সিঙ্গুর-চণ্ডীতলা-জাঙ্গীপাড়া প্রভৃতি।

দুই, পাঁচটা ঘটনার একটাতেও মুখ ঢাকা ছিল না ডাকাতদের। অনেকেই দেখেছে চেহারাগুলো। মনে রেখেছে। অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জনের সঙ্গে কথা বলে ছবি আঁকানো হয়েছে ছ'জনের। অথচ চিহ্নিত করা যায়নি। না পাওয়া গেছে পুরনো রেকর্ডে, না চিনতে পেরেছে সোর্সরা। নতুন গ্যাং, অথচ প্রতিটা ঘটনায় 'এ টু জেড' তুখোড় প্ল্যানিং। সিইএসসি-র টাকা কখন কোন রাস্তা দিয়ে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা যাবে, খবর ছিল নিখুঁত। অরবিন্দ সরণির দোকানের ক্যাশবাক্স ভাঙলে যে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে, অজানা ছিল না ওদের।

ডাকাতদের ছবি আঁকানোর অবশ্য প্রয়োজনই হত না আজকের দিন হলে। সব ব্যাংকে সিসি টিভি আছে আজকাল। এক মিনিটে ফুটেজ চলে আসে হাতে। ঘটনা ১৯৯৭-এর। তখন না ছিল সিসি টিভি, না ছিল হাতে হাতে মোবাইল ফোন। 'ইলেকট্রনিক ইনটেলিজেন্স'-এর সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিলেন সে-সময়ের তদন্তকারীরা। ভরসা ছিল শুধু 'হিউম্যান ইনটেলিজেন্স'। সাদা বাংলায়, সোর্স।

সোর্স। যারা পুলিশকে খবর দেয়। কারা দেয়? অপরাধের খবর, অপরাধীর খবর কি ভারত সেবাশ্রম বা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা দেবেন? অপরাধ-জগতের সঙ্গে যারা যুক্ত, অতীতে বা বর্তমানে, তারাই দেবে। তারাই দেবে খবর, অপরাধের সূত্রেই যাদের সঙ্গে কখনও কখনও যোগাযোগ হয়েছে পুলিশ অফিসারদের। যোগাযোগ থেকে ক্রমশ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে খবর আদানপ্রদানের।

সোর্স তৈরি করা এবং তাকে লালন করা এক শিল্পবিশেষ। যা আয়ত্ত না করতে পারলে সফল গোয়েন্দা হওয়ার স্বপ্ন দিনের শেষে স্রেফ সোনার পাথরবাটিই। একজন বিশ্বস্ত সোর্স তৈরি করতে কখনও কখনও লেগে যায় এক বছর বা তারও বেশি। এবং এমনও আকছার হয়, সেই সোর্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারের ব্যক্তিগত স্তরে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অফিসারের বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়েছেন, হয়তো বিরল

গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। সবার আগে সেই সোর্স হাজির হয়ে যায়, 'কী লাগবে স্যার, আমাকে বলুন।' এবং প্রাণপাত দৌড়ঝাঁপে জোগাড় করে আনে নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্তদাতা।

আবার সোর্সের পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন অফিসাররা। সে সোর্সের ছেলেমেয়েদের জন্য পুজোর জামা কিনে দেওয়াই বলুন বা তাদের স্কুলকলেজে ভরতি হওয়ার জন্য অর্থসাহায্য করা। অবসর নেওয়ার পরও বহু অফিসারের সঙ্গে সুসম্পর্ক থেকে যায় তাঁদের একসময়ের সোর্সদের। যে সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার ঊর্ধ্বে।

সোর্সকে ঠিকঠাক 'হ্যান্ডল' করতে না পারলে অবশ্য সেমসাইড গোলের সম্ভাবনা। সুযোগ পেলেই পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে অপব্যবহার করার প্রবণতা থাকে সোর্সদের একটা বড় অংশের। যারা মনে করে, পুলিশ অফিসারদের খবর দিই মানে অন্যত্র যা খুশি করার লাইসেন্স পাওয়া হয়ে গেছে।

অমুক জায়গায় হয়তো চোলাই মদের ঠেক বসেছে। তমুক জায়গায় হয়তো জুয়ার বোর্ড চলছে গোপনে। সোর্স গিয়ে টাকা আদায় করতে শুরু করে। না দিলে পুলিশকে জানিয়ে দেবে, এই ভয় দেখিয়ে। সোর্সকে তাই অনেক সময় 'ম্যানমার্কিং' করতে হয় অফিসারদের। এক সোর্সের পিছনে লাগাতে হয় অন্য সোর্স। যাতে কোনও সোর্স উইং দিয়ে ওভারল্যাপে গেলেই খবর আসে, এবং পত্রপাঠ থামিয়ে দেওয়া যায় কড়া ট্যাকলে। যাতে 'সোর্স' কোনভাবেই 'রিসোর্স' না হয়ে যায়।

পাঁচ সাব-ইনস্পেকটর তদন্ত করছিলেন ডাকাতির পাঁচটা মামলার। এন্টালির কেসের দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রনীল চৌধুরী। আলিপুরের মামলায় তরুণকুমার দে। লেকের ব্যাংক ডাকাতির তদন্ত করছিলেন রাম থাপা। সিইএসসি-র টাকা লুঠের তদন্তকারী অফিসার ছিলেন তপন সাহা এবং অরবিন্দ সরণির দোকানে ডাকাতির তদন্তভার ন্যস্ত হয়েছিল শাকিলুর রহমানের উপর। তবে যেহেতু প্রতিটি ঘটনাই সংশয়াতীত ভাবে ছিল একই দলের কীর্তি, তদন্তকারী অফিসাররা একত্রে ঝাঁপিয়েছিলেন সমাধানে। সকলের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটা করছিলেন anti-dacoity বিভাগের ওসি বিমল সাহা এবং অ্যাডিশনাল ওসি আমিনুল হক। তদন্তের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, ছিল বিমল-আমিনুলেরই দায়িত্বে।

যার যেখানে যা সোর্স ছিল, প্রত্যেককে খবর পাঠানো হয়েছিল। নগরপাল ঢালাও বরাদ্দ করেছিলেন 'সোর্সমানি'। নির্দেশ ছিল স্পষ্ট, সোর্সকে যেখানে ইচ্ছে পাঠাও খবর নিতে। যেখানে ইচ্ছে, যতদিন ইচ্ছে থাকতে হয়, থাকুক। যত খরচ হয় হোক। কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু খবর চাই। পাকা খবর। যে-কোনও মূল্যে।

চারটে 'জোন'-এ ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলোকে। হাওড়া, হুগলি, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দশ-বারো জন সোর্সকে থাকা-খাওয়ার খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিটি জোনে। সোর্সদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে প্রতি টিমের সঙ্গে ছিলেন গোয়েন্দাবিভাগের অন্তত দু'জন অফিসার।

পাঁচ তদন্তকারী অফিসার, ইন্দ্রনীল-তরুণ-রাম-তপন-শাকিলুর সারা সপ্তাহ ধরে জেলাগুলোয় চক্কর দিয়ে বেড়াতেন। রোজ কথা বলতেন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা সোর্স এবং অফিসারদের সঙ্গে।

এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তদন্তকারীরা, সোর্সের দেওয়া খবরের গুণাগুণ বিচারের বিলাসিতা ছিল না। সেই বিশেষ টিমের একজনের ভাষায়, 'নাওয়াখাওয়া ভুলতে বসার অবস্থা হয়েছিল আমাদের। যে সোর্স যখন যা বলছে, অন্ধের মতো ছুটছি তখন। ক্লু হাতে না থাকলে যা হয়। কেউ বলল, নৈহাটির শিবদাসপুরে নাকি কয়েকটা ছেলে প্রচুর টাকা ওড়াচ্ছে। ছুটলাম নৈহাটি। পরের দিনই খবর এল হয়তো, আন্দুলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কয়েক মাস ধরে সাত-আটজন লোক রয়েছে। সকালে বেরিয়ে যায়, রাতে ফেরে। কেউ জানে না কী করে ওরা। ব্যস, ছোটো আন্দুল। কিন্তু কোনও খবরই "ক্লিক" করছিল না।'

'ক্লিক' করার সামান্য আভাস মিলল '৯৮-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি। প্রথম ডাকাতির পর প্রায় ছ'মাস অতিক্রান্ত তখন। মিনাখাঁয় একজন সোর্স কিছু খবর দিয়েছিল। সেই খবর যাচাই করতে আমিনুল হক সহ পাঁচ তদন্তকারী একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে রেইড করে ফিরছিলেন কলকাতায়। নিষ্ফলা রেইড। খবরটা ভুল

ছিল।

গাড়ি ছুটছিল বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ হল ভোর হয়ে গেছে। শীতের ভোর। অফিসারদের সোয়েটার-শাল-জ্যাকেটকে বলে বলে গোল দিচ্ছে ফাঁকা হাইওয়ের উত্তুরে হাওয়া।

রাস্তার ধারের দু'-একটা চায়ের দোকান ঝাঁপ খুলেছে। ভোজেরহাটের এমনই একটা দোকানের সামনে গাড়ি ব্রেক কষল। অফিসাররা সিদ্ধান্ত নিলেন, একটু চা না হলেই নয়। ঘুমটা তো অন্তত কাটুক। হাড়-কাঁপানো ঠান্ডাটাও।

ভাঁড়ের চা, ধোঁওয়া-ওঠা। আয়েশি চুমুক দিতে দিতেই আমিনুল এবং বাকিরা লক্ষ করলেন, অন্তত পনেরো-কুড়িটা ট্রাক সার দিয়ে চলেছে বাসন্তীর দিকে। সবক'টা ইটবোঝাই। এ রাস্তায় তো এত ইটভাটা নেই! ইটভরতি ডজনখানেক ট্রাক যাচ্ছে কোথায়? কোনও ব্রেনওয়েভ নয়। কোনও মগজাস্ত্র নয়। নিছকই কৌতূহলে আমিনুল প্রশ্ন করেন চায়ের দোকানিকে।

—এতগুলো ট্রাক! সব কি ইটভাটায় যায়? এ রাস্তায় এত ইটভাটা আছে?

—না স্যার, ইটভাটা নয়। আকুঞ্জি মার্কেট তৈরি হচ্ছে তো ধামাখালিতে। ওখানে যাচ্ছে। রোজই এ সময় যায়। ইট যায়। সিমেন্ট যায়। বালি যায়।

—কী মার্কেট?

—আকুঞ্জি। আকুঞ্জি মার্কেট।

'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই'—তদন্তের চিরন্তন আপ্তবাক্য। ছাই উড়িয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যোগাযোগ করা হল ধামাখালির দু'জন সোর্সের সঙ্গে, 'খবর চাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। কোথায় মার্কেট তৈরি হচ্ছে, কারা করছে, কত টাকা খরচ হচ্ছে, সব খবর চাই।'

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল। ধামাখালির আকুঞ্জিপাড়ায় সবাই একডাকে চেনে আকুঞ্জি পরিবারকে। বিঘের পর বিঘের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মাছের ভেড়ির মালিক এই আকুঞ্জিরা। গলদা চিংড়ির রপ্তানিই প্রধান ব্যবসা। চাষবাসের জমিজমাও আছে যথেষ্ট। তবে ভেড়িই রোজগারের মূল উৎস। প্রচুর স্থানীয় লোক কাজ করে আকুঞ্জিদের ভেড়িতে। এলাকার অন্যতম সম্পন্ন পরিবার।

মাসখানেক আগে হাইওয়ে সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয়েছে আকুঞ্জি মার্কেট তৈরির কাজ। বিশাল এলাকা জুড়ে বসবে বাজার। একটা বড় বাজারের দীর্ঘদিনের অভাব স্থানীয় মানুষের। সেই অভাব দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে আকুঞ্জিরা। কাজ চলছে ঝড়ের গতিতে। ইট-বালি-চুন-সুরকি বোঝাই গাড়ির দাপাদাপি লেগেই আছে।

শুধু বাজারই নয়, মাসদেড়েক হল পাড়ায় একটা মসজিদও তৈরি করে দিয়েছে আকুঞ্জিরা। নামাজ পড়তে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে দূরের মসজিদে যেতে হত এর আগে। অসুবিধে হত বয়স্কদের। এখন পাড়ার মধ্যেই প্রার্থনার সুব্যবস্থা। সৌজন্য, আকুঞ্জি পরিবার।

যথেষ্ট ধনী পরিবার ঠিকই। কিন্তু হঠাৎ করে এত টাকা আসছে কোত্থেকে, যে রাতারাতি মসজিদ বানানো হয়ে গেল, বাজারও তৈরি হওয়ার মুখে? ভেড়ির কর্মচারীদের কাছে খোঁজ নিয়ে সোর্স জানাল, ব্যবসা চলছে আগের মতোই। মাছ রপ্তানির পরিমাণ যে হঠাৎ বেড়েছে, এমন নয়। তা হলে?

আকুঞ্জি পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হল বিস্তারিত। এবং যা জানা গেল, তাতে 'সামান্য আলোর আভাস' দেখতে পেলেন গোয়েন্দারা, দীর্ঘদিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ধুঁকতে থাকার পর রোগী জেনারেল বেডে ফেরার ছাড়পত্র পেলে যেমন হয়।

পরিবারের মাথা হলেন মধ্যপঞ্চাশের আবদুল কাদের আকুঞ্জি। চার ছেলে। বড়ছেলের বয়স তিরিশ, নাম আবদুল মাজেদ আকুঞ্জি। মেজোছেলে আঠাশ, নাম আবদুল ওয়াজেদ। সেজোর বয়স হয়েছে চব্বিশ-পঁচিশ, আবদুল ওয়াহেদ। ছোটছেলে স্কুলে পড়ে, আবদুল ওহিদ।

আবদুল ওয়াজেদ আকুঞ্জি

ছোটছেলেকে হিসেবের বাইরে রাখা হল। মাজেদ-ওয়াজেদ-ওয়াহেদ, বড়-মেজো-সেজো-র গতিবিধি কেমন?

জানা গেল, বড় এবং সেজো ভেড়ির কাজেই সাহায্য করে বাবাকে। মেজোছেলে, ওয়াজেদ আকুঞ্জি, নিয়মিত যাতায়াত করে কলকাতায়, ব্যবসার কাজে। কখনও মোটরসাইকেলে করে, কখনও পারিবারিক গাড়িতে। বেশিরভাগ সময়েই কলকাতাতেই থাকে ইদানীং। গত কয়েক মাস পাড়ার লোক খুব বেশি হলে

দু'-তিনবার এলাকায় দেখেছেন ওয়াজেদকে।

পাঁচটা ডাকাতিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী আঁকা ছয় ডাকাতের ছবি দেখানো হল স্থানীয় কয়েকজনকে। একটা ছবিকে প্রায় সবাই চিহ্নিত করলেন, 'আরে! এ তো একদম ওয়াজেদ ভাইয়ের মতো দেখতে।'

ছবি দেখে লোকে চিনছে। হঠাৎ টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো। পরিবারের তরফে রাতারাতি এলাকায় তৈরি হচ্ছে মসজিদ। গড়ে উঠছে বাজার। কলকাতায় মেজোছেলে ওয়াজেদ পুরো মাসটাই কাটাচ্ছে। দেখাই যাচ্ছে না এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে লালমোহনবাবু হলে যা বলতেন, সেটাই মাথায় ঘুরছিল গোয়েন্দাদের। 'হাইলি সাসপিশাস!'

সব দিক বিচার করে একটাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল। আকুঞ্জিদের বাড়িতে 'রেইড' করার।

প্রায় তিন বিঘে জমির উপর বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। দশ-বারো ফুট উঁচু পাঁচিল। ঢোকার গেট একটাই। পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলতে পঞ্চাশ-ষাট জন লোকের দরকার ন্যূনতম।

সামান্যতম ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত ছিল না লালবাজার। একশো জন বাছাই করা পুলিশকর্মীকে জড়ো করা হয়েছিল ধামাখালিতে। হাজির ছিলেন আমিনুলের নেতৃত্বে অন্তত ডজনখানেক অফিসার। ঘড়ির কাঁটা যখন রাত তিনটে ছুঁতে চলেছে, আকুঞ্জিদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়া হল। জবাব এল না।

আগের রাত্রে সাদা পোশাকে কয়েকজন অফিসার ঘুরে গিয়েছিলেন জায়গাটা। একটা বড় 'রেইড' করার আগে সরেজমিনে যে 'ঘুরে যাওয়াটা' অসম্ভব জরুরি। কোথায় 'রেইড' হবে, কোন দিক দিয়ে ঢোকা হবে, ভিতরে কারা যাবে, বাইরে 'ব্যাক-আপ' হিসাবে কারা থাকবে, যাদের ধরতে যাওয়া হচ্ছে, তারা কোনদিক দিয়ে পালাতে পারে, এবং সেই পালানোর পথ কীভাবে বন্ধ করতে হবে... সমস্ত খুঁটিনাটি ছবি এঁকে আগেভাগে বুঝিয়ে দেওয়া হয় 'রেইড'-এ অংশ নেওয়া অফিসার-কর্মীদের। কার কখন কী দায়িত্ব, পরিষ্কার হয়ে যায় জলবৎ তরলং।

কড়া নেড়েও জবাব না এলে কী করা হবে, ভাবাই ছিল। আনা হয়েছিল বেশ কয়েকটা কাঠের সিঁড়ি। লাগানো হল পাঁচিলের গায়ে। জনা কুড়ি অফিসার-ফোর্স সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাঁচিল টপকে নেমে পড়লেন বাড়ির ভিতরে। গেট খুলে দিলেন বাড়ির। বাকি ফোর্স ঢুকে পড়ল। প্রত্যেকের হাতে হয় টর্চ, নয় ড্রাগন লাইট।

তিন বিঘে জমির উপর যেন একটুকরো গ্রাম। ছোট ছোট আটটা ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একটা পুকুর। গোরু-বাছুর বাঁধা রয়েছে একটা বড় গোয়ালঘরে। এক প্রান্তে দুটো গুদামঘর। ধান বোঝাই করা আছে। ধানের স্তূপ অবশ্য শুধু গুদামেই নয়, সাজানো রয়েছে বিস্তৃত জমির এখানে-ওখানে-সেখানে।

পুকুরের ঠিক পাশেই অন্যগুলোর তুলনায় একটু বড় একটা ঘর। যার কড়া নাড়তে দরজা খুলে ঘুমচোখে বেরিয়ে এলেন পরিবারের কর্তা। আবদুল কাদের আকুঞ্জি। শক্তপোক্ত চেহারা। ফতুয়া-লুঙ্গি পরিহিত ভদ্রলোক পুলিশ দেখে অবাক। শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন আমিনুলকে।

—কী ব্যাপার? আপনারা এভাবে সবাই মিলে আমার বাড়িতে... কী ব্যাপার?

—বলছি... আপনার ছেলেদের ডাকুন। আমরা লালবাজার থেকে আসছি। আপনার বাড়িটা সার্চ করব।

এবার সামান্য উত্তেজিত দেখায় সিনিয়র আকুঞ্জিকে।

—সার্চ করবেন মানে? কী সার্চ করবেন? আমরা কি চোর-ডাকাত নাকি? সার্চ ওয়ারেন্ট কোথায়? সার্চ করবেন বললেই হল? দেশে আইন নেই?

—আইনের আলোচনা আপনার সঙ্গে করতে আসিনি আকুঞ্জি সাহেব। আর চোর-ডাকাত কিনা সেটা তো আপনি ভাল বলতে পারবেন... আপনার ছেলেরা বলতে পারবে... কোথায় ওরা?

'কোথায়', সেটা জানতে ততক্ষণে আকুঞ্জিদের বাড়ির প্রতিটি কোনায় তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে পুলিশবাহিনী। গুদামঘর-গোয়ালঘর-ধানের স্তূপ, কিছু বাদ নেই। কয়েকটা ঘর তালাবন্ধ ছিল। বাকিগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। বেরিয়ে এসেছেন বাড়ির কাজের লোকরাও।

পুরুষ সদস্য বলতে গৃহকর্তা নিজে ছাড়াও উপস্থিত চার ছেলের মধ্যে তিনজন। বড় মাজেদ, সেজো ওয়াহেদ এবং স্কুলপড়ুয়া ছোটছেলে ওহিদ।

—আপনার মেজোছেলে ওয়াজেদ কই?

—ও বেশিরভাগ সময় ব্যবসার কাজে কলকাতায় থাকে। মাসে এক-দু'দিন আসে।

—কোথায় থাকে কলকাতায়?

—সেটা বলতে পারব না।

—শেষ কবে এসেছিল এখানে?

—মাসখানেক আগে হবে।

—ভালই তো ব্যবসা আপনাদের, ডাকাতির মধ্যে না ঢুকলে চলছিল না?

এবার রাগে ফেটে পড়েন আকুঞ্জি সাহেব।

—মানে? বাড়ি বয়ে এসে যা খুশি বলবেন, যা খুশি করবেন? স্রেফ পুলিশ বলে? কে ডাকাতি করেছে? এপাড়ায় কতদিন ধরে আছি জানেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন না আমাদের ব্যাপারে! পুরো বাড়ি তছনছ করে দিচ্ছেন সার্চের নামে, আমি আপনাদের ছেড়ে দেব ভেবেছেন? কোর্টে যাব।

কোর্টে যাওয়ার সত্যিই সংগত কারণ থাকবে, অফিসাররা বুঝতে পারছিলেন তল্লাশির পর। কিছুই পাওয়া গেল না তন্নতন্ন করে খোঁজার পরও। রিভলভার না, গুলি না, বোমা না। ব্যাংকলুঠের একটা টাকাও না।

হাল ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। সিনিয়র আকুঞ্জির প্রবল প্রতিবাদকে উপেক্ষা করেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দারা লালবাজারে নিয়ে এলেন মাজেদ আর ওয়াহেদকে।

নিয়ে তো এলেন। কিন্তু রাতভর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করেও ডাকাতির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি তো দূরের কথা, কোনও বাড়তি তথ্যও পাওয়া গেল না। দু'জনেই একই কথা আউড়ে গেলেন তোতাপাখির মতো, 'ডাকাতির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমরা।'

মেজোভাই ওয়াজেদ কোথায়? দুই ভাইয়ের একই উত্তর কাটা রেকর্ডকেও লজ্জা দিয়ে, 'বিশ্বাস করুন, জানি না।' গ্রেফতারির প্রশ্ন আসে অপরাধের সঙ্গে নির্দিষ্ট যোগসূত্র বা প্রমাণ পাওয়া গেলে তবেই। পাওয়া গেল না, এবং ছেড়ে দিতে হল দুই ভাইকে। সোর্সদের বলা হল গতিবিধির উপর নজর রাখতে।

নজরদারির ব্যাপারে একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নিলেন গোয়েন্দাপ্রধান। হাওড়া-হুগলি-উত্তর ২৪ পরগনায় যে অফিসাররা ঘাঁটি গেড়েছিলেন সোর্সসহ, তাদের সবাইকে বলা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চলে আসতে। বামনঘাটা-ভোজেরহাট-ঘটকপুকুর-মিনাখাঁ-মালঞ্চ হয়ে ধামাখালি পর্যন্ত, সর্বত্র ছড়িয়ে গেলেন অফিসাররা। বৃত্তটা ছোট হয়ে এল অনেক। এলাকায় পাকাপাকি নোঙর ফেলে খবর জোগাড়ের চেষ্টা শুরু করল সোর্সরা। ওয়াজেদ আকুঞ্জি কোথায়?

খবর এল। দ্রুতই এল। ওয়াজেদ আকুঞ্জিকে সপ্তাহখানেক আগে দেখা গেছে ঘটকপুকুর এলাকায়। হাইওয়ের ধারে একটা চায়ের দোকানে সন্ধেবেলা এসেছিল মিনিট দশেকের জন্য। একজন লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেছে মোটরসাইকেলে করে। দোকানির সঙ্গে কথা বললেন গোয়েন্দারা।

—লোকটা কার সঙ্গে কথা বলছিল চায়ের দোকানে?

—একটা বেঁটে মতো লোক, মোটাসোটা।

এই সেই 'দুয়ে দুয়ে চার'-এর মুহূর্ত! বেঁটে মতো লোক? মোটাসোটা? Hefty and bulky? যেমনটা এফআইআর-এ লিখেছিলেন ফেডারাল ব্যাংকের ম্যানেজার রামচন্দ্রন? ঠিক যেমন চেহারার লোকের বিবরণ পাওয়া গেছে পাঁচটা ঘটনাতেই?

—চেনেন ওই বেঁটে লোকটাকে?

—এক-দু'বার এসেছে আমার এখানে চা খেতে। মুখ চিনি। নাম জানি না।

—হুঁ... বেঁটে লোকটা যার সঙ্গে কথা বলছিল, সে একা এসেছিল?

—না স্যার, সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল।

—মেয়ে?

—হ্যাঁ স্যার, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে। খুব ফরসা। লম্বা। দারুণ দেখতে।

—মেয়েটিকে আগে এলাকায় দেখেছেন কখনও?

—না স্যার... আমি বরং লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই বেঁটে মোটা লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, একে তো আগে দেখিনি কখনও এদিকে?

—কী বলেছিল?

—বলেছিল, মেয়েটা নাকি নাচে। কলকাতায়।

পরের চব্বিশ ঘণ্টায় ঘটকপুকুর এবং সংলগ্ন এলাকার গ্রামগুলো সাদা পোশাকের পুলিশ এবং সোর্সরা চষে ফেলল। এবং জানা গেল 'hefty and bulky' লোকটির পরিচয়। আবদুল হাই গায়েন। বড়ালি গ্রামের বাসিন্দা। ইটভাটার মালিক। কলকাতায় চালের ব্যবসা করত একসময়। লরি চালাতে পারে। এলাকায় যথেষ্ট দাপট। ইটভাটার লরি পার্ক করা নিয়ে সম্প্রতি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। হাতাহাতিও। আবদুল হাই নাকি শূন্যে গুলি চালিয়েছিল ঝামেলার সময়। বছর দুয়েক আগে চুরি-ছিনতাই জাতীয় কেসে নাকি একবার পুলিশে ধরাও পড়েছিল। ইদানীং বাড়িতে থাকছে না।

সন্দেহের-দ্বিধার-সংশয়ের আর জায়গা ছিল না। ছয় ডাকাতের দু'জন নিশ্চিতভাবে আকুঞ্জি এবং আবদুল হাই। এদের ধরতে পারলেই বাকি চারের হদিশ মিলবে।

কীভাবে ধরা হবে? হাতের কাছে তথ্য বলতে, আকুঞ্জিকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা গেছে। কলকাতায় নাচে। কোথায় নাচে? নিশ্চয়ই পানশালায়, কোনও বারে।

কলকাতার বারে নাচে, এমন একটা মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে। লম্বা-ফরসা-সুন্দরী। যার সঙ্গে ধামাখালির এক যুবকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে ইদানীং। এটুকু না পারলে আর কীসের লালবাজার? কীসের আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা?

দু'জন সোর্সকে চিহ্নিত করা হল। যাদের নিয়মিত যাতায়াত আছে কলকাতার সেইসব পানশালায়, যেখানে গানের পাশাপাশি টুকটাক নাচও হয়। বলে দেওয়া হল, 'সন্ধে থেকে বারগুলোতেই কাটাও। যা খরচা হবে, আমরা দেব।'

দিনতিনেকের মধ্যেই খবর নিয়ে হাজির হল সোর্স। আসল নামটা লিখলাম না। নাম ধরা যাক আশিস। নিখরচায় সন্ধে থেকে 'জলপথে' থাকার সুযোগ পেয়ে যে জানপ্রাণ লাগিয়ে দিয়েছিল মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে।

—স্যার। ইলিয়ট রোডের কাছে বারটা। মেয়েটা হাতিবাগানের।

—কী করে বুঝলি, এই মেয়েটাই?

অঙ্কে এমএসসি করা লোককে যদি জিজ্ঞেস করেন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফরমুলা? কী প্রতিক্রিয়া

হবে? অনুকম্পার হাসিই তো! অবিকল সেই হাসি হাসলেন আশিস।

—কী যে বলেন স্যার! এটা বোঝা কোনও ব্যাপার হল? বারে নাচে, ফরসা-লম্বা আর সুন্দর দেখতে, এমন পাঁচটা মেয়ের খোঁজ পেলাম গত দু'দিনে। লোক ফিট করলাম পাঁচজনের পিছনে। এই হাতিবাগানের মেয়েটা কিছুদিন হল ট্যাক্সি করে বারে আসছে। আগে বাসে করে আসত। গলায় মাসখানেক হল সোনার নেকলেস পরছে। হেব্বি দামি ঘড়ি পরছে।

—আর?

—গত শনিবার একটা গাড়ি এসে বারের বাইরে অপেক্ষা করছিল। নাচ শেষ হওয়ার পর সেই গাড়িতে করে মেয়েটা বেরিয়ে গেছে। একটা ছেলে গাড়িটা চালাচ্ছিল। ছেলেটার ব্যাপারে তেমন কেউ বলতে পারছে না। তবে মেয়েটার চালচলন ইদানীং বদলে গেছে। হাতে মালকড়ি এসেছে হঠাৎ। আমি হাতিবাগানেও খোঁজ নিয়েছি। বাড়ির অবস্থা ভাল নয় তেমন টাকাপয়সার দিক দিয়ে। আপনি মিলিয়ে নেবেন স্যার, একেই খুঁজছেন। এই মেয়েটাই!

শেষ-জানুয়ারির শনিবারের রাত। লালবাজার থেকে প্লেন ড্রেসে রওনা দিলেন গোয়েন্দারা। ইলিয়ট রোডের বারের বাইরে অপেক্ষায় রইলেন বিমল-আমিনুল-রাম-তপনরা। সঙ্গে দুই মহিলা কনস্টেবল। ভিতরে ঢুকলেন রিমলেস চশমা পরিহিত ইন্দ্রনীল। বার তখন মাতোয়ারা। হিট হিন্দি গানের সঙ্গে কোমর দোলাচ্ছেন এক সুন্দরী। লম্বা এবং ফরসা।

'তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত..'

গানের মাঝেই ম্যানেজারের কানে ইন্দ্রনীলের ফিসফিস। গান শেষ হওয়ার পরই তরুণীর শশব্যস্ত বেরিয়ে আসা বারের বাইরে।

—আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

—যেতে হবে মানে? কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

—লালবাজার।

ড্রেস চেঞ্জ করতে যতটুকু সময়। সাদা টাটা সুমো গাড়িতে উঠে বসলেন তরুণী। টাটা সুমো স্টার্ট দিল। গন্তব্য লালবাজার।

পানশালার মেহফিলে তখন যুবতীর জায়গা নিয়েছে এক যুবক। শুরু হয়েছে নতুন গান। শাহরুখ খানের সিনেমার।

'ইয়ে কালি কালি আঁখে
ইয়ে গোরে গোরে গাল...'

একটা মাঝারি মাপের ঘরে সাত-আটজন মিলে জেরা করতে শুরু করলেন যুবতীকে। এবং মিনিট পাঁচেকের বেশি নার্ভ ধরে রাখতে পারলেন না যুবতী। ওঁর আসল নামটা বদলে দেওয়া যাক। ধরা যাক, জয়শ্রী। স্বীকার করে নিলেন আকুঞ্জির সঙ্গে গড়ে ওঠা মাসদুয়েকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সম্পর্কের কী-কেন-কখন নিয়ে বিশেষ কৌতূহল ছিল না অফিসারদের। জানার ছিল একটা কথাই। কলকাতায় আকুঞ্জি থাকে কোথায়? উত্তর দেবেন কী, প্রশ্ন শোনামাত্রই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন জয়শ্রী।

—স্যার, জানতে পারলে ও মেরে ফেলবে আমাকে। সবসময় সঙ্গে রিভলভার থাকে ওর। সংসারটা আমাকে একা চালাতে হয়। মাসে মাসে চার হাজার করে টাকা দিত আমায়। সেই লোভে পড়ে... প্লিজ় স্যার, ও আমায় মেরে ফেলবে জানতে পারলে...

অফিসাররা নানাভাবে আশ্বস্ত করেন জয়শ্রীকে।

—কেউ জানবে না আপনার নাম। কেস ডায়েরিতে কোথাও থাকবে না। কোর্টে যেতে হবে না। কিস্যু

করতে হবে না। কথা দিচ্ছি আমরা। বারের ম্যানেজারকে বলে দেব আমরা। আপনি শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন, ব্যস। বললে আপনারই সুবিধে, ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। না বললেই বরং ফাঁসবেন।

আধঘণ্টা পর ধাতস্থ হলেন জয়শ্রী। যতটুকু জানতেন, বললেন। রাত আড়াইটে নাগাদ জয়শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে চারটে অ্যামবাসাডর গাড়ি বেরল লালবাজার থেকে। প্রথম দুটো গাড়িতে জয়শ্রীকে বাদ দিয়ে আরোহীর সংখ্যা আট। প্রত্যেকে সাদা পোশাকে। কোমরে গোঁজা .৩২ রিভলভার। লোডেড। সঙ্গে একটা ব্যাগ। যাতে রইল শাবল-গাঁইতি।

তিন নম্বর গাড়িতে দু'জন মহিলা কনস্টেবল এবং একজন অফিসার। চতুর্থ গাড়িতে চার উর্দিধারী, বন্দুকসহ।

রবীন্দ্র সরণি-পোদ্দার কোর্ট-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-গিরিশ পার্ক-বিবেকানন্দ রোড-কাঁকুড়গাছি-উলটোডাঙা হয়ে চারটে গাড়ির প্রথম দুটো ঢুকে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এলাকায়। কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিল বাঁ দিকে। তিন আর চার নম্বর গাড়ি থেকে গেল উলটোডাঙা মোড়ে।

প্রথম দুটো গাড়িও থামল একটু পরেই। লেকটাউনের কালিন্দী হাউসিং প্রোজেক্ট থেকে একটু দূরে। একতলায় একটা ফ্ল্যাটের সামনে অফিসারদের নিয়ে গেলেন জয়শ্রী। ওঁর কাজ শেষ। পৌঁছে দেওয়া হল উলটোডাঙায়। যেখানে অপেক্ষমাণ তিন নম্বর গাড়িতে করে দু'জন অফিসার এবং একজন মহিলা কনস্টেবল জয়শ্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন হাতিবাগানের বাড়িতে পৌঁছে দিতে।

দরজার দু'দিকে ভাগ হয়ে গেলেন অফিসাররা। পাঁচ তদন্তকারী ছাড়াও দলে ছিলেন সাব-ইনস্পেকটর মনোজ দাস এবং আরও দুই অফিসার। তাগড়াই চেহারার মনোজ (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডেপুটেশনে ডিএসপি হিসাবে কর্মরত) কলকাতা পুলিশে ডাকাবুকো অফিসার বলে পরিচিত ছিলেন।

প্রথমবারের কড়া নাড়ায় কোনও আওয়াজ নেই ঘরের ভিতর থেকে। দ্বিতীয়বারে ছিটকে এল মরিয়া উত্তর,— 'পুলিশ হোক আর যেই হোক, ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করব।'

লাথি মেরে দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ছিটকে এল গুলি। লাগল মনোজের কাঁধে। অবিরাম রক্তপাত, ক্ষতস্থানে হাত চেপে মাটিতে বসে পড়লেন মনোজ। এবং ঘরের ভিতর থেকে দ্বিতীয় গুলি চলার আগেই পালটা গুলি চালালেন এক অফিসার। আকুঞ্জির কোমরের নীচে, ডান ঊরুর কাছে গুলি লাগল। এ-ই যে আকুঞ্জি, এক পলকের দেখাতেই বুঝলেন গোয়েন্দারা। আঁকানো ছবির সঙ্গে যথেষ্টরও বেশি মিল।

আকুঞ্জি একা ছিল না ফ্ল্যাটে। সঙ্গে ছিল আরেকজন। দু'জনের উপরই নিমেষে ঝাঁপালেন গোয়েন্দারা। কেড়ে নেওয়া হল আকুঞ্জির রিভলভার। অন্য লোকটিকে ধরাশায়ী করতেও লাগল খুব বেশি হলে পনেরো সেকেন্ড। ওয়াকিটকিতে ততক্ষণে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন এক অফিসার, 'মুভ টু কালিন্দী অ্যাট ওয়ান্স। কুইক!' উলটোডাঙার মোড় থেকে চতুর্থ গাড়ি তখন তিরবেগে ছুটেছে লেকটাউনের দিকে।

গুলিগোলার আওয়াজে তখন ঘুম ভেঙে গেছে আশেপাশের বাসিন্দাদের। আতঙ্কে অনেকে বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। এবং বিস্ফারিত চোখে দেখছেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক অফিসারকে ধরাধরি করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন সতীর্থরা। দুই যুবককে একতলার ফ্ল্যাট থেকে টেনে বার করে আনছে পুলিশ। একজনের কোমরে দড়ি। আর একজন রক্তাক্ত। তাকেও তোলা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। আরে, এ তো চেনা মুখ। ভদ্র, নম্র ব্যবহার। মাসছয়েক হল এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। প্রোমোটারি করে বলেই জানে পাড়ার লোক। এ? এ ব্যাংক-ডাকাতির পান্ডা!

আহত মনোজ এবং ওয়াজেদ আকুঞ্জিকে নিয়ে যাওয়া হল আর জি কর হাসপাতালে। কালিন্দীর ফ্ল্যাট তল্লাশি করে পাওয়া গেল দুই আলমারি ভরতি টাকা। থরে থরে সাজানো, বিভিন্ন ব্যাংকের স্লিপ লাগানো টাকার বান্ডিল।

আকুঞ্জির সঙ্গের যুবকের নাম মনোজ সিং। যাকে লালবাজারে এনে শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। সব কিছু স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না ট্যাংরার দেবেন্দ্র চন্দ্র রোডের বাসিন্দা মনোজের। দ্রুত জানিয়ে দিল

ডাকাতদলের বাকিদের নাম। ভোরেই বেরিয়ে পড়া হল রেইডে। সমর রায় ওরফে কালু গ্রেফতার হল ট্যাংরা থেকেই। কড়েয়ার একটা ভাড়াবাড়ি থেকে তোলা হল আরেক ডাকাত দীনেশ দাসকে। এন্টালির বিবিবাগানের গোপন ডেরায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করা হল সরওয়ার খানকে। মনোজ-দীনেশ-সমর-সরওয়ার, সবারই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে।

সমর-দীনেশরা জানত ঘটকপুকুরের কাছে আবদুল হাই গায়েনের সম্ভাব্য আস্তানার কথা। টিম পাঠিয়ে ডাকাতদলের একমাত্র 'hefty and bulky' সদস্যকে পাকড়াও করতে সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না। হলও না। আকুঞ্জি-মনোজ-আবদুল-সরওয়ার-দীনেশ-সমর, পুরো গ্যাং শেষ পর্যন্ত কব্জায়। প্রথম ডাকাতির প্রায় ছ'মাস পরে।

কোথায় কখন ডাকাতি করা হবে, প্ল্যান করত দু'জন। আকুঞ্জিই ছিল দলের মাথা। সংলাপ-চিত্রনাট্য-পরিচালনা তারই। মুখ্য পরামর্শদাতা ছিল আবদুল, যার সঙ্গে আকুঞ্জির আলাপ বেশ কয়েক বছর আগে। আবদুলের আর্থিক টানাটানির সময় আকুঞ্জি টাকাপয়সা দিয়ে বিস্তর সাহায্য করেছিল। সেই থেকেই আবদুল আপাদমস্তক অনুগত আকুঞ্জির প্রতি।

পঁয়ত্রিশ বছরের আবদুল কলকাতার রাস্তাঘাট, অলিগলি চিনত হাতের তালুর মতো। প্রায় পাঁচ বছর বড়বাজারের একটা চাল ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করেছে। লরি চালিয়ে চাল নিয়ে গেছে শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। কোথায় কখন কীভাবে হানা দিলে দ্রুত কাজ হাসিল হবে আর পালানোও যাবে নিরাপদে, আবদুলই বুদ্ধি দিত আকুঞ্জিকে। এবং আবদুলই পুরনো পরিচয়ের সূত্রে জুটিয়েছিল টিমের বাকি চারজনকে। মনোজ-সমর ট্যাংরায় একই পাড়ার বাসিন্দা। কাঠবেকার দু'জনেই। দীনেশ এবং সরওয়ারেরও কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল না। পাড়ায় খুচরো দাদাগিরির ইতিহাস ছিল কিছু।

যেখানে যেখানে ডাকাতি হয়েছিল, সেখানে তার আগের রাতে পুরো টিমকে নিয়ে হাজির হত আকুঞ্জি। জায়গাটা আরও আগে থেকে দেখে রাখত আবদুল। ডাকাতির পর যে রাস্তা দিয়ে চম্পট দিতে হবে, সেই রাস্তা দিয়ে এরা 'ট্রায়াল রান' দিত গভীর রাতে। পরের দিন যাতে কোনও বিভ্রান্তি না থাকে, পান থেকে যাতে চুন না খসে।

যে মোটরসাইকেলগুলো ব্যবহার হয়েছিল ডাকাতিতে, সবক'টাই চোরাই। জোগাড় করেছিল আবদুলই। ট্যাংরার ডাকাতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল যে মারুতি গাড়ি, সেটাও চোরাই গাড়িই। খোঁজ মিলল না গাড়িগুলোর। আকুঞ্জিরই পরামর্শমতো মোটরসাইকেল দুটো আবদুল ধাপার মাঠের কাছে ফেলে দিয়ে এসেছিল পাঁচ নম্বর ডাকাতির পর। সেগুলো খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পাওয়া গেলও না।

মারুতি গাড়িটা? বসিরহাটের টাকির বাসিন্দা এক পরিচিতের কাছ থেকে কয়েকদিনের জন্য গাড়িটা ধার নিয়েছিল আবদুল। যাওয়া হল সেই পরিচিতের বাড়ি। তালাচাবি বন্ধ করে মাসখানেক আগে বাড়ির বাসিন্দারা অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন।

আহত সাব-ইনস্পেকটর মনোজ সুস্থ হয়ে উঠলেন ক্রমশ। মাসখানেক পরে পুলিশি প্রহরায় চিকিৎসাধীন আকুঞ্জিও সুস্থ হয়ে উঠল। লালবাজারে জেরার মুখোমুখি হয়ে আকুঞ্জি প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিল সোজাসাপটা। বুঝে গিয়েছিল, 'গেম ওভার'। কিছু লুকিয়ে আর লাভ নেই। বাকিরা সবটা বলে দিয়েছে। মিথ্যে বললে দুর্ভোগই বাড়বে। পুলিশ বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছাড়বে।

—এত জমিজমা, মাছের এমন রমরমা ব্যবসা, নতুন গ্যাং তৈরি করে ডাকাতির প্ল্যান কী করে মাথায় এল? আর কেনই বা এল?

জবাবে আকুঞ্জি কোনও রাখঢাক করল না।

—ফ্যামিলি বিজনেসেই থাকলে যেমন চলছিল, তেমনই চলত স্যার। আমার আরও আরও অনেক বেশি বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে হত। বিরাট দামি গাড়ি হবে। কলকাতায় বড় বাড়ি হবে। বিদেশে বেড়াতে যাওয়া হবে। সুন্দরী মেয়েরা ঘিরে থাকবে। অনেক টাকার স্বপ্ন দেখতাম।

—সুতরাং ব্যাংকলুঠ করা যাক, ঠিক করে ফেললি?

—ওটাই দেখলাম বেস্ট উপায় স্যার। আমার টার্গেট ছিল তিন-চার মাসে এক কোটি টাকা। বাবা আর ভাইদের সঙ্গে শুধু মাছের ব্যবসা করলে কোনওদিনই আর বেশি বড়লোক হওয়া যেত না।

—পাঁচটা মিলিয়ে তো লাখ পঞ্চাশেক মতো হয়েছিল। টার্গেটের মাত্র অর্ধেক...

—আর একটা বড় কাজ করে থেমে যেতাম স্যার।

গোয়েন্দাদের নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি হল। আরও একটা?

—সেটা কোথায়?

—মেট্রোর টাকা স্যার।

—কোন মেট্রো?

—বউবাজার মোড়ের কাছে একটা স্টেশন আছে না? নামটা ভুলে যাচ্ছি...

—সেন্ট্রাল?

—হ্যাঁ স্যার, সেন্ট্রাল... ওই স্টেশনের কাছে মাটির তলায় মেট্রোর অনেক টাকা রাখা হয় বলে খবর পেয়েছিলাম। ওই কাজটায় একবারে তিরিশ-চল্লিশ তো হতই।

ফের একে অন্যের দিকে তাকান অফিসাররা। সত্যিই আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাশস্টোর আছে একটা সেন্ট্রাল স্টেশনের প্রায় লাগোয়াই। অনেক টাকা থাকে। পুলিশের বন্দুকধারী থাকে পাহারায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষের নিজস্ব গার্ডও থাকে। ছ'নম্বর ডাকাতিটা ওখানে হতে যাচ্ছিল?

—তা করলি না কেন কাজটা?

—আপনারা তো খুব দৌড়ঝাঁপ করছিলেন স্যার... তাই কিছুদিন চুপচাপ থেকে মামলা ঠান্ডা হওয়ার পর করব ভেবেছিলাম। লেকটাউনের যে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলাম আটমাস আগে, ওখানেই থাকতাম ম্যাক্সিমাম টাইম।

—বাড়ির লোক জানত, তুই ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিস? বাবা? ভাই?

—বাবা পুরোটা জানত না। বড়দাও না। তবে আন্দাজ করত কিছু একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি। না হলে হুট করে বাজার-মসজিদ বানানোর এত টাকা পাব কোথায়? তবে সেজোভাই ওয়াহেদ জানত। ওর হাত দিয়ে লাখখানেক টাকা পাঠিয়েছিলাম একবার। বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে।

—বাড়িতে কোথায়?

আকুঞ্জি চুপ করে থাকেন মিনিটখানেক। সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়। আমিনুলের হুমকিতে সংবিৎ ফেরে।

—শোন, বাড়িতে টাকা থাকুক আর না-ই থাকুক, তুই বলিস আর না-ই বলিস, আমরা আবার যাব ধামাখালিতে। তোকে সঙ্গে নিয়েই যাব। তোর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবার পুরো তিনবিঘে জমি খুঁড়ে দেখব। প্রথমবার তো অত সময় হয়নি।

—ধানের পোয়ালের নীচে মাটিতে পুঁতে রাখতে বলেছিলাম ওয়াহেদকে।

'পোয়াল' বলতে ধানের স্তূপ। মাটি খুঁড়ে পাওয়াও গেল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, আকুঞ্জির বাড়িতে ফের রেইড করে।

পাঁচটা ঘটনায় মোট লুঠ হয়েছিল আটচল্লিশ লক্ষ আটশো পঁচিশ টাকা। যার মধ্যে উদ্ধার হয়েছিল কুড়ি লক্ষ দশ হাজার পাঁচ টাকা। যার সিংহভাগ কালিন্দীর ফ্ল্যাট থেকে। বাকি টাকার কিছুটা উদ্ধার হয়েছিল আব্দুলের কাছে একটা ফ্ল্যাট থেকে। যেটা ভাড়া নিয়েছিল আকুঞ্জি, যার সন্ধান জানত আবদুল।

টাকার বখরা? আকুঞ্জি বাকিদের বুঝিয়েছিল, তার কাছে লুঠের টাকা থাকাটাই নিরাপদ। তার কাছে অনেক জায়গা আছে লুকিয়ে রাখার। শেষ ডাকাতিটা হয়ে গেলে চূড়ান্ত ভাগবাটোয়ারা হবে। আবদুল এবং অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল সাকুল্যে পঞ্চাশ হাজার। এবং নিজে নিয়ম করে টাকা ওড়াচ্ছিল মদ এবং

মহিলার পিছনে।

পাঁচটা কেসেই চার্জশিট জমা পড়েছিল যথাসম্ভব দ্রুত। বহুসংখ্যক আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছিল ডাকাতির জায়গাগুলো থেকে। যার কোনও না কোনওটা ম্যাচ করে গিয়েছিল ধৃত ছয় ডাকাতের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে। বিচার চলাকালীন ঘটনাগুলোর সময় উপস্থিত একাধিক সাক্ষী সংশয়াতীত ভাবে ধৃতদের চিহ্নিত করেছিলেন Test Identification Parade-এ। আর বাজেয়াপ্ত টাকার বান্ডিলে ব্যাংকের স্লিপ তো ছিলই। আদালতে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তিও দিয়েছিল আবদুল হাই, সমস্ত কিছু কবুল করে। আকুঞ্জি পরিবারের সেজোছেলে ওয়াহেদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল অপরাধীর অপরাধমূলক কাজের কথা জেনেও তা গোপন করার অভিযোগ (harbouring a criminal)।

আকুঞ্জি এবং অন্য পাঁচ ডাকাতের দোষী সাব্যস্ত হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ছিল। যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা ঘোষিত হয়েছিল দু'বছরের মধ্যেই। ওয়াহেদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল দশ বছরের কারাবাস।

কাহিনি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু 'পুনশ্চ' এখনও বাকি। আকুঞ্জি পালানোর চেষ্টা করেছিল বিচার চলাকালীন। আলিপুর কোর্টে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে মরিয়া দৌড় দিয়েছিল একদিন। একশো মিটার ধাওয়া করে ফিলমি কায়দায় ধরে ফেলেছিলেন এক শক্তসমর্থ কনস্টেবল।

সবে তিরিশ পেরনো আকুঞ্জি তীব্র অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল জেলে। কথা বলত না কারও সঙ্গে। খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল বললেই চলে। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল নীরোগ শরীরে। জেলযাপনে একের পর এক ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আকুঞ্জি মারা গিয়েছিল সাজার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই।

প্রবাদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না কখনও কখনও। লোভে পাপ। আর পাপে যা হওয়ার, তা-ই।

শরীর, শুধু শরীর?

প্রদীপকুমার সেন। ভিজিটর্স স্লিপে নামটা দেখে সামান্য ভুরু কুঁচকে যায় নগরপালের। চেনেন দর্শনপ্রার্থীকে। সামাজিক জমায়েতে দেখা হয়েছে একাধিকবার। সখ্য নেই তেমন। হঠাৎ দেখায় 'হাই-হ্যালো' আছে। হতে পারে কোনও ব্যক্তিগত দরকারে এসেছেন বা কোনও অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাতে। কিন্তু স্লিপে 'Purpose of visit'-এর জায়গায় 'Most urgent and confidential' লেখা কেন? হঠাৎ লালবাজারে, সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই? স্লিপটা হাতে রেখেই বেল বাজান পুলিশ কমিশনার।

—কল হিম ইন।

বিধ্বস্ত চেহারাটা যখন ঘরে ঢুকছে, একটু অবাকই হন নগরপাল। দেখলে বোঝা যায়, কাঁচাপাকা চুলের প্রৌঢ় ষাটের চৌকাঠ পেরিয়ে গেছেন। সুঠাম চেহারা হয়তো নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। লম্বায় নিশ্চিতভাবে ছ'ফুটের উপর। টাক পড়েছে সামান্য। চেহারায় একটা জেল্লা আছে। তবে আজ চলনেবলনে ছিটেফোঁটাও নেই চাকচিক্যের। যেন এক ধাক্কায় ভদ্রলোকের বয়স বেড়ে গেছে বছর দশেক। চোখ লাল। ঘুম সঙ্গ ত্যাগ করলে যেমন হয়, তেমন।

—কী ব্যাপার মি. সেন, হোয়াট ব্রিংস ইউ হিয়ার? অল ওয়েল?

নগরপালের প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র ভূমিকা করেন না প্রৌঢ়। সোজাসুজি পয়েন্টে আসেন, গলায় ঝরে পড়ে অসহায় আর্তি।

—স্যার, প্লিজ় হেল্প মি। মাই ওয়াইফ ইজ় মিসিং...

—মানে?

—ইয়েস স্যার, আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দু'দিন হল। বাড়ি থেকে পরশু বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, ফেরেননি মানে? আপনারা থাকেন কোথায়? মিসিং ডায়েরি করেছেন?

—হ্যাঁ, যাদবপুর থানায়। আমরা প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোডে থাকি। স্যার, লীনা মিসিং ফর দ্য লাস্ট টু ডেজ়... হাতে মুখ ঢেকে প্রায় কেঁদেই ফেলেন প্রৌঢ়। ফের বেল বাজানোর প্রয়োজন পড়ে নগরপালের। জল আনতে বলেন আরদালিকে।

—মি. সেন, যাদবপুর তো রাজ্য পুলিশের এলাকায়। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি। কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হল কিনা সেটা আগে খোঁজ নেওয়া দরকার। প্লিজ় স্যার, থানা বলছে, মিসিং ডায়েরির এনকোয়ারি চলছে। আমি এখন কী করব, মাথা কাজ করছে না।

—মোবাইল নম্বরটা... মানে আপনার মিসেসের?

—ছিল না। আমরা কেউই মোবাইল ব্যবহার করি না।

চিন্তিত দেখায় নগরপালকে। লালবাজার পিবিএক্স-কে ধরেন ইন্টারকমে।

—ডিসি ডিডি প্লিজ়...

কড়েয়া থানার গাড়ি যখন ব্রেক কষল অভিজাত বহুতলের সামনে, ফুটপাথে ছোটখাটো জটলা কৌতূহলী জনতার। নেমে চারপাশে একঝলক তাকান ওসি। জটলাকে ভিড়ে পরিণত হতে দিলে সে ভিড় খুব তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে আসবে। ট্র্যাফিকের ঘোর সমস্যা হবে। এমনিতেই ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা।

অফিসফেরত গাড়ির ঢল নামল বলে। ওয়ারলেসে থানায় নির্দেশ পাঠান বড়বাবু, বাড়তি ফোর্স দরকার এখানে। ক্রাউডকে সরিয়ে দিতে বলুন। কুইকলি!

'মৈনাক অ্যাপার্টমেন্টস'। পি-১৭ বি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে কিছুটা হাঁটলেই ডানদিকে চোখে পড়তে বাধ্য এগারো তলার বাড়িটা। ঢোকার মুখেই বড় গেট। এ ধরনের আবাসনে যেমন থাকে। ঢুকেই ছোট একটা ড্রাইভওয়ে। যার শেষে কুড়ি-পঁচিশটা গাড়ি রাখার মতো পার্কিং স্পেস।

'সিকিউরিটি এনক্লোজার' রয়েছে একটা। কেয়ারটেকারের বসার ব্যবস্থা সেখানেই। কাচ দিয়ে ঘেরা। ভিতর থেকে স্বচ্ছন্দে দেখা যায় বাইরেটা। কে ঢুকছে, কে বেরচ্ছে, সব। দুটো সিঁড়ি। একটা ব্যবহার হয়ই না প্রায়। তালা বন্ধ থাকে। ওই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আবাসিকদের বাড়ির কাজের লোকদের ঘর। মূল সিঁড়ির পাশেই দুটো লিফট। লিফটম্যান আছে, তবে চাইলে নিজেরাও অপারেট করতে পারেন আবাসিকরা। ওসি-কে দেখতে পেয়েই শশব্যস্ত লিফটম্যান এগিয়ে আসে, গলায় উত্তেজনার আঁচ, 'আসুন স্যার, দশতলায়।'

ফ্ল্যাট নম্বর ৯০৬। যার বাইরে অন্তত পনেরো-কুড়ি জনের জটলা-গুঞ্জন-ফিসফাস। লিফট থেকে বেরিয়েই পকেটে হাত চলে যায় ওসি-র। রুমাল বের করতে বাধ্য হন। প্রবল দুর্গন্ধ গ্রাস করেছে চারদিক। এবং গন্ধের উৎসমুখ যে ওই ফ্ল্যাটই, সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। ওই গন্ধ পেয়েই ফোন গিয়েছিল থানায়।

গোদরেজের ইয়া বড় তালা ঝুলছে ফ্ল্যাটের দরজায়। ওসি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সামনে উপস্থিত কেয়ারটেকার জানিয়ে দিলেন, ডুপ্লিকেট চাবি নেই। চাবি থাকত 'দিদিমণির' কাছেই। তালা ভেঙে ঢোকার পর আবিষ্কৃত হল দিদিমণি-র মৃতদেহ। বহু ডেডবডি দেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বড়বাবুও মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে পড়লেন দৃশ্যের বীভৎসতায়।

আঁতকে না ওঠাই আশ্চর্য, গা গুলিয়ে না ওঠাই অস্বাভাবিক। দশ আর এগারো তলা মিলিয়ে ডুপ্লে ফ্ল্যাট। একটা দরজা দশ থেকে এগারোয় যাওয়ার। তালা বন্ধ। দশতলার ফ্ল্যাটটা বেশি বড় নয়, কিন্তু ছিমছাম। বাহুল্য না থাক, পারিপাট্য আছে। একটা শোওয়ার ঘর, ছোট। বসার ঘরে কার্পেট-সেন্টার টেবিল-সোফাসেট, যেমন থাকার। বারান্দা রয়েছে একফালি। রয়েছে বসার ঘরের লাগোয়া বাথরুম এবং রান্নাঘর। অসহনীয় দুর্গন্ধের উৎপত্তি যে ওই রান্নাঘর থেকেই, আবিষ্কৃত হল নিমেষেই। রান্নাঘরের দরজা বাইরে থেকে ভেজানো। ঠেলে খুললেন ওসি, এবং পিছনে দাঁড়ানো এক প্রতিবেশী আবাসিকের মুখ থেকে ছিটকে বেরল আতঙ্কিত আর্তনাদ, ও মাই গড!

এই ঘরেই খুন হয়েছিলেন লীনা

এক মহিলা নিস্পন্দ বসে আছেন পা ছড়িয়ে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। দেখে মনে হয়, বয়স চল্লিশের কোঠায়। মাথাটা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া। হাত দুটো বাঁধা নারকেল দড়ি দিয়ে। মুখে একটা কাপড় গোঁজা। তীব্র পচন ধরেছে দেহে। পোকার থিকথিক-ভনভন সর্বাঙ্গে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। দেহ ফুলে গিয়ে সে এক বীভৎস আকার নিয়েছে। শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে বর্জ্য তরল। রক্তের ধারা জমাট বেঁধেছে মেঝে জুড়ে। দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়, এতই দাপট দুর্গন্ধের।

প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করেন বড়বাবু, কে ইনি? ইনিই থাকতেন এ ফ্ল্যাটে? ঝটিতি উত্তর দেন কেয়ারটেকার, 'দিদিমণি। লীনা দিদিমণি।'

লীনা সেন হত্যা মামলা। কড়েয়া থানা, কেস নম্বর ১৩৬/ তারিখ ০৩.০৭.১৯৯৯। ধারা, ৩০২/২০১ আইপিসি। খুন এবং প্রমাণ লোপাট। বালিগঞ্জের অভিজাত বহুতলে মধ্যবয়সি মহিলার নৃশংস হত্যা এবং

পচন-ধরা বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার। চাঞ্চল্য উৎপন্ন হওয়ারই কথা। হয়েওছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মিডিয়া, শহরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'মৈনাক অ্যাপার্টমেন্ট'।

হুলুস্থুল ফেলে দেওয়া খুন। তদন্তের ভার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিতে সময় নিলেন না নগরপাল। রহস্যভেদের দায়িত্ব পড়ল গোয়েন্দাবিভাগের তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর (বর্তমানে ষষ্ঠ সশস্ত্র ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার) বৈদ্যনাথ সাহার উপর।

মামলার তদন্তভার নিল গোয়েন্দাবিভাগ

দ্রুত খবর পাঠানো হল FSL (ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি)-এ। তলব করা হল ডগ স্কোয়াডকে। পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিল পুলিশ কুকুর। ডিসি ডিডি স্বয়ং খবর পেয়েই ছুটলেন হোমিসাইড বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে। তাঁর আগেই পৌঁছে গিয়েছেন ডিসি সাউথ। শুরু হয়ে গিয়েছে প্রাথমিক তথ্যতালাশ। মৃতার দেহ যখন নীচে নামিয়ে এনে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য, রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছে অন্তত শ'দুইয়ের। কড়েয়া থানার ফোর্স হিমশিম খাচ্ছে সামলাতে। বাড়তি ফোর্স রওনা দিয়েছে লালবাজার থেকে।

ঘটনার ঘনঘটায় ঢোকার আগে জরুরি তথ্য কিছু। এক, এগারো তলাতেও যাওয়া হল তালা ভেঙে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা দুটো তলাই তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন, 'no external interference into the flat'। বাইরে থেকে ঢুকে কোনরকম জোরজবরদস্তির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সংগ্রহযোগ্য এক বা একাধিক হাত বা পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে না ঘরের আসবাবপত্র-বাসনকোসনে। একটা আলমারি ছিল ঘরে। সেটাও অক্ষত, ভাঙার কোনও চেষ্টা হয়নি। খুব মূল্যবান কিছু ছিল না ঘরে আপাতদৃষ্টিতে। আর থাকলেও তা যে আততায়ী বা আততায়ীদের অভীষ্ট ছিল না, স্পষ্ট। ডাকাতি জাতীয় কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। কার্পেটে খয়েরি তরলের যে ছোপ দেখা যাচ্ছে দু'-এক জায়গায়, ওটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। তবে 'স্যাম্পল' সংগ্রহ করলেও ওটা যে রক্তই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় একশো শতাংশ নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল হবে। পুলিশ কুকুর এল, দেখল এবং ফিরে গেল। ঘ্রাণযোগ্য তেমন কিছু সূত্র অমিল।

মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধানকে তদন্তকারী অফিসারের চিঠি

দুই, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান অজয়কুমার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে হওয়া ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জানাল, শ্বাসরোধ হয়েই মৃত্যু। মুখ এবং নাক চেপে ধরার চেষ্টা হয়েছিল বলপূর্বক। ড. গুপ্ত লিখলেন, 'The death in my opinion was due to the effect of asphyxia as a result of gagging ante-mortem and homicidal in nature, there was also attempt of closing mouth and nostrils forcibly.' যেমনটা ভাবা হয়েছিল।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অংশ

খুনের আগে যৌন অত্যাচার? হয়নি। স্পষ্ট হয়ে গেল সংগৃহীত 'vaginal swab'-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। খুনটা হয়েছিল কখন? বিশেষজ্ঞরা জানালেন, ২৯ জুন দুপুর থেকে সন্ধের মধ্যে। মনে করিয়ে দিই মামলা রুজু হওয়ার তারিখটা, ৩ জুলাই। যেদিন সন্ধে ছুঁইছুঁই বিকেলে লীনার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল।

তিন, P.O. (Place of Occurrence) থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিসের মধ্যে থাকল মৃতার হাত বাঁধার জন্য ব্যবহৃত নারকেল দড়ি, মুখে গোঁজা কাপড়, রান্নাঘরের মেঝে এবং কার্পেটে জমাট বাঁধা খয়েরি দাগের নমুনা, যে তালা ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢোকা হয়েছিল, সেটা, আরও কিছু টুকিটাকি। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য,

একটি ছোট ডায়েরি। লীনা সেনের।

ডায়েরির বিষয়বস্তুতে পরে আসছি। তার আগে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার মামলার কেন্দ্রে থাকা চরিত্রদের সঙ্গে।

লীনা সেনের জন্ম পাঁচের দশকের গোড়ায়। খুন হওয়ার সময় বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ। জন্ম লীনা মুখার্জি হিসাবে। সাত বছরের ছোট ভাই বর্তমান। নাম অমিত। লীনা কিশোরীবেলা থেকেই ছিলেন বহির্মুখী প্রকৃতির। অত্যন্ত সপ্রতিভ, সুন্দরী। কনভেন্ট-শিক্ষিতা, অনার্স গ্র্যাজুয়েট। প্রেম করে বিয়ে করলেন দক্ষিণ ভারতীয় যুবক বব শেষাদ্রিকে, বয়স যখন চব্বিশ। বিয়ের বছর দুয়েক আগে থেকেই লীনা চাকরি করতে শুরু করেছিলেন নামকরা বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থায়। কর্মস্থল বদলেছিলেন ঘনঘন। কোথাও স্টেনোগ্রাফার, কোথাও রিসেপশনিস্ট, কোথাও বা জনসংযোগ আধিকারিক। মৈনাক অ্যাপার্টমেন্ট-এর ডুপ্লে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন বিয়ের কয়েক মাস আগে। বিয়ের পর ওই ফ্ল্যাটেই দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল বব-লীনার।

মৈনাক অ্যাপার্টমেন্টস-এর প্রবেশদ্বার

বিবাহজীবন সুখের হয়নি। এক বছরের মধ্যেই ডিভোর্স। দ্বিতীয় বিয়ে প্রায় কুড়ি বছর পরে। '৯৫-এর অগস্টে। যাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে, তিনিও বিবাহবিচ্ছিন্ন। প্রদীপকুমার সেন, পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নামকরা বাণিজ্যিক সংস্থার ডাকসাইটে বড়কর্তা। লীনা ছিলেন প্রদীপের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। কর্মসূত্রেই গাঢ় হয় ঘনিষ্ঠতা, পরিণতি বিয়েতে। প্রদীপবাবুর ফ্ল্যাট ছিল যাদবপুর থানা এলাকার প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোডে, 'নয়নতারা অ্যাপার্টমেন্ট'-এ। বিয়ের পর সেখানে গিয়ে উঠলেও লীনা ছাড়েননি বালিগঞ্জের ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটটা।

দেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর খবর দেওয়া হল প্রদীপবাবুকে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ক্যামাক স্ট্রিটে নিজের ফার্ম খুলেছেন। ছুটে এলেন অফিস থেকে এবং মৃতা লীনাকে দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ফ্ল্যাট থেকে যখন সবাইকে বার করে দেওয়া হচ্ছে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য, তখনও সোফা ছেড়ে উঠতে পারছেন না বাক্‌রুদ্ধ প্রদীপ। দুই পুলিশকর্মী ধরে ধরে নিয়ে গেলেন লিফট পর্যন্ত। ডিসি ডিডি ভদ্রলোককে দেখেই চিনলেন। ইনিই তিনি, যাঁকে পুলিশ কমিশনারের ঘরে দেখেছিলেন দিন দুয়েক আগে। যিনি পয়লা জুলাই লালবাজারে নগরপালের কাছে জানিয়েছিলেন আর্জি, 'আমার স্ত্রী-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হেল্‌প মি প্লিজ়।'

বৈদ্যনাথ শুরু করলেন তথ্যসংগ্রহের কাজ। দিব্যি বুঝতে পারছিলেন, দ্রুত কিনারা করার চাপ এই মামলায় অবশ্যম্ভাবী। প্রাথমিক জেরায় যে যতটা বললেন, ফিরে দেখা যাক। যতটা বললেন, তার বাইরেও যা যা জানা যাচ্ছিল পুলিশি তদন্তে, সেটাও থাকুক। সামগ্রিক ছবিটা স্পষ্ট হবে।

প্রদীপকুমার সেনের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর যেভাবে এগোল, সারাংশ তুলে দিচ্ছি।

—মি. সেন, যদি কিছু না মনে করেন, এটা তো দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। প্রথমটা ভেঙে গেল কেন?

—মনে করার কী আছে? ফার্স্ট ওয়াইফ ছিল সুনন্দা। আমাদের এক ছেলে, এক মেয়ে। দু'জনেই বাইরে চাকরি করে। সুনন্দার সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে বছরচারেক আগে। বনিবনা হচ্ছিল না আমাদের। মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স।

—লীনা তো আপনার পিএ ছিলেন বিয়ের আগে, না?

—হ্যাঁ। বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। আমিই জোর করেছিলাম। ভাড়াবাড়িটাও ছেড়ে দিতে বলেছিলাম। রাজি হয়নি।

—সম্পর্ক কেমন ছিল আপনাদের?

—টাকাপয়সা নিয়ে মাঝে মাঝে অশান্তি হত। লীনা হাইপ্রোফাইল লাইফ পছন্দ করত। আমি মাসে মাসে

হাতখরচের জন্য যথেষ্ট টাকা দিতাম। কিন্তু লীনার তাতে কুলোত না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া হত কখনও কখনও। মিটেও যেত। উই ওয়্যার ইন লাভ উইথ ইচ আদার। ইন ফ্যাক্ট, গত মাসের শুরুর দিকে সপ্তাহখানেকের জন্য সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। দারুণ কেটেছিল ছুটিটা।

—কাউকে সন্দেহ হয়? কে মারতে পারে মিসেস সেনকে?

—নো ক্লু। অ্যাবসোলিউটলি নো ক্লু। আমি জাস্ট ভাবতেই পারছি না...

—২৯ জুন, মানে মার্ডারের দিন, স্ত্রী-র সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছিল? আর ওইদিন আপনার মুভমেন্টটা একটু ডিটেলে জানা দরকার।

—সার্টেনলি। সেদিন আমাদের একসঙ্গে লাঞ্চ করার কথা ছিল তাজ বেঙ্গলে। আড়াইটে নাগাদ টেবিল বুক করেছিলাম।

—হুঁ...

—আমি রোজকার মতো সাড়ে ন'টা নাগাদ অফিস বেরলাম। কথা ছিল, লীনা ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে চলে আসবে দেড়টা নাগাদ। সেখান থেকে তাজে যাব। লীনা যখন পৌনে দুটো পর্যন্ত এল না, বাড়িতে ফোন করলাম। কাজের লোক বলল, মেমসায়েব দশটার একটু পরে বেরিয়ে গেছেন।

—তারপর?

—হপ্তায় দু'-একদিন লীনা মৈনাক-এ যেত ইদানীং। ফ্ল্যাটের রিনোভেশন হচ্ছিল। মিস্ত্রিদের যাওয়া-আসা ছিল। নতুন করে সাজাচ্ছিল ফ্ল্যাটটা। আমি ভাবলাম ওখানেই গেছে হয়তো। আসতে দেরি হচ্ছে কোনও কারণে।

—আচ্ছা...

—গাড়ি নিয়ে নিজেই মৈনাক-এ গেলাম। এই দুটো-সোয়া দুটো হবে তখন। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। লীনা ফ্ল্যাটেই ছিল। বলল, রিপেয়ার ওয়ার্ক সব ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, আরও কিছু খুঁটিনাটি কাজ আছে কিনা, দেখতে এসেছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে বেরতে পারেনি।

—সেদিনই শেষ দেখা ওঁর সঙ্গে?

—হ্যাঁ। এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে বলার নয়! আমরা লাঞ্চ ক্যানসেল করলাম। লীনা থেকে গেল ঘরটা গোছগাছ করবে বলে। আমার অফিসে কাজ ছিল। ফিরে এলাম আধঘণ্টা পর। সেই শেষ দেখা ওর সঙ্গে।

—লীনা আর বাড়ি ফেরেননি?

—না। বলেছি তো আগে। আমার বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত দশটা হয়েছিল। এসে দেখলাম, লীনা ফেরেনি। সারা রাত ফিরল না।

—পুলিশে জানালেন না? মৈনাক-এ গেলেন না কেন রাতেই?

—পুলিশে তো পরদিন দুপুরেই জানালাম। যাদবপুর থানায় মিসিং ডায়েরি করলাম। তেমন গুরুত্ব দিল না থানা। অফিসার বললেন, এনকোয়ারি হবে। একটা ফোটো শুধু নিয়ে রাখলেন।

—বুঝলাম, কিন্তু সে-রাতেই তো মৈনাক-এ যেতে পারতেন?

—ভাবলাম, রাতটা দেখি। লীনার মা থাকেন সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউতে। ভাবলাম, হয়তো ওঁর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়েছে। খবর পেয়ে গেছে ওখানে। হয়তো শাশুড়ি জোর করেছেন থেকে যেতে রাতটা। শাশুড়ির শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। প্রতি সপ্তাহেই এক-দু'বার যেত লীনা ওবাড়িতে। ভাবলাম...

—আপনার শাশুড়ির বাড়িতে ফোন নেই? এত কিছু ভেবে না নিয়ে ফোন তো করতে পারতেন একটা।

—করেছিলাম। কানেক্ট করতে পারিনি। জল জমলে শহরের ফোনের কী দশা হয় সে তো জানেনই। আমার অফিসের ফোনও সেদিন দুপুর থেকে ডেড।

—বেশ, তারপর?

—সেই রাতে একফোঁটা ঘুমোতে পারিনি দুশ্চিন্তায়। পরদিন সকালে, এই দশটা নাগাদ আবার গেলাম মৈনাক-এ। দেখলাম, তালা বন্ধ। লীনার কাছেই একমাত্র চাবি থাকত ফ্ল্যাটের। অফিস ফিরে ড্রাইভারকে পাঠালাম সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউয়ে লীনার মায়ের বাড়ি। ওখানেও নেই। আসেইনি। সোজা যাদবপুর থানায় গিয়ে ডায়েরি করলাম। সেদিনও ফিরল না লীনা। পরদিন মাথা কাজ করছিল না আমার। আর কোনও উপায় না দেখে সকাল-সকাল সোজা সিপি সাহেবের কাছেই ছুটলাম। তারপর তো সবটাই জানেন...

দৃশ্যতই ক্লান্ত দেখায় প্রদীপকে। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ভদ্রলোককে, ভাবেন বৈদ্যনাথ। আরও তথ্য আসুক হাতে, তারপর দেখা যাবে।

তথ্য এলও পরের কয়েকদিন দৌড়ঝাঁপের পর। যা প্রদীপ বলেননি প্রাথমিক জেরার সময়। প্রথম, লীনার মা জানালেন, মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক গত কয়েক মাসে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। চাকরি যখন ছেড়েছিলেন, লীনা মাইনে পেতেন মাসিক পনেরো হাজার। আজ থেকে প্রায় বাইশ-তেইশ বছর আগে মাসে হাজার পনেরো মানে অনেক। বিলাসবৈভবের পক্ষে যথেষ্ট। বিয়ের পর চাকরি ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় স্বামীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন সম্পূর্ণ। প্রদীপ মাস গেলে তিন হাজার দিতেন লীনাকে। সেই নিয়েই সূত্রপাত অশান্তির। দুর্ব্যবহার তো ছিলই। গায়েও হাত তুলতেন মাঝেমাঝেই, মায়ের কাছে অনুযোগ করতেন লীনা।

দ্বিতীয়, নিজের কিছু গয়নাগাটি মেয়ের কাছে রেখেছিলেন লীনার মা। বিয়ের পর সেগুলো ফেরত দিতে চাননি প্রদীপ। লীনা এবং তাঁর মায়ের শত অনুরোধেও। এ নিয়েও অশান্তি হত প্রায়ই।

তৃতীয়, লীনার চরিত্রের দিকে নিয়মিত আঙুল তুলতেন প্রদীপ। যিনি সম্প্রতি ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবং গো-হারান হেরেছিলেন। লীনার সঙ্গে সামাজিক স্ট্যাটাসের এতটাই তফাত তাঁর, এবং লীনার বেহিসাবি জীবনযাপন এতটাই প্রচারিত, সেজন্যই ভোট পাননি সংখ্যাগরিষ্ঠের, এমনই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল প্রদীপের।

লীনার যে ডায়েরি পুলিশ পেয়েছিল ফ্ল্যাট থেকে, তাতেও ধরা ছিল অসুখী দাম্পত্যের রোজনামচা। কখনও ইংরেজিতে লিখতেন, কখনও কখনও বাংলায়। লেখার সিংহভাগ জুড়ে প্রদীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আক্ষেপ এবং টাকাপয়সার টানাটানির বৃত্তান্ত। ভাড়া বাড়ানোর জন্য বাড়িওয়ালার তাগিদ ক্রমে অসহনীয় হয়ে ওঠার উল্লেখও রয়েছে ডায়েরির পাতায়।

বাড়িওয়ালার পরিচয় প্রয়োজন এখানে। ডাক্তার স্বয়ম্ভু মুখার্জি। থাকেন মৈনাক থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে, ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে। ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে দেখে আবাসিকরা ৩ জুলাই বিকেলে ডা. মুখার্জিকে ফোন করেছিলেন। তিনিই ফোনে যোগাযোগ করেন কড়েয়া থানার সঙ্গে।

ডা. মুখার্জি জানালেন, হ্যাঁ, অনেকদিন বাড়ির ভাড়া বাড়াননি লীনা। বারবার বললেও কর্ণপাত করতেন না। কয়েক বছর আগে উচ্ছেদের মামলাও করেছিলেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের মামলা যেমন চলতে থাকে অনন্তকাল, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ভাড়া নিয়ে লীনার সঙ্গে কয়েক বছর আগে বাদানুবাদ হয়েছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

শুধু 'ওই পর্যন্তই' যে নয়, শীঘ্রই জানতে পারলেন বৈদ্যনাথ। স্রেফ বাদানুবাদ নয়, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক চূড়ান্ত তিক্ততায় পৌঁছেছিল বছর সাতেক আগে। মৈনাক-এর আবাসিকদের মিটিংয়ে স্বয়ম্ভু চোটপাট করেছিলেন লীনার বেপরোয়া জীবনযাপন নিয়ে। ফ্ল্যাটে যখন-তখন একাধিক পুরুষের যাতায়াত নিয়ে গলা চড়িয়েছিলেন, 'আমার ফ্ল্যাটে এসব নোংরামো চলবে না!' তুমুল তর্কাতর্কি হয়েছিল। লীনা পালটা বলেছিলেন, 'আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনি বলার কে? ফ্ল্যাটের ভাড়ার টাকা গুনে দিচ্ছি, ব্যস! আমার জীবন আমি যেমন খুশি কাটাব। আপনি কে নাক গলানোর?'

এই অশান্তির কিছুদিন পরই লীনার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল এক রাতে। ফ্ল্যাটে মধুচক্র চলছে, এই অভিযোগের তদন্তে। লীনাকে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল থানায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কাগজেও বেরিয়েছিল

ঘটনার খবর। লীনার দৃঢ় ধারণা ছিল, পুলিশে অভিযোগটা স্বয়ম্ভুরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এ নিয়েও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল বিস্তর।

উচ্ছেদের মামলার কাগজপত্র ঘেঁটে বৈদ্যনাথ দেখলেন, লীনা যে দুশ্চরিত্রা এবং বাড়িতে দেহব্যবসা চালাচ্ছেন, সোজাসাপটা এমন অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ম্ভু। পিটিশনের সঙ্গে ছিল ফ্ল্যাটে পুলিশি অভিযানের খবরের পেপারকাটিং।

স্বয়ম্ভু প্রথমে এসব কিছুই বলেননি। বরং জানিয়েছিলেন, উৎসাহ হারিয়েছিলেন মামলা নিয়ে। খবরই রাখেন না আর। জানতে চেয়েছিলেন বৈদ্যনাথ, 'ঝামেলা যে কথা-কাটাকাটির থেকে অনেকটা বেশিই গড়িয়েছিল, বলেননি কেন আগে?' সামান্য অসহিষ্ণু উত্তর এসেছিল, 'অনেকদিন আগের কথা, মনেও ছিল না। আর এসব এই কেসে প্রাসঙ্গিক কি? বাড়িওয়ালা-ভাড়াটেতে এসব ঝামেলা তো হয়েই থাকে। আপনি কি বাই এনি চান্স আমাকে সন্দেহ করছেন? খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, ২৯ তারিখ সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম।'

খোঁজ নেওয়ার বাকি ছিল অনেক। দিনের মধ্যে নিয়ম করে চার-পাঁচ ঘণ্টা মৈনাক-এ কাটাচ্ছিলেন বৈদ্যনাথ। কাজ কি একটা? আবাসনে মোট চুয়ান্নটা ফ্ল্যাট। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নাম-ঠিকানা-পেশা ইত্যাদির তালিকা তৈরি করা। খুনের দিন কে কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, তার 'ইনফর্মেশন শিট' বানানো ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রশ্নোত্তরে। লীনার ফ্ল্যাটের মেরামতিতে যে মিস্ত্রিরা আসত-যেত, তাদের খোঁজ করে জেরা। এবং অপরাধের কোনও পূর্ব-ইতিহাস কারও আছে কিনা, যাচাই করে নেওয়া। ক্লাব-পার্টি-নাচাগানা-হইহই ছিল লীনার স্বভাবজাত। বন্ধুবৃত্তে কে কে ছিলেন তাঁর, কে কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের মধ্যে, সে ব্যাপারে খবর জোগাড় করা বিনিদ্র দৌড়ঝাঁপে।

তদন্তের সনাতনী ব্যাকরণ মেনেই এগোচ্ছিলেন বৈদ্যনাথ। যে ব্যাকরণ বলে, তথ্যই শক্তি। কোনও তথ্যই তুচ্ছ নয়, এই ভেবে এগোও। যথাসাধ্য তথ্য মজুত করো। এবং তারপর কোন কোনটা জরুরি বা প্রাসঙ্গিক নয় একেবারেই, সেগুলো চিহ্নিত করো। সরিয়ে ফেলো চিন্তাস্রোত থেকে। ছবিটা আপনিই পরিষ্কার হয়ে আসবে। ছোট হয়ে আসবে তদন্তের বৃত্তটা, ভাবনা হবে স্বচ্ছতর।

বৃত্ত ছোট হওয়া দূরে থাক, রহস্য জটিলতর হল আবাসনের কর্মীদের জেরাপর্বে। মৈনাক-এর নিরাপত্তাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুরুতে দিয়েছি। দুটো জিনিস যোগ করার। এক, আবাসনে কোনও সিসি টিভি ছিল না। ঢোকা-বেরনোর কোন প্রযুক্তি-প্রমাণ পাওয়ার প্রশ্ন নেই। দুই, যাঁরা আবাসনের বাসিন্দা, তাঁদের 'ভিজিটর্স রেজিস্টার'-এ নাম না লেখালেও চলত। কিন্তু বহিরাগত হলে কোন ফ্ল্যাটে কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, রেজিস্টারে লেখা বাধ্যতামূলক। আবাসিকের সঙ্গে কোনও বহিরাগত এলে? নিয়মনাস্তি।

কেয়ারটেকার এবং অন্য নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বৈদ্যনাথ বুঝলেন, ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র তো নয়ই। বরং ঢিলেঢালা, দায়সারা। ব্যাট-প্যাডের মধ্যে দিয়ে বল গলে যাওয়ার মতো ফাঁক যথেষ্ট।

কেয়ারটেকারের নাম দিলীপ চ্যাটার্জি। একজন সহকারী আছেন, জয়প্রকাশ শর্মা। লিফটম্যান একজনই। নাম, বরুণ রায়। দিলীপ-জয়প্রকাশকে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন একজন কর্মী, শংকর পণ্ডিত। নিরাপত্তারক্ষী মাত্র তিনজন। ভানু ব্যানার্জি, শম্ভু বড়ুয়া এবং অসিত পণ্ডিত। তিন শিফটে আট ঘণ্টা করে ডিউটি। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটো। দুটো থেকে রাত দশটা। দশটা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত নাইট শিফট। একজন লিফটম্যানের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করা অসম্ভব। বরুণ মৈনাক-এ থাকেন দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। বাকি সময় পালা করে লিফটম্যানের ভূমিকায় থাকেন জয়প্রকাশ-শংকর।

মোদ্দা কথা, লোক যেহেতু কম, পরিস্থিতি অনুযায়ী সবার কাজটাই সবাই কমবেশি করে থাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। ২৯ এবং ৩০ তারিখ যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন, সবার সঙ্গে কথা বলা হল বিস্তারিত। বাড়তি তথ্য বলতে, ২৯ তারিখ যখন এসেছিলেন মি. সেনের হাতে একটা মাঝারি সাইজের ফোলিও ব্যাগ ছিল। বেরনোর সময়ও ব্যাগটা সঙ্গে ছিল। আবাসিকদের ছাড়া অন্য কারও গাড়ি ভিতরে পার্ক করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল মৈনাক-এ। ২৯ তারিখ প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল বলে প্রদীপ কেয়ারটেকার অফিসে এসে অনুরোধ

করেন গাড়ি ভিতরে রাখতে দেওয়ার জন্য। ড্রাইভার ইসমাইল ভিতরেই পার্ক করেছিল প্রদীপের ছাইরঙা মারুতি এস্টিম।

লিফটে বরুণ দশতলায় পৌঁছে দিয়েছিলেন প্রদীপকে। নামিয়েও এনেছিলেন আধঘণ্টা পর। পরের দিন, ৩০ তারিখ সকালে প্রদীপ যখন এসেছিলেন, লিফটের দায়িত্বে ছিলেন শংকর। বরুণ-শংকর দু'জনের বিবরণের সঙ্গে প্রদীপের বয়ান মিলে গেল হুবহু। সেনসাহেবের আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছিল? 'না তো!' দু'জনেই বললেন একবাক্যে। লীনা ২৯ তারিখ সেই যে সকাল দশটায় এসেছিলেন, তারপর দুপুর-বিকেলের মধ্যে আর বেরিয়েছিলেন? সেই একবাক্যেই উত্তর, 'না, দিদিমণি তো আর বেরননি। বেরলে তো দেখতেই পেতাম।'

কী দেখতে পেতেন ওঁরা আর কী না পেতেন, সে অবশ্য বৈদ্যনাথ বুঝে গিয়েছিলেন খুনের দিনদুয়েকের মধ্যেই। মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল ৩ তারিখ। সাদা পোশাকে বৈদ্যনাথ ৫ তারিখ রাতে কাউকে কিছু না বলে একাই ঢুঁ মেরেছিলেন মৈনাক-এ। দেখেছিলেন, কেয়ারটেকার অফিসের সামনে নাইট শিফটের নিরাপত্তারক্ষী খুব মন দিয়ে চেয়ারে বসে ঢুলছেন। যে কেউ ঢুকে আবার বেরিয়ে যেতে পারে, চোখেও পড়বে না ঢুলুনিতে আচ্ছন্ন রক্ষীর। শুধু মূল গেটটা টপকাতে হবে। যেটা কোনও ব্যাপারই নয় মোটামুটি শারীরিক সক্ষম যে কারও পক্ষে।

'মৈনাক অ্যাপার্টমেন্টস'-এর দশতলায়

এই যখন অবস্থা, কী করে পুরোপুরি ভরসা করা যায় এদের কথায়? কী করে একশো শতাংশ নিশ্চিত হওয়া যায়, ২৯ তারিখ অন্য কোনও বহিরাগত যাননি লীনার ফ্ল্যাটে, মিস্টার সেন ছাড়া? এরা কিছু বললেই 'ভিজিটর্স রেজিস্টার' দেখাচ্ছে। সব ওতে নোট করা থাকে।

কী নোট করা থাকে, খুঁটিয়ে দেখতে গিয়েই ঘোরতর খটকা। এটা কী হল? ২৯ তারিখ দুপুর সোয়া দুটোয় মিস্টার সেন এসেছিলেন, এন্ট্রি আছে। কিন্তু চারটে থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে দুটো এন্ট্রি পড়া যাচ্ছে না। জলে ধুয়েমুছে গেছে, হাজার চেষ্টাতেও উদ্ধার করা যাচ্ছে না নাম দুটো। আগে-পরের দিনগুলো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। শুধু খুনের দিন এবং সম্ভাব্য সময়ের এন্ট্রিতেই জল পড়ে গেল? কী করে?

বৈদ্যনাথের একেবারেই মনঃপূত হল না কেয়ারটেকার দিলীপবাবুর ব্যাখ্যা, 'সেদিন সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজিটর্স রেজিস্টার বেশিরভাগ সময় তো বাইরেই থাকে। বৃষ্টির জল অসাবধানে পড়েই হয়তো এন্ট্রিগুলো...।' শুধু ওই দিনের, ওই সময়েই বৃষ্টিজল? বৈদ্যনাথ রেজিস্টার নিয়ে গেলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে। ওঁরাও পারলেন না মুছে যাওয়া নামগুলো পড়তে।

বেশ, নাম না হয় পড়া যাচ্ছে না। মাত্র তো দিনকয়েক আগের কথা, মনে করে দেখুন না, মিস্টার সেনের পর আর কে কে এসেছিলেন বাইরে থেকে? ২৯ তারিখ দুপুর চারটে থেকে সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে? লিফটম্যান বরুণ অনেক ভেবে জানালেন, দু'জন এসেছিলেন। একজন দাড়িওলা ভদ্রলোক, মাঝবয়সি। আরেকজন প্রৌঢ়া। কেউই লীনার ফ্ল্যাটে যাননি। প্রথমজন সাততলায় নেমেছিলেন, দ্বিতীয়জন পাঁচে। সঙ্গে বরুণ যোগ করলেন 'যদ্দূর মনে পড়ছে।'

বরুণের 'মনে পড়া'য় আস্থা রাখার কোনও কারণ পাচ্ছিলেন না বৈদ্যনাথ। যদি আস্থা রাখেনও তর্কের খাতিরে, বহিরাগত কেউ তো অন্য ফ্ল্যাটের নম্বর এন্ট্রি করে, অন্য তলায় নেমে আরামসে যেতেই পারে লীনার ফ্ল্যাটে। কে দেখতে যাচ্ছে? লিফটে কে কোন তলায় নেমেছিলেন, কী প্রমাণ হয় তাতে?

তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে খুনের পর। প্রমাণ বা সূত্র মেলেনি কিছু খুনিকে চিহ্নিত করার মতো। এদিকে প্রায়ই সিপি খোঁজ নিচ্ছেন, কিছু হল কিনা? অবসন্ন লাগে বৈদ্যনাথের। সন্ধেবেলায় গেলেন ডিসি ডিডি-র ঘরে। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্তকারী অফিসারকে দৈনন্দিন হালহকিকত জানাতে হয় গোয়েন্দাপ্রধানকে।

নিয়ম।

শ্রান্ত চেহারাটা দেখেই গোয়েন্দাপ্রধান বোঝেন, নির্ণায়ক সূত্র এখনও অধরা থাকায় হতাশা ক্রমশ ঘিরে ধরছে বৈদ্যনাথকে। পিঠে হাত রাখেন, 'লেগে থাকাটাই আসল। দরকারে শূন্য থেকে শুরু করো। দেখবে, হঠাৎ লিড পেয়ে যাবে। ছেড়ো না। লেগে থাকো।'

ঠিকই। লেগে থাকতে হয়। গাভাসকার একবার বলেছিলেন, যে-কোনও পেশায় সফল হতে গেলে তিনটে 'ডি' প্রয়োজন। ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন। শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, সংকল্প। সফল তদন্তকারীর অবশ্য সবার আগে দরকার তিনটে 'পি'। পেশেন্স, পেশেন্স এবং পেশেন্স। অনন্ত ধৈর্য সর্বাগ্রে। মেধা-পরিশ্রম-একাগ্রতা, এসব আসবে অনেক পরে। ধৈর্যই তদন্তকারীর আসল চাঁদমারি। কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছে না, নিজেকেই বারবার গুনগুনিয়ে 'হাল ছেড়ো না বন্ধু' শুনিয়ে যাওয়া চেতনে-অবচেতনে।

পরের দিন অফিসে এসে শূন্য থেকেই ফের শুরু করেন বৈদ্যনাথ। সন্দেহের বৃত্ত খুব বড় নয়। সন্দেহভাজনের তালিকায় শীর্ষবাছাই নিঃসন্দেহে প্রদীপকুমার সেন। সম্ভাব্য মোটিভ? দাম্পত্য অশান্তির সহ্যসীমা অতিক্রম করা। সম্পর্ক যে তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়েছিল, উল্লেখ আছে লীনার ডায়েরিতে। টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তি কি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল? লীনার বন্ধুমহল থেকে জানা যাচ্ছে, শহরের প্রথম সারির বিউটি পার্লারগুলোয় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দিনে তিন-চার প্যাকেট ক্ল্যাসিক সিগারেট খেতেন। অভ্যস্ত ছিলেন মদ্যপানে। চাকরি করতেন না, স্বামীর দেওয়া মাসিক তিন হাজারে চলত কী করে এতসব? অন্য উপার্জন ছিল? থাকলে, কী তার উৎস? কে টাকা দিত, এবং কেন? অন্য পুরুষসঙ্গ, এক বা একাধিক? প্রদীপ জেনে গিয়েছিলেন? যৌন-ঈর্ষা?

অন্যদিকে, খুনের দিনের গতিবিধি সম্পর্কে প্রদীপের বয়ান মিলে যাচ্ছে লিফটম্যান-কেয়ারটেকারের বিবরণের সঙ্গে। আনুমানিক যে সময়ে খুন বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, প্রদীপ সেই সময়সীমার মধ্যে লীনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। সর্বসমক্ষেই গিয়েছিলেন। তাজ বেঙ্গলে খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, সত্যিই সেদিন লাঞ্চ বুকিং ছিল সেনদম্পতির। এবং সে-রাতে সত্যিই ফোন ডেড হয়ে গিয়েছিল লীনার মায়ের বাড়িতে। নিজে মহিলার সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন বৈদ্যনাথ। ফোলিও ব্যাগে কী ছিল? উত্তরে বলেছেন, অফিসের কাগজপত্র। হতেই পারে। অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই। সর্বোপরি নিজেই লালবাজারে এসে খোদ নগরপালের সঙ্গে দেখা করে তদন্তপ্রক্রিয়া চালু করেছেন প্রদীপ। না হলে তো স্রেফ 'মিসিং ডায়েরি'-র অনুসন্ধানেই সময় চলে যেত রুটিনমাফিক। কিছুই তো সেভাবে লুকোনোর চেষ্টা করেননি, বৈবাহিক অশান্তির তীব্রতাটা বাদ দিয়ে।

অবশ্য সম্ভাব্য অপরাধীর এই 'কিছুই তো লুকোচ্ছি না'-র প্রবণতা নতুন কিছু নয়। অনেকেই হয়। পুলিশকে বিপথে চালিত করতে সব তাস আগেভাগেই দেখিয়ে দেওয়ার চালাকি, যাতে সন্দেহের সূচিমুখ একটা সময়ের পর ধাবিত হয় অন্য দিকে। আর এ তো কল্পনার গোয়েন্দাকাহিনি বা সিনেমা নয়, যে পুলিশ যাকে প্রাথমিক তদন্তে অপরাধী মনে করছে, শেষ বিচারে তার দোষী হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। এ তো 'ফিকশন' নয়, যে কোনও মহাপ্রতিভাধর গোয়েন্দা মধ্যপথে আবির্ভূত হবেন এবং শেষে পুলিশি ধারণাকে দুরমুশ করে ছাড়বেন। এবং দেখা যাবে, পুলিশ যা ভেবেছিল, সবই স্থূলবুদ্ধির প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং প্রদীপ সেনকে ক্লিন চিট দেওয়াটা আহাম্মকি হবে। কিন্তু যদি প্রদীপ খুনটা করে থাকেন, প্রমাণ কই? সন্দেহের বশে তো আর খুনের মামলায় কাউকে আদালতে চালান করা যায় না, যখন ন্যূনতম প্রমাণটুকুও নেই হাতে। আর যদি প্রদীপ খুনি না হন, তা হলে কে? অন্য কেউ? না, অন্য কারা?

'অন্য কেউ' বলতে ডাক্তার স্বয়ম্ভু মুখার্জির নাম মাথায় আসতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সন্দেহের আওতার বাইরে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হ্যাঁ, 'অ্যালিবাই' যথেষ্ট মজবুত। খুনের দিনে, খুনের সম্ভাব্য সময়ে বাড়িতেই ছিলেন, যাচাই করে জানা গিয়েছে নিঃসংশয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, খুনটা নিজে করেননি। করিয়েছেন। মোটিভ তো ছিলই। ফ্ল্যাটের দখল ফিরে পাওয়া এবং নতুন করে ভাড়া দেওয়া বা বেচে দেওয়া।

অমন জায়গায় ফ্ল্যাট অনায়াসে বিক্রি হবে বিশাল অঙ্কের টাকায়। ভাড়া দিলেও পাবেন, লীনা যা দিতেন, তার অন্তত তিনগুণ।

ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গেই কিছু খটকা। লীনার জীবনযাপন নিয়ে যে তাঁর সঙ্গে এত বিশ্রী কাদা ছোড়াছুড়ি হয়েছিল, এটা প্রাথমিক কথাবার্তায় চেপে গেলেন কেন? মামলা নিয়ে কোনও আপসরফা হয়েছিল লীনার সঙ্গে? হলে কেমন রফা? কী সেই রফাসূত্র?

সম্পর্কের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও খুনটা যদি স্বয়ম্ভুই লোক লাগিয়ে করিয়ে থাকেন, ধরে নিতে হয়, ফ্ল্যাটের মালিকানা প্রাপ্তি কারণ হিসাবে নেহাতই গৌণ। গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল কিছু। কী হতে পারে? 'সম্পর্কের উন্নতি' মানে কী? কেমন সম্পর্ক? সেই সূত্রেই ব্ল্যাকমেল? বা আরও গুরুতর কিছু? হাজার প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে থাকে বৈদ্যনাথের।

খুনটা করানোই যদি হয়ে থাকে, তা হলে কাদের দিয়ে? আবাসনের কর্মীদের এক বা একাধিককে দিয়ে করানোটাই সবচেয়ে সহজ। ফ্ল্যাটের অ-আ-ক-খ থেকে অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নখদর্পণে ওদের। টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস। হতেই পারে, টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তাকর্মীদের কয়েকজনকে, বা হয়তো একজনকেই, হাত করে খুনটা করিয়েছেন স্বয়ম্ভু।

সম্ভাবনা নম্বর তিন, খুনটা স্রেফ ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে হয়েছে। এবং করেছেন আবাসনের এক বা একাধিক কর্মী। লীনা মিষ্টভাষী ছিলেন, এমন অভিযোগ জেরার সময় আবাসনের কেউ করেননি। অত্যন্ত রগচটা ছিলেন। মুখে কোনও লাগাম থাকত না রেগে গেলে। বৈদ্যনাথ বিশ্বস্ত সোর্স লাগিয়েছিলেন একাধিক। যারা নানা কাজকর্মের ছুতোয় ভাব জমানোর চেষ্টা করেছে মৈনাক-এর কর্মীদের সঙ্গে। এবং সোর্স মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঘটনার দিনদশেক আগে লিফটম্যান বরুণের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল লীনার। লিফট খুলতে দেরি হয়েছিল। যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করেছিলেন লীনা। সে নিয়ে কেয়ারটেকার অফিসে নাকি চর্চাও হয়েছিল বিস্তর।

লীনা নাকি মানুষ বলেই গণ্য করতেন না কর্মীদের, এতটাই নাকউঁচু ছিলেন। কর্মীরাও অত্যন্ত অপছন্দ করতেন বদমেজাজি লীনাকে। পুষে রাখা রাগ জমতে জমতে কি কোনওভাবে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যে একক বা যৌথ ষড়যন্ত্রে একেবারে মেরে ফেলারই সিদ্ধান্ত? ভাবতে একটু কষ্টকল্পিত লাগলেও একেবারেই অসম্ভব কি? আর সবচেয়ে বড় কথা, বৃষ্টির জলে শুধু সেদিনের ওই সময়ের এন্ট্রি দুটোই মুছে গেল? একটু বেশিই কাকতালীয় না?

একটাই দূরতম সম্ভাবনা পড়ে আছে আর। বব শেষাদ্রি। লীনার প্রথম স্বামী। যাঁর কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না এদিক-ওদিক অনেক খবর নিয়েও। কেউ কিছু বলতে পারলেন না। এই বব কি কোনওভাবে ফের উদয় হয়েছিলেন লীনার জীবনে? হলেই বা কী, সন্ধান তো পেতে হবে আগে।

আর এমনই কপাল, না লীনা-প্রদীপ, না স্বয়ম্ভু, কেউই ব্যবহার করতেন না মোবাইল। চার বছর আগে, '৯৫-এ, ভারতে এসে গিয়েছে মোবাইল ফোন। রাস্তাঘাটে সবারই হাতে হাতে ফোনের অভ্যেস চালু হতে তখনও ঢের দেরি। তবু, সামাজিক অবস্থানের বিচারে ওঁদের তিনজনের কাছে থাকতেই পারত মোবাইল। থাকলে তদন্তে সুবিধে হত অনেক। যাক, ছিল না যখন, কী আর করা?

ঘটনার পরের দুই সপ্তাহে প্রদীপ-স্বয়ম্ভু তো বটেই, আবাসনের কর্মীদের সবাইকে লালবাজারে ডেকে দফায় দফায় জেরা করেছেন বৈদ্যনাথ। অন্তত চারবার তো বটেই। তবু সিদ্ধান্ত নিলেন সবাইকে আর একবার তলব করার। পঞ্চমবার রুটিনমাফিক ডেকে পাঠানোর সময় জানতেন না, রহস্যভেদ দ্রুত হতে চলেছে অভাবিত ঘটনাপ্রবাহে।

২৯ জুলাই। লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের দোতলা। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। সকাল দ্রুত পা চালাচ্ছে দুপুরের দিকে। নিজের ঘরে আছেন বৈদ্যনাথ। সঙ্গে এক সহকারী অফিসার। পাশের একটা ঘরে অপেক্ষায় প্রদীপকুমার সেন, ডা. স্বয়ম্ভু মুখার্জি, মৈনাক-এর কেয়ারটেকার দিলীপ আর লিফটম্যান বরুণ।

দিলীপ-বরুণ ফিরে গেলে বাকিদের আসার কথা পালা করে।

প্রথমে প্রদীপ। বৈদ্যনাথ ইচ্ছে করেই সবাইকে বসিয়ে রেখেছেন ঘণ্টাখানেক। মিস্টার সেনের ডাক পড়ল প্রায় পৌনে একটায়। এত দেরি হওয়ায় বেশ ধৈর্যচ্যুত দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। বিরক্তি গোপনের চেষ্টাও করলেন না বিশেষ। চেয়ার টেনে বৈদ্যনাথের মুখোমুখি বসতে বসতেই বললেন, 'মিস্টার সাহা, এই নিয়ে পাঁচবার হল। একই কথা আর কতবার জানতে চাইবেন আপনারা? এক মাসও হয়নি আমার স্ত্রী মারা গেছেন। মেন্টালি ভীষণ ডিস্টার্বড আছি। অফিসের কাজও শিকেয় উঠেছে। তার মধ্যে বারবার লালবাজারে এভাবে আসতে হলে...।'

বৈদ্যনাথ স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেই রেখেছিলেন। শুরু থেকেই চালিয়ে খেলবেন আজ। একদম কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের স্টাইলে।

—সরি মিস্টার সেন। আমারই কি ভাল লাগছে বারবার এভাবে ডাকতে? আপনারা কেউই পুরো সত্যিটা বলছেন না বলেই ডাকতে হচ্ছে। উপায় কী?

প্রদীপও ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেন।

—কোন সত্যিটা বলিনি? কোনটা?

বৈদ্যনাথকে এবার উত্তেজিত দেখায় সামান্য।

—আমাকে বলে দিতে হবে, কোনটা? ডায়েরির মাত্র কয়েকটা পাতা নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছি এতদিন। বাকিগুলোর কথা তুলিইনি। এই ভেবে, যে আপনি নিজেই বলবেন হয়তো।

টেবিলে রাখা লীনার ডায়েরিটা হাতে তুলে নিয়ে বলে চলেন বৈদ্যনাথ।

—খুন হওয়ার দিনতিনেক আগে আপনার মিসেস কী লিখেছিলেন ডায়েরিতে, শুনবেন?

'এভাবে আর পারছি না আমি। সিঙ্গাপুরে গিয়ে আমাকে হোটেলের রুমের মেঝেতে শুতে বাধ্য করল প্রদীপ। আমার সঙ্গে বেড শেয়ার করতে নাকি ওর ঘেন্না করে। আমি নাকি রাস্তার মেয়ে। একটা সামান্য পারফিউম কিনতে চেয়েছিলাম গতকাল। মুখের উপর বলল, একটা পয়সাও খরচ করবে না আমার জন্য। বিদেশে বেড়াতে এনেছে, এই ঢের।'

একটু থামেন বৈদ্যনাথ, শান্ত ভাবে চোখে চোখ রাখেন প্রদীপ সেনের।

—কী সেনসাহেব, আরও শুনবেন? আমি আরও বলতে পারি। কিন্তু শুনতে আপনার ভাল লাগবে না...

প্রদীপ সেনের চোখমুখ এতক্ষণে রাগে থমথমে। থামিয়ে দেন প্রশ্নকারীকে।

—না, ভাল লাগছেও না। আর শুনতেও চাই না আমি। কারণ, লীনা চিরকালই মিথ্যেবাদী ছিল, ড্যাম লায়ার! শুনুন মিস্টার সাহা, পুরোটাই মিথ্যে ছিল ওর...

—কোনটা মিথ্যে? এই ডায়েরির লেখাগুলো মিথ্যে? টাকাপয়সা দিতেন না, জামাকাপড় দিতেন না, প্রতি মুহূর্তে অপমান করতেন, এগুলো মিথ্যে? সিঙ্গাপুরে একটা পারফিউম কিনতে চেয়েছিলেন বলে পাঁচটা কথা শুনিয়েছিলেন, মিথ্যে?

—দিতাম না, বেশ করতাম। আমার কাছে সাদা হাতি পোষার মতো হয়ে গিয়েছিল লীনা। টাকা, টাকা আর ওনলি টাকা। আমি তো তবু ওর শখ মেটাতে এতগুলো টাকা খরচ করে সিঙ্গাপুর নিয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কেউ হলে করত না। আর পারফিউম, জামাকাপড়? ওর সবকিছু, এমনকী মৈনাক-এ যে আন্ডারগার্মেন্টস পরে গিয়েছিল সেদিন, সেগুলোও সিঙ্গাপুরের lingerie shop থেকে কেনা।

শেষ বাক্যটা বলেই আচমকা থেমে যান প্রদীপ। দৃশ্যতই অপ্রস্তুত। বৈদ্যনাথ নিমেষে বোঝেন, অপরাধীর যুক্তি-তক্কো-গপ্পোর বাসরঘরে এই সেই কাঙ্ক্ষিত ছিদ্র, যা নজরে আসা মাত্রই কালসর্প হয়ে ঢুকে পড়তে হয় তদন্তকারীকে, বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে।

—তাই? কী করে জানলেন ওই আন্ডারগার্মেন্টস পরেই সেদিন নিজের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন লীনা? আধঘণ্টা থেকে কথাবার্তা বলেই তো চলে এসেছিলেন। ওটাই আপনার সঙ্গে শেষ দেখা, শেষ কথা। ওই সময়ের মধ্যে শারীরিক মিলন না হয়ে থাকলে নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে অন্তর্বাসের ব্যাপারে? হয়েছিল?

স্রেফ ঢিল ছুড়েছিলেন বৈদ্যনাথ, একরকম মরিয়া হয়েই। যেটা পড়ে শুনিয়েছিলেন ডায়েরি থেকে, সেটা বানানো। সিঙ্গাপুরের ব্যাপারে কোনও এন্ট্রিই ছিল না ডায়েরিতে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আত্মঘাতী মন্তব্য করে বসবেন প্রদীপ, তিন সপ্তাহের দুর্ভেদ্য রক্ষণকে ভঙ্গুর দেখাবে রাতারাতি, ভাবতে পারেননি বৈদ্যনাথ। ক্রমশ অসহায় দেখাতে থাকে প্রদীপকে, আমতা-আমতা করে কিছু বলতে চেষ্টা করেন।

—না মানে...

—মানে একটাই হয় মিস্টার সেন। আপনি উকিল-টুকিলকে ফোন করতে পারেন। কোনও অসুবিধে নেই। আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। সারা দিন সারা রাত পড়ে আছে। তবে যত তাড়াতাড়ি সত্যিটা স্বীকার করবেন, ততই ভাল। পুলিশি আদরযত্নের প্রয়োজন হবে না, আই অ্যাম শিয়োর। তা ছাড়া আপনার বয়স হয়েছে...

বৈদ্যনাথের গলার স্বর আমূল পালটে গিয়েছে এখন। এ স্বর প্রতিপত্তিশালী কর্পোরেট কর্তাকে সৌজন্যমিশ্রিত পুলিশি প্রশ্নের নয়। জালে জড়িয়ে যাওয়া অপরাধীকে উদ্দেশ করে এ স্বর এখন আত্মবিশ্বাসী আইনরক্ষকের। সব খুলে বলা ছাড়া উপায় ছিল না প্রদীপের।

পুরোটাই ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা। সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাওয়ার আগেই। দুটো কারণ ছিল। এক, লীনার টাকাপয়সার বায়নাক্কা সামলাতে সামলাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন প্রদীপ। মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। দুই, বিয়ের বছরদুয়েক পর থেকেই লীনার 'কুছ পরোয়া নেহি' জীবনযাপন। কখন কোন ক্লাবে কোন পুরুষের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন, কোন পার্টি থেকে কখন বেরিয়ে পুরুষসঙ্গীকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন মৈনাক-এর ফ্ল্যাটে, খবর ঠিকই পেয়ে যেতেন প্রদীপ। সামাজিক পরিচিতির পরিধিটা নেহাত ছোট ছিল না তাঁর। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। লীনা বদলাননি নিজেকে, প্রদীপও আর্থিক দিক থেকে স্ত্রীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছেন ক্রমশ। এবং একটা সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্ত্রী-কে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার।

সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাওয়াটা লোক-দেখানো। সপ্তাহদুয়েক আগেই যিনি স্ত্রী-র সঙ্গে বিদেশ ঘুরে এলেন, তিনি হঠাৎ খুন করতে যাবেন কেন সহধর্মিণীকে, এই ধারণা তৈরি করতে। তাজ বেঙ্গল-এ লাঞ্চের বুকিং-ও একই কারণে। স্ত্রী-র সঙ্গে যাঁর লাঞ্চে যাওয়ার কথা হয়ে আছে, তিনি সেদিনই খুন করবেন অক্লেশে, বিশ্বাসযোগ্য?

প্রদীপ প্রাথমিক জেরায় বলেছিলেন, কথা ছিল, লীনা বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে আসবেন। মিথ্যে বলেছিলেন। কথা বরং ছিল, ফ্ল্যাটের তদারকিতে লীনা মৈনাক-এর ফ্ল্যাটে যাবেন। সেখানে পৌনে দুটো-দুটো নাগাদ প্রদীপ চলে আসবেন অফিস থেকে। লীনাকে তুলে লাঞ্চ করতে যাবেন একসঙ্গে।

প্রদীপ এসেছিলেন কথামতো, সময়মতো। হাতে ছিল ফোলিও ব্যাগ। যার ভিতরে ছিল কাপড়ের টুকরো, প্লাস্টিকের ছোট প্যাকেট একটা আর নারকেল দড়ি। লীনার ফ্ল্যাটে গিয়ে টুকটাক কিছু কথাবার্তার পর আচমকাই আক্রমণ করেছিলেন স্ত্রী-কে। প্রদীপ, আগে লিখেছি, যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ছিলেন। হতচকিত লীনার সাময়িক প্রতিরোধকে আয়ত্তে আনতে বেশি সময় লাগেনি। শ্বাসরোধ করে মেরেছিলেন স্ত্রী-কে। তারপর বিবস্ত্র করে দিয়েছিলেন লীনাকে। এটা কেন? প্রদীপের মুখেই শুনুন— 'রাগে। ওকে সবার সামনে লিটারালি বেআব্রু করে দিতে চেয়েছিলাম। অনেকে তো জানতই ওর চরিত্রের স্বরূপ। এবার দেখুক। সবাই দেখুক।'

রান্নাঘরে লীনার দেহ ঢুকিয়ে রেখে বেরিয়ে এসেছিলেন প্রদীপ। মুখে কাপড় গুঁজে, হাত নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে। ফোলিও ব্যাগে ভরে নিয়েছিলেন লীনার পোশাকআশাক আর হ্যান্ডব্যাগ। হ্যান্ডব্যাগ থেকে ফ্ল্যাটের চাবিটা নিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে লিফট ডেকেছিলেন নির্বিকার। আবাসন থেকে বেরিয়ে অফিস ফেরার পথে ড্রাইভার ইসমাইলকে বলেছিলেন আউট্রাম রোড হয়ে যেতে। গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিলেন

নেচার পার্ক-এর সামনে। ইসমাইল অপেক্ষা করছিল গাড়িতে, আর প্রদীপ ব্যাগ হাতে ঢুকে গিয়েছিলেন পার্কে। চাবিটা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ঝোপঝাড়ের মধ্যে। লীনার জামাকাপড় ব্যাগসুদ্ধ ফেলেছিলেন আর-এক প্রান্তে। তারপর সোজা অফিস। পরের দিন থানায় ডায়েরি, আর তারও পরের দিন সশরীরে লালবাজারে এসে কুম্ভীরাশ্রু। পচাগলা মৃতদেহ কয়েকদিনের মধ্যে আবিষ্কৃত হবেই, জানতেন প্রদীপ। প্রশ্নের জবাব দেওয়া তখন মুশকিল হবে, জানতেন। তাই এগিয়েছিলেন আটঘাট বেঁধেই।

স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যাওয়া হল নেচার পার্ক-এ। কাগজের মোড়কে চাবিটা পাওয়া গিয়েছিল নির্দিষ্ট জায়গাতেই। কিন্তু পাওয়া যায়নি লীনার পোশাক আর হ্যান্ডব্যাগ। কত লোকেরই তো যাতায়াত ওই পার্কে নিত্যদিন। কেউ হয়তো নিয়ে গিয়েছিল দেখতে পেয়ে।

চার্জশিটের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, তখনও বৈদ্যনাথ পাননি একটা প্রশ্নের উত্তর। খুনের দিন 'ভিজিটর্স রেজিস্টার'-এ জলের দাগে দুটো এন্ট্রি মুছে যাওয়াটা। কী ব্যাখ্যা? উত্তর মেলেনি। এমন ব্যাখ্যাতীত সমাপতন বোধহয় কালেভদ্রেই সম্ভব, যা হাজির হয় তদন্তকে বিপথগামী করার সম্ভাব্য উপাদানসমেত।

এ মামলার পরিণতি অনেকাংশেই ছিল পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) নির্ভর। খুনের কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই। শ্বাসরোধ করে হত্যা, খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রশ্ন নেই। অকুস্থলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আঙুলের বা পায়ের ছাপ মেলেনি অভিযুক্তের। অপরাধী কে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলেও তদন্তকারীকে অসম্ভব যত্নবান হতে হয় এ ধরনের মামলায়, যেখানে প্রমাণ-পরম্পরায় (chain of evidence) সামান্যতম ফাঁকফোকর থাকলেও ভরাডুবি অনিবার্য। এবং এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ছিলেন অর্থবান। প্রদীপকুমার সেন যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে অর্থব্যয় করবেন যথেচ্ছ, জানাই ছিল।

কী ঘটেছিল, কীভাবে এবং কেন, চার্জশিটে উঠে এসেছিল ছবির মতো। বিচারপর্বে অভিযুক্তের আইনজীবীর প্রধান যুক্তি ছিল, ষাট বছরের এক প্রৌঢ়র পক্ষে একা ওইভাবে প্রায় পনেরো বছর কম বয়সের মহিলাকে খুন করা অসম্ভব। এ যুক্তি ধোপে টেকার ছিল না। টেকেওনি। লীনাকে কাবু করার মতো স্বাস্থ্য যে অভিযুক্তের ছিল, রায়ে উল্লিখিত হয়েছিল।

পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসাবে প্রত্যাশিতভাবেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছিল পার্ক থেকে উদ্ধার হওয়া চাবির গোছা। লীনার তালাবন্ধ ফ্ল্যাটের চাবি কী করে প্রদীপের কাছে এল, আর কেনই বা সেটা লুকিয়েচুরিয়ে ফেলে এলেন পার্কে, জবাব ছিল না এ প্রশ্নের। ড্রাইভার ইসমাইল তাঁর বয়ানে স্বীকার করেছিল পার্কে যাওয়ার কথা। পার্কের নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ান নেওয়া হয়েছিল। একজন মনে করতে পেরেছিলেন সেদিনের কথা। গাড়ি এসে থেমেছিল, একজন ব্যাগ নিয়ে নেমেছিলেন, ফিরে এসেছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে খালি হাতে। এজলাসে প্রদীপকে চিহ্নিত করেছিলেন ওই রক্ষী।

কী পড়ে থাকে আর? লীনার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ থাকা অসুখী দাম্পত্যের বিবরণ বিবেচিত হয়েছিল খুনের 'মোটিভ' হিসাবে। ডায়েরির হাতের লেখা যে লীনারই, চিহ্নিত করেছিলেন ভাই অমিত। সর্বোপরি, জীবিত অবস্থায় লীনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল প্রদীপের সঙ্গে। দেখেছিলেন লিফটম্যান বরুণ, যখন প্রদীপ ফ্ল্যাটের বেল বাজিয়েছিলেন ২৯ তারিখ দুপুরে, লীনা খুলেছিলেন দরজা এবং প্রদীপ ঢুকে গিয়েছিলেন ফ্ল্যাটে। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভাষায় একে বলে হয় 'last seen alive together', যা এই ধরনের মামলায় (যেখানে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই অপরাধের) প্রমাণ হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন প্রদীপকুমার সেন। দণ্ডিত হয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। এখন পরলোকগত।

সম্পর্কের রসায়ন ভারী বিচিত্র। বিনিয়োগের রসায়ন। কোথাও পুঁজি স্রেফ বিশ্বাস, কোথাও-বা নির্ভরতা। কোথাও হয়তো ভালবাসা, কোথাও অন্য কোনও অনুভূতি। ঈর্ষা-ক্ষোভ-দ্বেষ, বা অন্য কিছু।

প্রদীপ-লীনার সম্পর্কেও বিনিয়োগ ছিল উভয়ত। অব্যক্ত হিসেব ছিল পারস্পরিক। নারীবিষয়ে প্রদীপের দুরারোগ্য দুর্বলতা লীনা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। এবং প্রৌঢ়ত্বের স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রদীপকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন একটাই কারণে। নিজে গভীর আসক্ত ছিলেন জেটগতির দিনযাপনে। সেই জীবনযাত্রায়

অর্থবান এবং সামাজিক প্রতিপত্তিশালী স্বামী দীর্ঘস্থায়ী অনুঘটক হয়ে দেখা দেবেন, এই নিশ্চিন্ততায়।

আর প্রদীপ? রিপুর তাড়না চরিতার্থ করাই ছিল পাখির চোখ। 'শরীর শুধু শরীর, তোমার মন নাই লীনা' বলার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি কখনও। বলবেন, এমন প্রত্যাশাও লীনার ছিল না।

প্রেম ছিল না ওঁদের। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব ছিল। যা দু'জনেই ভালবাসার আব্রু দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বিয়ের পরের কয়েক মাস। কিন্তু যে সম্পর্কের ইট-বালি-চুন-সুরকিতে শুধুই দেওয়া-নেওয়া, তাতে ফাটল ধরা ছিল অবধারিতই। 'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে'-ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন উভয়েই।

পরিণতি? পড়লেন তো!

এ কাহিনির শিরোনাম হয় না

ঠিক যেন 'শোলে'! স্থান-কাল-পাত্রে দূরতম মিলও নেই। মিল নেই পটভূমিতেও। তবু মনে পড়ে যেতে বাধ্য রমেশ সিপ্পির কালজয়ী ব্লকবাস্টারের সেই দৃশ্য।

পাশাপাশি শোয়ানো পাঁচটি মৃতদেহ। সাদা কাপড়ে মোড়া। দীর্ঘদিন পর পাওয়া ছুটিতে দেশের বাড়ি ফিরছেন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সঞ্জীবকুমার, রামগড়ে নিজের গ্রামে যিনি সর্বজনমান্য ঠাকুরসাব। যিনি সদ্য গ্রেফতার করে জেলে পুরেছেন দুর্ধর্ষ ডাকাত গব্বর সিং-কে। স্টেশনে বাড়ির লোকজন নেই কেউ, দেখে অবাকই হয়েছেন। কেউ এল না? আশ্চর্য!

বাড়ি পৌঁছনোর পর বিস্ময় বদলে গেছে স্তব্ধতায়। পাতা পড়ছে না চোখের। পাশাপাশি পাঁচটি দেহ শুয়ে নিথর। দুই ছেলে, একমাত্র মেয়ে, পুত্রবধূ। এবং আট বছরের নাতি। জেল পালিয়ে যাদের খুন করে গেছে গব্বর, ভয়ংকরতম বদলা নিয়েছে গ্রেফতারির। পরিবার নিশ্চিহ্ন। অক্ষত শুধু ছোটছেলের স্ত্রী, আর বহু বছরের গৃহভৃত্য। যাঁরা গব্বরের হত্যালীলার সময় পুজো দিতে গিয়েছিলেন মন্দিরে।

গৃহভৃত্য কাঁদছেন মনিবের পা জড়িয়ে ধরে। ছোটবউ বাড়ির দালানে বসে আছেন শোকস্তব্ধ। এতদিন পরে বাড়ি আসছেন, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য ঠাকুরসাব কিছু-না-কিছু কিনে এনেছিলেন। দু'হাত থেকে খসে পড়তে থাকে সেই উপহারগুচ্ছ। একটার পর একটা।

দমকা হাওয়া আসে। উড়িয়ে নিয়ে যায় চারটি দেহের উপর থেকে সাদা কাপড়। তিন সন্তান এবং পুত্রবধূর গুলিবিদ্ধ দেহে একে একে চোখ রাখেন বাক্‌রুদ্ধ ঠাকুরসাব। পঞ্চম দেহের উপরের কাপড় তখনও উড়ে যায়নি হাওয়ায়। নাতির দেহের উপর থেকে নিজেই কাপড় সরান ধীরে। শোক ততক্ষণে বদলে গেছে উন্মত্ত ক্রোধে।

মুরারিপুকুরের দশ বাই বারোর একচিলতে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'শোলে' মনে পড়ে যায় ওসি মানিকতলার। বাহ্যত মিল নেই কোনও, তবু। ওটা সিনেমার পরদা, এটা ঘোর বাস্তব। ওটা ঘটেছিল খোলা আকাশের নীচে, এটা ঘটেছে চার দেওয়ালের মধ্যে। ওটায় ঘাতক ছিল বন্দুকের গুলি, এটায় গলার ফাঁস। রামগড়ে নিহতের সংখ্যা ছিল পাঁচ। এখানে মেঝেতে একটা, আর খাটের উপর পাশাপাশি পড়ে আছে পাঁচটা দেহ। ওটায় লাশগুলোর মুখ ঢাকা ছিল কাপড়ে। এখানে নেই।

মেঝেতে প্রাণহীন দেহ এক মহিলার। গলায় উলের চাদরের প্যাঁচ। বয়স তিরিশের নীচেই হবে। খাটে ফুলের মতো পাঁচটি বাচ্চা মেয়ে। যেন ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে। কারও গলায় ওড়নার ফাঁস, কারও গলায় মাফলারের। বয়স? সবচেয়ে বড় যে, সে কিছুতেই বারোর বেশি নয়। সবচেয়ে ছোট দু'জনকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যমজ। বয়স খুব বেশি হলে পাঁচ-ছয়।

পুলিশের চাকরিতে কম দিন হল না মানিকতলা থানার বড়বাবু দ্বিজেন চ্যাটার্জির। অসংখ্য মৃতদেহ দেখেছেন। দুর্ঘটনায় ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া শরীর দেখেছেন অনেক। দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে যাওয়া বডি দেখেছেন একাধিক। তদন্তের স্বার্থে বহুবার ডাক্তারবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন ময়নাতদন্তের কাটাছেঁড়া। দেহ, সে যতই বিকৃত হোক, স্নায়ু বিন্দুমাত্রও চঞ্চলতা দেখায়নি কখনও।

সঙ্গী সাব-ইনস্পেকটর তাই অবাকই হন একটু। দ্বিজেন ঠায় তাকিয়ে আছেন পড়ে থাকা হাফডজন দেহের দিকে। একটু এগিয়ে যান যমজ মেয়েদুটির গলার ফাঁস পরীক্ষা করতে। মুখের উপর ঝুঁকে কয়েক

সেকেন্ড দেখার পরই পিছিয়ে আসেন। ফ্যাকাশে হয়ে আসে চোখমুখ। অস্ফুটে অধস্তন সহকর্মীকে বলেন, ‘ডিসি ডিডি-কে ধরো।’ মোবাইল এগিয়ে দেন নিজের।

—স্যার, রিং হচ্ছে। ধরুন, ডিসি ডিডি সাহেব...

ফোন হাতে নিয়ে কোনওমতে ‘নমস্কার স্যার, এত রাতে ডিস্টার্ব করার জন্য সরি স্যার’ বলার পরই বিদ্রোহ করে বহুপরীক্ষিত স্নায়ু। হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন ডাকসাইটে ওসি। জড়ানো গলায় শুধু বলতে পারেন, ‘একবার আসুন স্যার, শুধু দেখে যান, বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে... এতদিনের চাকরিতে এমন কখনও দেখিনি স্যার...।’

ঘড়ি দেখেন গোয়েন্দাপ্রধান। পৌনে চারটে। পোড়খাওয়া ওসি কীসে এতটা বিচলিত হয়ে পড়লেন, যে পুরো বাক্যটা শেষ করতে না পেরে কেঁদেই ফেললেন? এখনই যাওয়া দরকার স্পটে। বিছানা ছেড়ে উঠতে না উঠতেই মোবাইল বেজে উঠল আবার। এবার লালবাজার কন্ট্রোল রুম, ‘স্যার, মুরারিপুকুরে মাল্টিপল মার্ডার। ওসি স্পটে আছেন। ডিসি যাচ্ছেন। প্রবলেম হচ্ছে একটু। লোক জমে গেছে। বডি বার করতে সমস্যা হতে পারে। ডিসি হেডকোয়ার্টার স্পটে RAF পাঠাতে বলেছেন। ফোর্স যাচ্ছে স্যার।’

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ফোন কেটে দেন গোয়েন্দাপ্রধান, ‘হ্যাঁ, শুনেছি, ওসি-র সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি যাচ্ছি। ওসি হোমিসাইডকেও যেতে বলুন। আর, পারলে সিপি সাহেবকে জানিয়ে রাখুন ইনসিডেন্টটা।’

গোয়েন্দাপ্রধানের গাড়ি যখন ঢুকছে মুরারিপুকুরে, ঘড়িতে ভোর সাড়ে চারটে। নাকি লেখা উচিত, রাত সাড়ে চারটে? সময়টাই এমন, যখন রাত আর ভোর সহবাস করে দৈনন্দিন।

রহস্যপিপাসুর সনাতন চাহিদা এ কাহিনি মেটাবে না, স্বীকার্য শুরুতেই। একটা অপরাধ ঘটবে, থাকবে একাধিক সন্দেহভাজন, প্রত্যেকেরই থাকবে অপরাধী হওয়ার সম্ভাব্যতা, পাঠক আগাগোড়া থাকবেন দ্বিধাদীর্ণ, আর গোয়েন্দা শেষ পৃষ্ঠায় যবনিকা উত্তোলন করবেন রহস্যের, এ কাহিনি এই পরিচিত ছকের অনুসারী নয়। বরং উলটো। শুরুতেই জানা হয়ে যাচ্ছে, কে খুনি। ‘কে করেছিল’ নয়, কেন করেছিল, এবং কীভাবে করেছিল, সেটাই উপজীব্য এ মামলার। যা আজও হিমশীতল নৃশংসতার বিরলতম দিকচিহ্ন হয়ে আছে কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে।

মামলার এফআইআর

মানিকতলা থানা, কেস নম্বর ৩৮২। তারিখ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০০০। ধারা, ৩০২/৩০৭। খুন এবং খুনের চেষ্টা।

প্রণম্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘চিড়িয়াখানা’ উপন্যাসে এক জায়গায় লিখেছিলেন, ‘টেলিফোনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন, টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং শব্দ কখনও কখনও ভয়ংকর ভবিতব্যতার আভাস বহন করিয়া আনে। যেন তারের অপর প্রান্তে যে-ব্যক্তি টেলিফোন ধরিয়াছে, তাহার অব্যক্ত হৃদয়াবেগ বিদ্যুতের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।’

মানিকতলা থানায় যে ফোনটা এসেছিল রাত সোয়া তিনটে নাগাদ, তাতেও যেন আভাস ছিল ভয়ংকর ভবিতব্যের। ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে এক হিন্দিভাষী ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন ডিউটি অফিসারকে, ‘সার, জলদি ফোর্স ভেজিয়ে ইঁয়াহা। 16/J/Q মুরারিপুকুর রোড মে, ইয়াহাঁ পাঁচ লেড়কি অউর এক অউরত কা খুন হো গয়া।’ ভদ্রলোক যেখান থেকে ফোনটা করছেন, সেখানে যে পরিস্থিতি খুব একটা শান্ত নেই, কথোপকথনের মাঝেই ভেসে আসা চিৎকার-চেঁচামেচিতে দিব্যি বুঝতে পেরেছিলেন অফিসার।

থানার লাগোয়া কোয়ার্টারেই থাকেন ওসি। ঘণ্টাদেড়েক হল থানা ছেড়ে বাড়ি গেছেন। ডিউটি অফিসার ঘুম ভাঙালেন ফোনে, জানালেন খবরটা। ‘পাঁচ লড়কি অউর এক অউরত?’ অনেক উড়ো ফোন আসে থানায় রাতের দিকে। কিন্তু ছ’টা খুন? খবরটা ঠিক হোক, ভুল হোক, দেরি করার মানে হয় না। তৈরি হয়ে নিতে

যতটুকু সময়, ওসি-র গাড়ি ছুটল মুরারিপুকুরের দিকে। এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছেই দ্বিজেন বুঝলেন, খবরে ভুল নেই।

তিনতলা বাড়ি। তৃতীয় তলাটা অসম্পূর্ণ। ওই গভীর রাতেও অন্তত শ'তিনেক লোকের জমাট ভিড় বাড়ির গেটের সামনে। পুলিশের গাড়ি দেখেই যে ভিড়টা আরও উত্তেজিত হওয়ার অক্সিজেন পেয়ে গেল নিমেষে। কী হয়েছে, সেটা জানতে গেলে তো ঢুকতে হবে বাড়িতে। সেই ঢোকাটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ভিড়ভাট্টা-হইহল্লার মধ্যে। বিস্তর ঠেলেঠুলে কোনওমতে বাড়িটায় ঢুকতে ঢুকতেই দ্বিজেন মোবাইল ফোনে ধরলেন লালবাজার কন্ট্রোল রুম। 'সিচুয়েশন গ্রেভ অ্যাট মুরারিপুকুর। রিইনফোর্সমেন্ট নিডেড আর্জেন্টলি। প্লিজ় ইনফর্ম সিনিয়র অফিসার্স।'

একতলায় এগারোটা ঘর, দু'পাশে সার দিয়ে। জনাবিশেক লোকের ভিড় উত্তর দিকের শেষ ঘরের সামনে। ঘরের দরজা খোলা। সঙ্গী অফিসারকে নিয়ে দ্বিজেন ঢুকলেন। এবং ঢুকে যা দেখলেন, লিখেছি শুরুতেই। মেঝেতে এক মহিলার দেহ প্রাণহীন, খাটে পঞ্চকন্যার। বিহ্বল ওসি কেঁদে ফেললেন দৃশ্যের অভিঘাতে, 'বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে... এতদিনের চাকরিতে এমন কখনও দেখিনি স্যার...!'

ডিসি ইএসডি (ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশন) এবং ডিসি ডিডি যখন এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন দ্বিজেন। খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন দশ বাই বারোর ঘরটা। সহজেই চোখে পড়েছে জানালার পাশে রাখা একটা কাগজের টুকরো। আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় যা ছিল সেই কাগজে, তুলে দিলাম নীচে।

'হাম বীরেশ পোদ্দার আপনি ইচ্ছা সে পুরে পরিবার কো মার ডালা। ইস মে বাকি লোগো কা কোই কসুর নেহি হ্যায়। কৃপয়া সাজা দে, মারনে কা কারণ দিগ্বিজয় শর্মা কা মেরি পরিবার ইয়ানি মেরি বিবি সে গলত সম্পর্ক।'

> ('আমি বীরেশ পোদ্দার নিজের ইচ্ছেয় আমার পুরো পরিবারকে মেরে ফেলেছি। এতে অন্য কারও কোনও দোষ নেই। আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক। মারার কারণ হল দিগ্বিজয় শর্মার সঙ্গে আমার স্ত্রী-র অবৈধ সম্পর্ক।')

কাগজের নীচে ইংরেজিতে সই, 'Biresh Poddar'। তা এই বীরেশ কই? বউ-বাচ্চাদের মেরে স্বীকারোক্তি লিখে পালিয়েছেন? যাঁরা ভিড় জমিয়েছিলেন ঘরের সামনে, তাঁরা সমস্বরে হইহই করে উঠলেন, 'দিগ্বিজয় কো মারকে ভাগ গয়া!'

সপরিবারে বীরেশ পোদ্দার

ঘটনাপ্রবাহ যা জানা গেল, এরকম। একতলায় এগারোটা ঘরের মধ্যে দশটায় ভাড়া থাকতেন সব মিলিয়ে সাতটি পরিবার। একটা ঘর খালি ছিল। উত্তর দিকের দুটো মুখোমুখি ঘরে ভাড়া থাকতেন বীরেশ পোদ্দার এবং দিগ্বিজয় শর্মা। বছর চল্লিশের বীরেশ আদতে বিহারের বাসিন্দা। বড়ভাই নরেশের সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চলে আসেন বছর পনেরো আগে। দুই ভাই মিলে ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে কাঠের কাজকর্মের কারবার শুরু করেন।

নরেশ সপরিবারে থাকেন উলটোডাঙার কাছে। আর বীরেশ মুরারিপুকুরের এই বাড়ির ভাড়াটিয়া কলকাতায় আসার পর থেকেই। স্ত্রী রীতা এবং পাঁচ কন্যাকে নিয়ে বসবাস। রিমা-প্রীতি-স্মৃতি-ভাবনা-শ্বেতা। রিমা বড়, এগারো বছর। প্রীতি আর স্মৃতি মেজো আর সেজো, যথাক্রমে দশ আর আট বছরের। ভাবনা আর শ্বেতা যমজ, চার পেরিয়ে সবে পাঁচ ছুঁয়েছে।

প্রতিবেশী দিগ্বিজয় শর্মা মধ্যচল্লিশ। বড়বাজারের এক বেসরকারি সংস্থায় ছোটখাটো চাকুরে। বিবাহিত,

একমাত্র ছেলে কৌশলের বয়স আঠারো। কলেজে পড়ে, বাবার সঙ্গেই থাকে। স্ত্রী থাকেন দেশের বাড়িতে, বিহারে।

একতলাতেই অন্য ঘরগুলোয় যাঁরা ভাড়া থাকতেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন, সত্যদেও পাণ্ডে এবং রামচল জয়সওয়াল, জানালেন, রাত আড়াইটে নাগাদ বাইরে থেকে প্রবল চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় ওঁদের। প্যাসেজে সারারাতই আলো জ্বলত এ বাড়িতে। গেট বন্ধ হয়ে যেত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তালার কমন চাবি থাকত সব আবাসিকের কাছেই। কারও রাতে বেরনোর প্রয়োজন হলে তালা খুলে বেরতেন। ফিরে এসে গেট আবার তালাবন্ধ করে দিতেন।

দরজা খুলে বাইরে এসে সত্যদেও আর রামচল দেখেন, দিগ্বিজয় এক হাতে নিজের পেট চেপে ধরেছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট। আর অন্য হাতে কলার চেপে ধরে আছেন বীরেশের। দিগ্বিজয়ের ছেলে কৌশল তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'পিতাজি কো মার ডালা!' দিগ্বিজয়ের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে ঝটিতি মূল গেট দিয়ে বেরিয়ে যান বীরেশ। গেট খোলা ছিল। নিশ্চয়ই বীরেশই খুলে রেখেছিলেন ঘটনা ঘটানোর আগে। যাতে দ্রুত পালাতে সুবিধে হয়।

দিগ্বিজয় কোথায়? সত্যদেও-রামচলের হইহইয়ে অন্য ভাড়াটেরাও বেরিয়ে এসেছিলেন। দু'তলায় থাকতেন বাড়ির মালিক শ্যামল সাহা, নেমে এসেছিলেন। দু'-তিনজন একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে রক্তাক্ত দিগ্বিজয়কে নিয়ে ছুটেছিলেন আর জি কর হাসপাতালে। সেখানেই এখন আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন সে।

বীরেশের ঘরে বাইরে থেকে শিকল তোলা ছিল। শিকল খুলে ভিতরের ওই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে এক প্রতিবেশী ফোন করেছিলেন মানিকতলা থানায়।

অকুস্থল থেকে পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের তালিকায় রইল হিন্দিতে লেখা বীরেশের স্বীকারোক্তি-চিরকুট, ঘরগুলির মধ্যবর্তী প্যাসেজে বইতে থাকা রক্তস্রোতের 'স্যাম্পল', দিগ্বিজয়কে আক্রমণে ব্যবহৃত ছুরি, এবং কিছু রুটিন টুকিটাকি।

দেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো দরকার। কিন্তু পারলে তো? সকাল হয়ে গেছে। লোকের ভিড় বেড়েছে আরও। পাঁচ-সাতশো এলাকাবাসীর বিক্ষুব্ধ জমায়েত বাড়ির সামনে। দাবি, এভাবে ছ'জনকে খুন করে পালিয়ে গেছেন বীরেশ, তাকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত একটাও দেহ বাড়ির বাইরে বেরবে না। আগে গ্রেফতার, তারপর অন্য কিছু।

সিনিয়র অফিসাররা জনতাকে আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ডিসি হেডকোয়ার্টার, যিনি শহরের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকেন, ততক্ষণে চলে এসেছেন লালবাজারে। মুরারিপুকুরে পৌঁছে গিয়েছে RAF। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে দেখে সামান্য বলপ্রয়োগ করতেই হল পুলিশকে। জনতাকে হঠিয়ে দিয়ে বার করা হল দেহগুলি। মৃতা মায়ের সঙ্গে পুলিশ ভ্যানে করে মর্গের উদ্দেশে রওনা দিল পাঁচ বোন। রিমা-প্রীতি-স্মৃতি-ভাবনা-শ্বেতা। ঘুমের মধ্যেই যারা কয়েক ঘণ্টা আগে পাকাপাকিভাবে পাড়ি দিয়েছে ঘুমের দেশে।

সেই স্বীকারোক্তি-চিরকুট

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানাল, যা জানাই ছিল। 'Death was caused due to effects of strangulation, ante-mortem and homicidal in nature.'

ঘটনা এতটাই চাঞ্চল্যকর, প্রাথমিক তদন্ত থানা শুরু করলেও গোয়েন্দাবিভাগের উপর দায়িত্ব পড়াটা অনিবার্যই ছিল। তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হলেন গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য, যিনি বর্তমানে গোয়েন্দাবিভাগেই কর্মরত ইনস্পেকটর হিসাবে।

প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, বীরেশ-রীতার দাম্পত্য সম্পর্ক মসৃণ ছিল না। ঝগড়াঝাঁটি

লেগেই থাকত। রীতার পরিবারের লোকজন থাকতেন কাঁকুড়গাছি এলাকায়। রীতার দাদা চন্দ্রশেখর জানালেন, বীরেশ প্রায়ই মারধর করতেন রীতাকে। সন্দেহ করতেন, দিগ্বিজয়ের সঙ্গে বোধহয় স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সন্দেহই, প্রমাণ ছিল না কিছু। মাঝেমাঝে রীতা রাগারাগি করে বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসতেন দাদার বাড়িতে। কান্নাকাটি করতেন দাদা-বউদির কাছে।

কয়েকদিন পরে বীরেশই এসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন স্ত্রীকে। রীতাও ফিরে আসতেন মুরারিপুকুরে। কী-ই বা উপায় ছিল ফিরে আসা ছাড়া? যখন কিশোরী ছিলেন, বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পড়াশুনোর সুযোগ হয়নি। সম্পূর্ণভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর রীতার দাদা চন্দ্রশেখরও যে আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল ছিলেন, এমনও নয়। পাঁচটা বাচ্চাকে নিয়ে কতদিনই বা থাকা যায় দাদা-বউদির সংসারে?

ফিরে আসতেন, কিছুদিন সব ঠিকঠাক চলত। তারপর ফের সন্দেহ, ফের অশান্তি, ফের মারধর। যথাপূর্বং তথাপরম।

নিশ্চিত জানা হয়ে গিয়েছিল, অপরাধী কে। বাকি ছিল গ্রেফতারি। বীরেশ সহজে ধরা দিলেন না। ভোগালেন সপ্তাহদুয়েক। ঘটনা ২০০০ সালের। মোবাইল ব্যবহার করার মতো ট্যাঁকের জোর ছিল না বীরেশের। তাই প্রযুক্তির সাহায্যে পলাতকের অবস্থান জানার প্রশ্ন ছিল না। বীরেশের ভাই নরেশের কাছে জানতে চাওয়া হল বিহারে যাবতীয় আত্মীয়স্বজনের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি। জেনে নেওয়া হল, কোথায় কোথায় আশ্রয় নিতে পারেন পালিয়ে।

তিনটে টিম করা হল। যাঁরা ১৭ তারিখ দুপুরেই বেরিয়ে পড়লেন বিহারে। সম্ভাব্য সমস্ত আস্তানায় রেইড করা হল দিনের পর দিন। আজ সমস্তিপুর, কাল গয়া, পরশু জামুই, তরশু ঘাটশিলা। আত্মীয়বন্ধুদের বাড়িতে এক-দু'-দিন করে থাকছিলেন বীরেশ। পুলিশ পৌঁছনোর আগেই ডেরা বদলে ফেলছিলেন। প্রায় দশ-বারো দিন ধরে বিহারের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চষে ফেলেও নাগাল পাওয়া গেল না বীরেশের। ফিরে এলেন হতোদ্যম অফিসাররা।

বীরেশের মোবাইল না থাকলেও দাদা নরেশের ছিল। যে ফোনের উপর নজরদারি চালু হয়ে গিয়েছিল ঘটনার পরের দিন বিকেল থেকেই। অফিসাররা যেদিন ফিরে এলেন বিহার থেকে, তার পরের দিনই ফোন-নজরদারিতে ইঙ্গিত মিলল, টাকা ফুরিয়ে গেছে বীরেশের। দু'-এক দিনের মধ্যেই কলকাতায় আসার সম্ভাবনা। দেখা করতে পারেন দাদার সঙ্গে। জাল পাতা হল শহরের স্টেশনে-বাস টার্মিনাসে-ফেরিঘাটে। ৩১ ডিসেম্বর বর্ষশেষের সন্ধেয় বাবুঘাটে গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়লেন স্ত্রী এবং পাঁচ কন্যাকে খুন করে ফেরার হয়ে যাওয়া বীরেশ।

মেমো অফ অ্যারেস্ট

জেরাপর্বে বীরেশ কোনও রাখঢাকের রাস্তায় গেলেন না। কয়েক লাইনে লিখে গিয়েছিলেন যে স্বীকারোক্তি, সেটাই বললেন বিস্তারে। যখনই রীতাকে কোনও কারণে কথা বলতে দেখতেন দিগ্বিজয়ের সঙ্গে, তীব্র অশান্তি হত সংসারে। ছোটখাটো ঘটনা নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর খিটিমিটি লেগেই থাকত। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবধারিত ভাবে বীরেশ টেনে আনতেন দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্ককে। ঘটনার মাসখানেক আগে যেমন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বীরেশ দেখলেন, একটা মাঝারি মাপের সুটকেস এক কোণে রাখা।

—রীতা, এটা কার? কোত্থেকে এল?

—দিগ্বিজয় ভাইয়ার। ওর ঘরে কিছু মেরামতির কাজ চলছে। জায়গার অভাব। তাই বিকেলে ভাইয়া এসে বলল, দু'-তিন দিনের জন্য যদি এটা..

—ভাইয়া! ভাইয়া, না সাঁইয়া? সব জানা আছে আমার, এ সুটকেস এখানে থাকবে না। রাস্তায় রাখুক সুটকেস, আমার বাড়ি ছাড়া আর জায়গা পেল না?

সঙ্গে সঙ্গেই উলটোদিকের ঘরে গিয়ে সুটকেস রেখে এসেছিলেন বীরেশ, তপ্ত বাদানুবাদ হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর।

মনে সন্দেহের বীজ দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই লালন করে এসেছিলেন বীরেশ। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই গর্ভবতী হন রীতা এবং বীরেশের ধারণা হয়, এ সন্তান তাঁর ঔরসজাত নয়। ভুল ভাঙানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন রীতা।

এরপর একে একে আরও চার কন্যাসন্তানের জন্ম। তাদের একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা। যত বছর গড়িয়েছে, সন্দেহের তীব্রতা প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, কোনও কার্যকারণ ছাড়াই বীরেশের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, সন্তানরা তাঁর নয়। রীতার অবৈধ সম্পর্কের ফসল। এই ধারণায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিল গত কয়েক বছরে রীতা-দিগ্বিজয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা। দিগ্বিজয় ডাকতেন 'রীতা ভাবি' বলে। রীতা ডাকতেন 'ভাইয়া'। বীরেশ মনে করতেন, ওসব লোকদেখানো। আসলে অন্য সম্পর্ক আছে।

—আমি বারবার ওকে বারণ করতাম দিগ্বিজয়ের সঙ্গে কথা বলতে। রীতা শুনত না। তর্ক করত। বলত, 'বিনা কারণে কথা বন্ধ করব কেন?' শুনে খুন চেপে যেত মাথায়।

প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মেয়েদের কাউকে না কাউকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন বীরেশ, 'আজ দিগ্গিচাচা ঘরে এসেছিল? মা ওঘরে গিয়েছিল? গল্প করতে দেখেছিস?'

সন্দেহ ক্রমে জিঘাংসায় পরিণত হওয়া যদি খুনের প্রথম কারণ হয়, দ্বিতীয় ছিল উপর্যুপরি পাঁচ কন্যাসন্তানের জন্ম। দুর্ভাগা দেশ আমাদের, ছেলে কেন হচ্ছে না, সন্তান প্রসবের পর প্রতিবারই এ নিয়ে বীরেশ কাঠগড়ায় তুলতেন রীতাকে। চতুর্থবার যখন যমজ কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হল, বীরেশের ধৈর্য বিদ্রোহ করল।

—স্যার, ঘুম আসত না রাতের পর রাত। সামান্য ব্যবসা করি, কীভাবে বিয়ে দেব

পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের? আর রাগ হত রীতার উপর। পাঁচটাই মেয়ে, একটা ছেলে হতে পারত না?

পালটা কী-ই বা বলা যেত প্রস্তরযুগীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন এই অল্পশিক্ষিত যুবককে? পৃথ্বীরাজ পরের প্রশ্নে গিয়েছিলেন।

—স্ত্রীকে মারলেন কেন, বুঝলাম। কিন্তু নিজের বাচ্চা মেয়েগুলোকে ওভাবে ...

কথা শেষ করতে দেন না বীরেশ।

—আমি আর পারছিলাম না বউ আর পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বোঝা টানতে। আর, নিজের বাচ্চা কে বলল স্যার? নিজের কিনা সেটা নিয়েই ধন্দে থাকতাম সবসময়।

পৃথ্বীরাজ বোঝেন, এই লোকের সঙ্গে তর্ক বৃথা। কথায় কথাই বাড়বে শুধু। তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা যাক সে-রাতের ঘটনাক্রম।

—আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম স্যার, বউ-বাচ্চাদের তো মারবই, দিগ্বিজয়কেও বাঁচতে দেব না। কাঠের কাজ করি। নানা ধরনের ছুরি ব্যবহার করতে হয়। একটা ধারালো ছুরি বাড়িতে এনেছিলাম সেদিন। আর কিনে এনেছিলাম একপাতা ঘুমের বড়ি।

—কী বড়ি?

—ভ্যালিয়াম-৫ স্যার। ঘুমের ওষুধ তো প্রেসক্রিপশন ছাড়া ডাক্তাররা দিতে চাইবে না, জানতাম। এক বন্ধুর কাকা ডাক্তার ছিলেন। উলটোডাঙার কাছে চেম্বার। বন্ধুকে ধরলাম। ওর সঙ্গে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। বললাম, গত দু'সপ্তাহ ধরে রাতে ঘুম হচ্ছে না। অস্থির লাগছে সারাদিন। একটা উপায় করুন রাতে ঘুমোনোর। ডাক্তারবাবু প্রেশার দেখলেন। ঘুমের ওষুধ দিতে চাইছিলেন না। আমি খুব কাকুতিমিনতি করায় রাজি হলেন। ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরলাম।

—তারপর?

—আমরা সকলেই রাতে দুধ খেয়ে শুতাম। রীতা যখন বাচ্চাদের জন্য বিছানা করছে, আমি ওর গ্লাসে

দুটো ঘুমের বড়ি ফেলে দিলাম। বাচ্চাদের হাতে এক একটা করে বড়ি দিয়ে বললাম, এগুলো ভিটামিন ট্যাবলেট। ওরা চুপচাপ খেয়ে নিল। আমরা সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়লাম। আমি আর রীতা মেঝেতে শুতাম। মেয়েরা খাটে। আমি জেগে থাকলাম, কখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তার অপেক্ষায়।

—বলতে থাকুন।

বীরেশ বলতে থাকলেন নির্বিকার। বর্ণনা থাকুক তাঁরই বয়ানে, একটানা।

—ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পরেই। আমি উঠলাম। সব ঠিক করে রেখেছিলাম আগে থেকেই। প্রথমে রীতাকে মারলাম। উলের চাদর ছিল একটা ওর। আলনায় রাখা ছিল। সেটা দিয়ে ফাঁস দিলাম গলায়। নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস পড়ছে না।

খাটে উঠলাম এবার। আমাদের খাটটা ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে লাগানো ছিল। একদম বাঁদিকে রিমা শুত। বড়মেয়ে। ওকে মারলাম ওরই ওড়নার ফাঁস দিয়ে।

তারপর প্রীতি, মেজো। কয়েকদিন হল একটু ঠান্ডা লেগেছিল ওর। গলায় মাফলার ছিল। ওটাই চেপে ধরলাম গলায়।

প্রীতির পাশে ছিল স্মৃতি। পাশ ফিরে শুয়েছিল। ঘুমে কাদা, সোজা করে দিলাম। আলনায় রাখা মাফলার দিয়ে গলাটা চেপে ধরলাম।

দেওয়ালের দিকে পাশাপাশি শুত শ্বেতা আর ভাবনা। যমজ ওরা। বড়মেয়ে রিমার ওড়নাগুলোর কয়েকটা রাখা থাকত আলনায়, কয়েকটা ঝুলত দরজার হুকে। দুটো ওড়না নিলাম। তাই দিয়ে প্রথমে শ্বেতা। তারপর ভাবনা। তারপর ছুরিটা নিয়ে দিগ্বিজয়ের ঘরে নক করলাম।...

এবার বীরেশকে থামিয়ে দেন পৃথ্বীরাজ। স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার এই নিস্পৃহ ধারাবিবরণী একটানা শোনা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। কেস ডায়েরি লেখার প্রয়োজনে প্রায়ই দেখতে হয় বাচ্চাগুলোর মৃতদেহের ছবি। যতবার দেখেন, কান্না জমে গলার কাছে। আর এ বাবা হয়ে কী অনায়াসে বলে যাচ্ছে!

কেসের কিনারা হয়ে গেছে। অপরাধী ধরা পড়ে গেছে। তবু যে প্রশ্নের উত্তর না পেলেই নয়, সেটা করেই ফেলেন পৃথ্বীরাজ। পারা যাচ্ছিল না আর।

—সন্দেহ করতেন স্ত্রীকে, বুঝলাম। কিন্তু বাচ্চাগুলো তো কোনও দোষ করেনি। ওদের এভাবে মেরে ফেললেন ঘুমের মধ্যে? একটুও কষ্ট হল না? আর মারলেনই যদি, স্বীকারোক্তি লিখে গেলেন কেন? আজ নয় কাল, আমরা তো ধরতামই আপনাকে।

আবেগের ন্যূনতম বহিঃপ্রকাশ ছিল না বীরেশের উত্তরে।

—স্বীকারোক্তিটা ঝোঁকের মাথায় লিখেছি। ওটা উচিত হয়নি। আর মেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেই বা কী লাভ হত স্যার? আমি তো ভেবেছিলাম, বিহারে পাকাপাকিভাবে পালিয়ে যাব। ব্যবসা করব কিছু। কী লাভ হত ওদের বাঁচিয়ে রেখে? কে দেখত ওদের? দাদার নিজের সংসার ছিল, সম্ভব হত না পাঁচটা মেয়ের ভার নেওয়া। বেঁচে থাকলে ওদের অসুবিধেই হত। উপায় ছিল না এ ছাড়া। তা ছাড়া ওই যে বললাম, আমারই যে মেয়ে সেটাই তো...

আর সহ্য করতে পারেন না পৃথ্বীরাজ, ফের থামিয়ে দেন বীরেশকে। বোঝেন, এই লোক বাহ্যত সুস্থ, আসলে গভীর মনোবিকারগ্রস্ত। পরকীয়াজনিত সন্দেহে স্বামী খুন করেছে স্ত্রীকে, এমন ঘটনা অনেকই ঘটে। কিন্তু স্ত্রী এবং পাঁচটা নিষ্পাপ মেয়েকে এভাবে প্ল্যান করে মারার পরও কীভাবে কেউ সেই নিধনবৃত্তান্ত শোনাতে পারে নির্বিকার? কথাবার্তায় না আছে লেশমাত্র অনুতাপ, না আছে শোকের সামান্যতম চিহ্ন।

চার্জশিট পেশ করলেন পৃথ্বীরাজ। দিগ্বিজয়কে ছুরি মারার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন দু'জন। দিগ্বিজয় স্বয়ং, আর তাঁর ছেলে কৌশল। দিগ্বিজয় ভয়ংকর জখম হয়েও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন দ্রুত চিকিৎসা শুরু হওয়ায়। বীরেশের পালানোর সাক্ষী ছিলেন দুই প্রতিবেশী, সত্যদেও আর রামচল। বীরেশের হাতের লেখার নমুনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল স্বীকারোক্তির চিরকুটের হস্তাক্ষর। প্যাসেজে পড়ে থাকা রক্তমাখা ছুরিতে পাওয়া

গিয়েছিল বীরেশের আঙুলের ছাপ। বাড়ির পিছনের উঠোন থেকে উদ্ধার হয়েছিল ভ্যালিয়াম ৫-এর খালি স্ট্রিপ। যে ওষুধের দোকান থেকে বীরেশ কিনেছিলেন ওষুধ, সেই 'Popular Drug House'-এর দোকানদার চিহ্নিত করেছিলেন অভিযুক্তকে।

জাল কেটে বেরনোর রাস্তা ছিল না। বীরেশ তবু আদালতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন পুলিশকে দেওয়া বয়ান। জোরগলায় দাবি করেছিলেন আগাগোড়া, 'আমি নির্দোষ।' সমস্ত প্রমাণ বিপক্ষে, তবু একচুলও নড়েননি সে দাবি থেকে।

বিচারসিদ্ধান্তের আনুগত্য থাকে শুধু প্রমাণের প্রতি। অভিযুক্তের সারবত্তাহীন দাবির প্রতি নয়। ধোপে টেকেনি বীরেশের দাবি, দায়রা আদালত দীর্ঘ বিচারপর্বের পর ২০০৬ সালে বীরেশকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। যাবজ্জীবন কারাবাস, না ফাঁসি, জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল সেসময়।

বিচারক সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন বীরেশকে, 'যা অপরাধ করেছেন, কী সাজা হওয়া উচিত বলে মনে হয় আপনার?' বীরেশ বলেছিলেন 'আমার বয়স এখন ৪৬। আমার কোনওরকম অপরাধের কোনও অতীত রেকর্ড নেই। আপনি যদি মনে করেন ফাঁসি দেবেন, দিন। আমি বারবার বলে এসেছি, আমি নির্দোষ। এখনও তাই বলছি।'

ফাঁসি হয়নি। সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের। হাইকোর্টে সাজা রদের আবেদন করেছিলেন বীরেশ। লাভ হয়নি। শাস্তি বহাল থেকেছিল।

বিচারসিদ্ধান্তের অংশবিশেষ

অপরাধ-মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিশ্বজুড়ে কত যে গবেষণা হয়ে এসেছে কয়েক শতক ধরে, কত যে নতুন চিন্তাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে অপরাধবিজ্ঞানকে, হিসেব রাখা কঠিন। আমার-আপনার থেকে কোথায় কতটা আলাদা ভয়ংকর অপরাধীদের মস্তিষ্কের গঠন, ব্রেনের আকৃতির তারতম্য কীভাবে আলাদা করে দেয় সামান্য ছিঁচকে চোরের সঙ্গে সিরিয়াল কিলারের মনোজগতের, সে নিয়ে বিদগ্ধ অধ্যয়ন জারি রয়েছে দেশে-বিদেশে।

তবে কিনা, বিষয়টা তো দিনের শেষে মন। কে আর কবে মনের পাসওয়ার্ড সম্পূর্ণ ভেদ করতে পেরেছে গবেষণায়-আলোচনায়-পরীক্ষানিরীক্ষায়? আর এ তো বিরল অপরাধীর মন, যেখানে সন্দেহের বীজ সযত্ন পরিচর্যায় ক্রমশ আক্রোশের মহীরুহে পরিণত হয়। এবং ঘটে যায় এমন অপরাধ, যা লজ্জায় ফেলবে সুদূরতম কল্পনাকেও। কী উপাদানে তৈরি হয় বীরেশ পোদ্দারদের মনোজগৎ? যা প্ররোচিত করে ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনায় অচিন্তনীয় অপরাধে, বাধ্য করে অপরাধের স্বীকারোক্তি-লিখনে, এবং আইনের কাছে পরাভূত হওয়ার প্রাক্কালে সেই স্বীকারোক্তিকেই নির্দ্বিধায় খণ্ডনে?

এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে বারবার, হয়তো পড়তে পড়তে আপনাদেরও, কিছু অপরাধ তোয়াক্কা করে না ব্যাখ্যার। কিছু অপরাধী হেলায় অগ্রাহ্য করে বিশ্লেষণকে, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে।

সে আপনি যতই গভীরে যান। এই বুঝি তল পাবেন, ফের হারাবেন।

ফেলুদাং শরণং গচ্ছামি

— মা-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না... তুমি শিগগির বাড়ি এসো...

অনিল গোয়েঙ্কার মোবাইলটা যখন বেজে উঠল, সকাল তখন কত? এই পৌনে আটটা। ব্যাট-প্যাড পরে মাঠে নামতে যখন রোদের দেরি থাকে কিছু। আবার ভোরের আধো-অন্ধকারও যখন প্যাভিলিয়নের পথে। মাঝামাঝি একটা সময়। ভোর আর সকালের প্রাত্যহিক চুক্তিতে যখন সব 'শান্তিকল্যাণ' হয়ে আছে।

মঙ্গল-বৃহস্পতি-রবি, সপ্তাহে তিনদিন টালিগঞ্জ ক্লাবে ভোরবেলা গল্‌ফ খেলতে আসা অনিলের বহুদিনের অভ্যেস। আজ, বিষ্যুদবারে, যেমন এসেছেন। দু'রাউন্ড খেলার পর সবে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন যখন, গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন ফ্রেশ ফ্রুট জুসে, স্ত্রী জয়শ্রীর ফোন। মা-কে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! অনিলের উত্তরে ঠিকরে বেরয় অস্থিরতা-উদ্বেগ-আশঙ্কা।

—কী বলছ কী? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে? বাথরুমে দেখেছ?

—দেখেছি। নেই। বিছানায় রক্তের দাগ আছে। সব ওলটপালট। মেঝেতেও রক্ত আছে... আমার হাত-পা কাঁপছে... এসো শিগগির...

গল্‌ফ মাথায় উঠল। দ্রুত গাড়িতে উঠে বসলেন অনিল। ড্রাইভারের প্রতি সামান্য উত্তেজিত নির্দেশ এল।

—ঘর চলো... জলদি!

'ঘর', অর্থাৎ 'শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস'। ১১, অশোকা রোড, আলিপুর।

অনিল যখন পড়িমরি করে বাড়ি পৌঁছে পা রাখলেন বাড়ির দরজায়, ভিড় জমে গেছে প্রতিবেশীদের। থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছোটভাই সুনীল। দাদাকে দেখেই বললেন, 'ভাইয়া... কুছ গড়বড় হ্যায়... পুলিশ কো বুলানা চাহিয়ে।'

'গড়বড়' যে আছেই, সেটা বুঝতে অবশ্য তেমন বুদ্ধি খরচের দরকার পড়ে না। ফ্ল্যাটে এক চক্কর দিলেই মালুম হয় অনায়াসে।

আসলে দুটো ফ্ল্যাট একসঙ্গে। এগারো তলায়, 10D আর 10E। আয়তনের বিচারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে মাঝারি সাইজ়ের ফুটবল মাঠের সঙ্গে। সব মিলিয়ে আটটা ঘর। প্রতিটাই পেল্লায় সাইজ়ের। অপর্যাপ্ত বৈভবের চিহ্ন ছড়িয়ে ফ্ল্যাটের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। বিরাট হলঘরে সেগুনকাঠের রকমারি আসবাবপত্র। দুর্মূল্য তৈলচিত্র। বাহারি সোফাসেট। সিলিং থেকে ঝুলতে থাকা কারুকাজের ঝাড়লন্ঠন। প্রশস্ত ড্রয়িংরুম পেরিয়ে আরও প্রশস্ত বারান্দা। যার পাশে বিস্তৃত খোলা জায়গা একটা, 'ওপেন টেরেস'। যেখানে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে চাইলে আকাশকে খুব দূরের মনে হয় না।

আটটার মধ্যে সাতটা ঘর যেমন থাকার তেমন। একটা শোওয়ার ঘরের চেহারা শুধু বিধ্বস্ত। বিছানা ওলটপালট। দুটো বালিশ ঝুলছে খাটের এক কোণে। বেডসাইড টেবিল থেকে একটা জলের গ্লাস উলটে পড়েছে মেঝেতে। প্রায় দু'ফুট লম্বা একটা জিআই পাইপ পড়ে আছে খাটের নীচে। বিছানার উপর অন্তত চারটে জায়গায় লাল ছোপছোপ। রক্ত, বোঝা যায় সাদা চোখেই।

যিনি এই বিছানায় শুতেন, শুয়েছিলেন গত রাতেও, সেই ললিতাদেবী গোয়েঙ্কা কোথায়? সত্তর বছরের বৃদ্ধা কোথাও নেই। অন্য ঘরগুলোয় নেই। রান্নাঘরে নেই। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে নেই। হলঘরের এক কোনায় আর একটা বাথরুম। যেটা কখনও ব্যবহার হয় না। খুলে দেখা হল। নেই।

ছাদে-বারান্দায়-টেরেসে-ঠাকুরঘরে? নেই। একটা জায়গাই দেখার পড়ে আছে। স্টোররুম। তালা ঝুলছে দরজায়। যেমন ঝোলে রোজ। শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে চাবি থাকে। 'থাকে' নয়, থাকত। দ্রুত আবিষ্কৃত হল, স্টোররুমের চাবি ড্রয়ারে নেই।

অনিল গোয়েঙ্কার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায় এবার। চাবিটা কোথায় গেল স্টোররুমের? মা কোথায়? তা হলে কি...? মোবাইলে আলিপুর থানার নম্বর যখন ডায়াল করছেন, হাত কাঁপতে শুরু করেছে।

—একবার আপনাদের আসতে হবে বড়বাবু। মা-কে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। স্টোররুমের চাবি মিসিং। বেডরুমটা ডিস্টার্বড। ব্লাড স্টেইনস আছে বেডে। একবার যদি আসেন এখনই... প্লিজ়...

পুলিশ পৌঁছল, স্টোররুমের তালা ভাঙা হল এবং ভিতরের দৃশ্য দেখে মুহূর্তে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন ললিতা গোয়েঙ্কার পুত্রবধূ জয়শ্রী। অনিল দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। মুখে হাত ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সুনীল।

মেঝে রক্তে থইথই। বৃদ্ধা পড়ে আছেন নিষ্প্রাণ। মুখে কাপড় গোঁজা। কপালে গভীর ক্ষতচিহ্ন। গলার নলিটা কাটা। যা দিয়ে কাটা হয়েছে সম্ভবত, সেই ছুরিটা পড়ে আছে পেটের উপর। যে ফুল-ফুল খয়েরি-সাদা ম্যাক্সিটা মহিলার শরীরে, সেটার রং প্রায় পুরো বদলে গিয়ে লালে লাল। রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। দুটো সাদা বেডশিট পড়ে আছে দুমড়ানো-মুচড়ানো। রক্তের দাগ যাতে যত্রতত্র।

স্টোররুমে দুটো বড় আলমারি। দুটোই লন্ডভন্ড। হাতড়ানো হয়েছে বেপরোয়া। কী থাকত আলমারিগুলোয়? অনিল জানালেন, মায়ের জমানো টাকাপয়সা থাকত ছোট ছোট কাপড়ের পুঁটলিতে। যার একটাও আলমারিতে নেই এখন। মৃতদেহের পাশে একটা একশো টাকার নোটের বান্ডিল পড়ে আছে হেলাফেলায়। যে বা যারা খুনটা করল, পালানোর সময় তাড়াহুড়োয় নিতে ভুলে গেছে?

স্টোররুমের ভিতরে এভাবেই পড়েছিলেন ললিতা গোয়েঙ্কা

প্রায় সাত হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটের প্রতিটি ইঞ্চি-সেন্টিমিটারের তন্নতন্ন তল্লাশিতে ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল আলিপুর থানার পুলিশের। যাদের সঙ্গে যোগ দিলেন গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার অফিসাররা। দ্রুত চলে এলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। খোঁজাখুঁজিতে উল্লেখ করার মতো জিনিস বলতে পাওয়া গেল দুটো কালো রংয়ের প্লাস্টিকের বোতাম। পড়ে ছিল খাটের নীচে এক কোনায়। খুনি বা খুনিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছিল মহিলার? সাধ্যমতো প্রতিরোধ করেছিলেন, এবং আততায়ী বা আততায়ীদের কারও শার্ট থেকে বোতাম দুটো ছিঁড়ে গিয়েছিল টানাটানিতে?

জিআই পাইপটা খাটের নীচে এল কোথা থেকে? বারান্দার একধারে চারটে পাইপ পড়েছিল বেশ কিছুদিন যাবৎ। তারই একটা নিয়ে জোরালো আঘাত করা হয়েছিল মৃতার কপালে।

'Seizure list'-এর তালিকায় ওই লোহার পাইপের সঙ্গে যোগ হল রক্তের দাগ লাগা বালিশ, স্টোররুমে পড়ে থাকা রক্তমাখা এক জোড়া বেডশিট, মৃতার পেটের উপর পড়ে থাকা ছুরি, একশো টাকার নোটের বান্ডিল। আলমারিতে আঙুলের ছাপ? বা খাট-বিছানায়? পাওয়া গেল আবছা, 'ডেভেলপ' করার যোগ্য নয়।

অভিজাত আবাসনে সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারে সত্তর বছরের বৃদ্ধার নৃশংস খুন। গলাকাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার ফ্ল্যাটের স্টোররুম থেকে। মিডিয়ায় হইচই হবে, স্বাভাবিকই ছিল। যেমন স্বাভাবিক ছিল দেহ উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তদন্তভার নেওয়া হোমিসাইড বিভাগের। সাব-ইনস্পেকটর আশিক আমেদ (বর্তমানে মেটিয়াবুরুজ থানার ওসি) দায়িত্ব পেলেন রহস্যভেদের।

ললিতাদেবী গোয়েঙ্কা হত্যারহস্য। আলিপুর থানা, কেস নম্বর ১১৭, তারিখ ১২/৮/২০০৪। খুন, লুঠ এবং প্রমাণ লোপাট। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৯৪/২০১ ধারায়।

শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস। ছিমছাম কোলাহলহীন রাস্তার উপর ভিতরে-বাইরে গাছগাছালির সবুজ আবাসন।

দুটো আলাদা ব্লক। 'এ' আর 'বি'। দুটোই এগারো তলা। ব্লক এ-র দশ আর এগারো তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। বাকি প্রতিটা ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট। একতলায় পার্কিং স্পেস রয়েছে পর্যাপ্ত, যেমন থাকে এ ধরনের আবাসনে।

অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে পার্কিং স্পেসের অংশ

নিরাপত্তায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছিলেন আবাসিকরা। প্রায় পনেরো ফুটের কাছাকাছি উচ্চতার পাঁচিল। যার উপর তার দেওয়া, 'barbed wire fencing'।

ঢোকার-বেরনোর একটাই গেট। যেটা পেরিয়ে ঢুকলেই পশ্চিম দিকে 'security box'। বেসরকারি সংস্থা 'Royal Securities Pvt Ltd.'-র কর্মীরা থাকেন নিরাপত্তার দায়িত্বে। ব্লক এ-র একতলায় আবাসনের অফিস, 'শ্রীনিকেত হাউসিং এস্টেট সোসাইটি'।

সিকিউরিটি বক্সে ইন্টারকম আছে। বাইরে থেকে কেউ এসে কোনও ফ্ল্যাটে যেতে চাইলে নিরাপত্তাকর্মী ফোন করে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের জানিয়ে দেয়, তমুক এসেছেন। সবুজ সংকেত পেলে তবেই প্রবেশাধিকার মেলে বহিরাগত অতিথির। ভিজিটর্স রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা লিখে সই করার পর। রোজকার আংশিক সময়ের গৃহকর্মীদের, যাদের মুখ চেনা, ঢোকার ব্যাপারে বাধা নেই।

শ্রীনিকেতন অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার গেট

যাঁরা বিভিন্ন ফ্ল্যাটে স্থায়ী কাজের লোক, তাঁরা যখন ছুটিতে যান, 'গেট পাস' নিয়ে বেরতে হয়। বেরনোর সময় সঙ্গে যা যা থাকে ব্যাগ বা সুটকেসে, দেখাতে হয় নিরাপত্তাকর্মীদের। তারপর ছাড়পত্র মেলে বাইরে যাওয়ার। কে কখন বেরল আর ফিরল কবে কখন, সব নোট করা থাকে রেজিস্টারে।

প্রতি ব্লকে দুটো করে লিফট। দু'জন করে লিফটম্যান ব্লকপিছু। যাঁরা দুটো শিফটে কাজ করেন। সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটো। দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা। চারজন স্থায়ী সাফাইকর্মী রয়েছেন। রয়েছেন একজন ইলেকট্রিশিয়ান এবং একজন প্লাম্বার। হাউসিং-এর অফিসে আছেন একজন কেয়ারটেকার আর তাঁর একজন সহযোগী।

নিরাপত্তারক্ষীরা শিফটে কাজ করেন রাতদিন সাতদিন। দু'জন করে থাকেন সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা। পরের শিফট রাত থেকে সকাল, বারো ঘণ্টা টানা। দিনের শিফটে একজন সুপারভাইজ়ারও থাকেন।

এই আবাসন তৈরি করেছিলেন ভগবতীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। ব্লক এ-তে দশ আর এগারো তলাটা নিজের পরিবারের জন্য রেখে বাকি ফ্ল্যাটগুলো বেচে দিয়েছিলেন। এগারো তলায় থাকতেন সস্ত্রীক। দশতলার দুটো ফ্ল্যাট লিখে দিয়েছিলেন দুই ছেলের নামে। বড় অনিল, ছোট সুনীল। আগেই লিখেছি, ব্লক দুটোর বাকি ফ্লোরগুলোর প্রতিটায় ছিল চারটে করে ফ্ল্যাট। গোয়েঙ্কাদের বাদ দিলে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা আশি।

পি. ও। প্লেস অফ অকারেন্স। ঘটনা যেখানে ঘটেছে। যে-কোনও তদন্তে ঘটনাস্থল তদন্তকারীর কাছে মন্দির-মসজিদ-চার্চের মতো। তীর্থস্থানস্বরূপ। সাধকের ধৈর্য নিয়ে দেখতে হয়। পূর্ণাঙ্গ খানাতল্লাশির পর ফ্ল্যাটটা ভাল করে ঘুরে দেখছিলেন আশিক।

এগারো তলার যে ফ্ল্যাটে ললিতাদেবী থাকতেন, বলেছি আগে, তার নম্বর 10D & 10E। পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটের পুরোটা নিয়েই বসবাস করতেন মহিলা। দুটো ফ্ল্যাট মিলিয়ে আটটা বড় ঘর, দুটো বড় হল, ডাইনিং রুম, একটা রান্নাঘর। প্রশস্ত বারান্দা যেখানে শুরু হচ্ছে, তার পাশেই বড় স্টোররুম। যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল বৃদ্ধার দেহ।

দশতলায় দুটো ফ্ল্যাট। 9E এবং 9F। অনিল থাকেন 9E-তে। সুনীল 9F-এ।

অনিলের ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে এগারো তলায় মায়ের ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার একটা সিঁড়ি আছে। অনিল

সপরিবারে উপরে মায়ের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতেন। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম এগারো তলাতেই থাকত।

ছাদে 'সার্ভেন্টস কোয়ার্টার'। যে ছাদের মালিকানা সম্পূর্ণত ছিল গোয়েঙ্কাদের। বাড়ির কাজের লোকদের জন্য ছাদ থেকে নেমে এগারো তলার রান্নাঘরে ঢোকার একটা দরজা ছিল। সেই দরজা খোলা থাকত দিনভর। রান্নাঘরের ওই দরজা দিয়েই ফ্ল্যাটে ঢুকত স্থায়ী কাজের লোকেরা। রাতের খাওয়ার পাট সাধারণত সাড়ে ন'টার মধ্যে চুকে যেত গোয়েঙ্কা পরিবারের। তারপর জয়শ্রী রান্নাঘরের দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দিতেন।

ললিতার নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন? ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উঠে ঠাকুরঘরে চলে যেতেন। তার আগে দরজা খুলে দিতেন রান্নাঘরের। গৃহকর্মীরা নির্দিষ্ট সময়মতো এসে দশ এবং এগারো তলার কাজ শুরু করত। দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি ছিল কাজের লোকদের বিশ্রামের সময়।

ললিতার দেহ উদ্ধার হল ১২ অগস্ট সকালে। তার আগের রাতে মহিলা কিছু খাননি। একাদশী ছিল। রাত ন'টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উপরের ফ্ল্যাটে রোজকার মতো সকাল সাড়ে সাতটা-পৌনে আটটা নাগাদ উঠে এসেছিলেন জয়শ্রী। জলখাবারের তদারকি করতে। এসে দেখেছিলেন, শাশুড়ি ফ্ল্যাটে নেই। ওলটপালট বিছানায় রক্তের দাগ। তারপর আতঙ্কিত ফোন অনিলকে, 'মা-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শিগগির বাড়ি এসো।'

ময়নাতদন্ত হতে হতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। প্রত্যাশিত রিপোর্ট, গলায় ছুরির আঘাত এবং মাথায় গভীর ক্ষত থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ মৃত্যু ঘটিয়েছে, ante-mortem and homicidal। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মৃতদেহ দেখে যা অনুমান করেছিলেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সহমত হল তাতে। খুনটা ঘটেছে রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। ললিতা ভারী চেহারার ছিলেন, খুনি একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

'একাধিক' যে হতেই পারে, বোঝাই যাচ্ছিল। দেহ বেডশিটে মুড়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্টোররুমে। একের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কঠিন। 'এক' না 'একাধিক', ভাবার আগে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন। রাত দশটা অবধি আবাসনে কাটালেন আশিক। যা যা জানলেন, যা যা শুনলেন, যা যা বুঝলেন জিজ্ঞাসাবাদে এবং কানাঘুষোয়, বাড়ি ফেরার পথে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন মাথায়।

খুনটা এই খাটে হয়েছিল

ললিতাদেবীর দুই ছেলের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃসুলভ ছিল না। না থাকার কারণ? ভগবতীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা বড়ছেলেকে বেশি দায়িত্ববান মনে করতেন বলেই সম্ভবত যাবতীয় সম্পত্তি 'প্রোবেট' করে গিয়েছিলেন অনিলের নামে। অগাধ সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছিলেন অনিল। ছোটছেলে সুনীলকে ব্যবসার যৎসামান্য অংশীদারিত্ব নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছিল।

অর্থের সড়কপথেই অনর্থের প্রবেশ ঘটে থাকে সচরাচর। অনর্থ বলতে যা বোঝায়, এক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি অবশ্য। তবে ভায়ে-ভায়ের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল, সেটা অজানা ছিল না কারও। পরলোকগত স্বামীর সিদ্ধান্তে ললিতার নীরব সমর্থন ছিল। বড়ছেলের সংসারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অনিলের দুই স্কুলপড়ুয়া পুত্র-কন্যা ঠাকুমার অনিঃশেষ স্নেহের ভাগিদার হয়েছিল। উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়া দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। সুনীল থাকতেন নিজের মতো, সপরিবার।

দশ এবং এগারো তলা মিলিয়ে সবসময়ের কাজের লোক আটজন। শিবু মাহাতো। রান্না করেন। এ বাড়িতে আছেন তা সাত-আট বছর হল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়।

আশিস-অমলেশ। দুই ভাই। মূলত বাড়ির রোজকার বাজারহাটের দায়িত্বে। ওঁরাও বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন গোয়েঙ্কা পরিবারে। হুগলিতে বাড়ি।

ত্রিলোকি সিং। বাড়ির সবচেয়ে পুরনো গৃহকর্মী। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। আদতে উত্তরপ্রদেশের

বাসিন্দা। নির্দিষ্ট কোনও দায়িত্ব নেই সেভাবে। বাকি গৃহকর্মীদের কাজের তদারকিই মূল কাজ। ব্যাংকের কাজ, চেক জমা দেওয়া, টাকা তুলে আনা, ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া, এসবে ত্রিলোকির উপরই ভরসা করেন অনিল।

খগেন এবং রাজেশ। ললিতাদেবীর দেখাশুনোর দায়িত্ব ছিল এঁদের উপর। খগেনের বয়স বছর তিরিশ, বাড়ি ক্যানিং লাইনে। রাজেশের বয়স বাইশ-তেইশ। বাড়ি ওড়িশায়। দু'জনে প্রায় একসঙ্গেই কাজে ঢুকেছিলেন। বছর চারেক আগে।

সীতা এবং লক্ষ্মী। দুই মহিলা গৃহকর্মী। কাজের মধ্যে, ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা ইত্যাদি। সীতার বয়স কুড়ির কোঠায়, বাড়ি হাওড়ায়। অবিবাহিতা। লক্ষ্মী মাঝবয়সি, বিবাহিতা। লক্ষ্মীকান্তপুরের বাসিন্দা। সীতা-লক্ষ্মী রাত্রে শুতেন দশতলায়, অনিলের ফ্ল্যাটের বারান্দার লাগোয়া একটা ঘরে।

ঘটনার রাতে, ১১/১২ অগস্ট, আটজন কাজের লোকের মধ্যে ছ'জন উপস্থিত ছিলেন। অমলেশের স্ত্রী-র একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। দেড় মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। জুলাই মাসের ৮ তারিখ থেকে। ফের কাজে যোগ দেওয়ার কথা অগস্টের একুশ-বাইশ নাগাদ।

রাজেশের বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল সপ্তাহখানেক আগে। বাবা অসুস্থ। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল ৮ অগস্ট। চলে আসার কথা পনেরো-ষোলো তারিখের মধ্যে।

অনিল-জয়শ্রী এবং কাজের লোকদের সঙ্গে দফায় দফায় প্রশ্নোত্তরে জানা গেল, ললিতাদেবীর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ছিলেন তিনজন। কে কে?

লক্ষ্মী, দীর্ঘদিন আছেন বাড়িতে। যাঁকে খুবই ভালবাসতেন ললিতা। প্রতি পুজোয় হাজার খানেক টাকা বরাদ্দ রাখতেন। এটা-ওটা কিনে দিতেন প্রায়ই।

ত্রিলোকি, যাকে অনেক ছোট বয়স থেকে দেখেছিলেন ললিতা। পরিবারের সদস্যের মতোই স্নেহ করতেন। খোঁজখবর রাখতেন ত্রিলোকির বাড়ির লোকজনের। যে-কোনও আর্থিক সমস্যায় সাহায্য করতেন দরাজহস্ত।

রাজেশ, যাকে প্রায় পুত্রবৎ ভালবাসতেন বৃদ্ধা। মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন ললিতা। তখন খাইয়ে দিত এই রাজেশই। বছরখানেক আগে উজ্জয়িনীতে তীর্থে গিয়েছিলেন ললিতা, সঙ্গে গিয়েছিল রাজেশই। অনিল জানালেন, 'কাজের লোকদের মধ্যে শুধু ত্রিলোকি, লক্ষ্মী আর রাজেশের সঙ্গেই মা খোলামনে কথাবার্তা বলতেন।'

লক্ষ্মী এবং ত্রিলোকির সঙ্গে আলাদা করে অনেকক্ষণ কথা বললেন আশিক। আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া গেল না। রইল বাকি রাজেশ। ফোন করে খবর পাঠানো হল ওড়িশার বাড়িতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ফিরে আসতে বলা হল। ফিরে আসতে বলা হল অমলেশকেও, আরেকজন গৃহকর্মী, যিনি ছুটিতে ছিলেন।

'সূত্র' পাওয়ার লক্ষ্যে আবাসনের অন্যান্য স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মীদেরও বিশদে জেরা করলেন আশিক। কাউকে বাদ দিলেন না। চার লিফটম্যান, লক্ষ্মণ-হিমাংশু-ইন্দ্রপাল-কৃষ্ণ। চার সুইপার, নিমাই-হিরামন-রামপ্রসাদ-লাল্টু। কেয়ারটেকার অচ্ছেবর সিং এবং তাঁর সহযোগী পল্টু ব্যানার্জি। জেরার ফল? বলার মতো কিছু? ভাবার মতো কিছু? না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করা হল গেটের নিরাপত্তারক্ষীদের। আদ্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা হল ভিজিটর্স রেজিস্টার, পুরনো গেটপাস। রাত্রে তো নয়ই, কোনও বহিরাগত অতিথি ১১ অগস্টের পুরো দিনটাতেই ব্লক এ-র দশ তলা বা এগারো তলায় আসেননি। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলোর গৃহকর্মীদের আসা-যাওয়ার খতিয়ানেও কোনও অসংগতি নেই গেটপাসে, নেই সন্দেহ উদ্রেক করার মতো কিছু। রাতের শিফটের দুই নিরাপত্তাকর্মী সুনির্মল আর দীপক জোর গলায় দাবি করলেন, কেউ ঢোকেনি রাত্রে। প্রশ্নই নেই।

প্রশ্ন আছে কি নেই, ভাবতেই হত না সিসি টিভি থাকলে। এত সম্পন্ন একটা আবাসনে সিসি টিভি নেই,

আশ্চর্য লাগে আশিকের। 'শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস' থেকে ১২ অগস্টের রাত্রে বেরনোর সময় ক্লান্ত আশিক ভাবতে থাকেন, কী কী কাজ বাকি আছে আর।

এক, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ। আজ সময়ই পাওয়া গেল না সেভাবে। গোয়েঙ্কা পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, বিশেষ করে অনিল-সুনীলের পারস্পরিক সমীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার।

দুই, প্রতিটি গৃহকর্মীর 'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক' প্রয়োজন। প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর করা জরুরি। আবাসনের অন্য কর্মীদের ব্যাপারেও আরও খোঁজ নেওয়ার আছে।

তিন, যে দু'জন ছুটিতে ছিল, তারা কাল বা পরশু বিকেলের মধ্যে এসে পড়বে। বাড়তি তথ্য পাওয়া যেতেই পারে কিছু। যদি পাওয়া যায়, দেখতে হবে।

চার, ওই ফ্ল্যাটেরই শুধু নয়, আবাসনের কর্মীদের যাঁদের যাঁদের মোবাইল ফোন আছে তাঁদের কল রেকর্ডস আনাতে হবে। অন্তত গত সাতদিনের। এবং খুঁটিয়ে দেখতে হবে, দিশা পাওয়া যায় কিনা। আশিটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের ঠিকুজিকুষ্ঠি জানতে হবে। সবার মোবাইল নম্বর জোগাড় করে পাঠাতে হবে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে। CDR (Call Details Records) নিতে হবে।

পাঁচ, কাল সকালেই একবার বসতে হবে ওসি হোমিসাইডের সঙ্গে। আলোচনা প্রয়োজন। ডিসি ডিডি তো নিজেই স্পটে এসেছিলেন, ছিলেন অনেকক্ষণ। ফোন করেছেন সন্ধে থেকে অন্তত তিনবার। সিপি-ও খোঁজ নিয়েছেন ওসি হোমিসাইডের কাছে। সবে তো প্রথম দিন। যত দিন যাবে, দ্রুত 'ডিটেকশন' করার চাপ উত্তরোত্তর বাড়বে, বুঝতে অসুবিধে হয় না আশিকের।

—অনেকগুলো খটকা স্যার... মেলানো মুশকিল...

আশিককে একটু চিন্তিত লাগে ওসি হোমিসাইডের।

—হুঁ... শুনছি, তার আগে বলো মোটিভটা কী মনে হচ্ছে?

—অ্যাপারেন্টলি তো মার্ডার ফর গেইন। স্টোররুমের আলমারি থেকে টাকাপয়সা নিয়ে গেছে।

—কত গেছে?

—এগজ্যাক্ট অ্যামাউন্টটা বলা মুশকিল। অনিল প্রতি মাসে মা-কে কুড়ি হাজার হাতখরচা দিতেন। মহিলার মাসিক খরচ খুব বেশি ছিল না। নাতি-নাতনিকে এটা-ওটা কিনে দেওয়া, ঠাকুরঘরের টুকিটাকি জিনিস কেনা, বাড়ির কাজের লোকের মধ্যে ত্রিলোকি-রাজেশ-লক্ষ্মীর খুচরো সাধ-আহ্লাদ মেটানো। বাকিটা ছোট ছোট কাপড়ের পুঁটলিতে জমাতেন। অনিল বলছিলেন, লাখখানেক লাখ দেড়েকের মতো তো গেছেই।

—মিসলিড করার পসিবিলিটিটা মাথায় রেখেছ তো? কারণ হয়তো অন্য কিছু, তদন্তটা গুলিয়ে দেওয়ার জন্য লুঠপাট...

—হ্যাঁ, স্যার, সেটা তো মাথায় আছে... অন্য অঙ্ক থাকতেই পারে... আজ সকালেই এক পরিচিত অ্যাডভোকেটের ফোন এসেছিল... কাগজে খুনের খবরটা পড়ে কল করেছিলেন...

—কী বললেন?

—বললেন, পারিবারিক সম্পত্তির সিংহভাগ যে বড়ছেলের নামে 'প্রোবেট' করে গিয়েছেন ভগবতীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, সেটা নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ আছে ছোটছেলে সুনীলের...

—স্বাভাবিক...

—হ্যাঁ... সম্পত্তির ভাগ চেয়ে নাকি মামলা করার কথা ভাবছিলেন...

—বুঝলাম, কিন্তু ললিতাদেবীর মৃত্যুতে কি মামলায় কোনও সুবিধে হত সুনীলের?

—এমনিতে হওয়ার কথা নয়, তবু একটু কথা বলা দরকার ওই অ্যাডভোকেটের সঙ্গে... উনি আজ কলকাতার বাইরে আছেন... কাল সন্ধেবেলা যাব...

—হ্যাঁ... আর ওই খটকার কথা কী বলছিলে...

—রান্নাঘরের দরজাটা স্যার...

—মানে?

—বলছি স্যার। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, খুনটা হয়েছে রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।

—তো?

—রোজ ভোর পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় উঠে ললিতা রান্নাঘরের দরজা খুলে ঠাকুরঘরে যেতেন। মানে, ১২ অগস্টের ভোরে রান্নাঘরের দরজা খোলার স্কোপই ছিল না। তার আগেই মৃত্যু।

—হুঁ...

—অথচ জয়শ্রী সকালে সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ উপরে গিয়ে দেখেছিলেন, রান্নাঘরের দরজা খোলা। ভিতর থেকে কেউ খুলে দিয়েছিল, এবং সেটা রাত তিনটের আগে। কে খুলল? কারা খুলল? যে বা যারা খুলল, তারা ভিতরে ঢুকল কী করে?

—বলে যাও...

—এটা পরিষ্কার, খুনি বা খুনিরা ওই রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল। এ ছাড়া রাস্তা নেই ঘরে ঢোকার।

—যদি না মূল দরজায় কেউ বেল বাজায়, এবং মধ্যরাতে উঠে ললিতাদেবী দরজা খুলে দিয়ে থাকেন...

—সে সম্ভাবনা প্রায় শূন্য স্যার। ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রোজকার মতো রাত সাড়ে ন'টায়। উপোস ছিল, খাননি। অনিল বলছেন, অচেনা লোক হলে রাতে দরজা খুলতেনই না। আর রাতে কেউ আসতও না।

—অচেনা লোক হলে খুলতেন না, কিন্তু যদি চেনা লোক হয়?

—চেনা লোক বলতে তো অনিলের পরিবার আর সুনীলের পরিবার...

—অনিলের পরিবারের কেউ হলে তা বাইরে থেকে ঢোকার দরকার পড়বে না, দশ থেকে এগারো তলায় ওঠার সিঁড়ি তো আছে ভিতর থেকেই।

—এগজ্যাক্টলি মাই পয়েন্ট স্যার .. তা হলে পড়ে থাকছেন সুনীল...

—দেখতে গেলে তা-ই, কিন্তু কেন মারবেন মা-কে?

—মেরেছেন তো বলছি না... নিজের মা-কে ওইভাবে ছুরি দিয়ে... টাকাপয়সা নিয়ে... হাইলি আনলাইকলি...

—কিন্তু ধরো যদি উনি বেল বাজালেন, ললিতা ছোটছেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুললেন, আর সুনীলের লাগানো ভাড়াটে গুন্ডারা, যারা অপেক্ষায় ছিল বাইরে, কাজটা করল...

—তাতেও ওই মোটিভের ব্যাপারটা অস্পষ্টই থাকছে।

—হুঁ!

—বাড়ির কাজের লোকদের কারও বা কয়েকজন মিলে খুনটা করার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। সবাই নিম্নবিত্ত পরিবারের। মোটিভ? টাকা।

—আরও ডিটেলে খোঁজ নাও সবার ব্যাপারে।

—নেব স্যার, প্রত্যেকের বাড়ির আর্থিক অবস্থা, শখ-আহ্লাদ-নেশা, সব আজ-কালের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করছি। লোক লাগানো হয়ে গেছে।

—বেশ...

—স্যার, ওসব ইনফর্মেশন না হয় জোগাড় হয়েই যাবে, কিন্তু রান্নাঘরের দরজার খোলা থাকাটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। কে খুলল, কীভাবে খুলল, কখন খুলল? কে ঢুকল, কীভাবে ঢুকল, কখন ঢুকল? কার বা কাদের সাহায্যে ঢুকল? আর খুনটা করার পর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরল কীভাবে...

—গেটে রাতের সিকিউরিটি গার্ডরা তো বলছে, কাউকে বেরতে দেখেনি...

—হ্যাঁ .. বেরতে গেলেও গেট পাস লাগত... খুনটা করার পর পালাতে তো হবে, পালাল কীভাবে...

—সার্ভেন্টস কোয়ার্টার সার্চ করেও তো কিছু পাওয়া যায়নি বলছ?

—না স্যার। মিলছে না, কিছুতেই মিলছে না ফ্ল্যাটে খুনি বা খুনিদের ঢোকা-বেরনোর অঙ্কটা... মিলছে না... কিছু একটা মিস করছি নির্ঘাত।

আশিকের চিন্তিত চেহারাটা দেখে একটু খারাপই লাগে ওসি হোমিসাইডের। এই ঠান্ডা মাথার স্থিতধী অফিসারটিকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পিঠে আশ্বাসের হাত রাখেন।

—মিলবে, ঠিক মিলবে। সবে তো একটা দিন হয়েছে। আকাশ থেকে উড়ে এসে তো কেউ রান্নাঘরের দরজা খোলেনি। আততায়ী বা আততায়ীরাই খুলেছে। এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে খুলেছে? আর কীভাবে ঢুকেছে?

—স্যার...

—একটা কথা বলি শোনো তোমায়। আমরা যখন ব্যারাকপুরের পুলিশ ট্রেনিং কলেজে প্রবেশনার ছিলাম, একজন আইপিএস অফিসার গেস্ট লেকচারার হিসেবে ইনভেস্টিগেশনের উপর একটা ক্লাস নিয়েছিলেন। শার্লক হোমসের রেফারেন্স দিয়েছিলেন একটা। নোট করে নিয়েছিলাম। মনে গেঁথে আছে এখনও।

—কী স্যার?...

—আর্থার কোনান ডয়েলের একটা উপন্যাস আছে, পড়েছ কিনা জানি না, 'The Sign of the Four'। যেখানে হোমস এক জায়গায় বলছেন, 'When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.'

—স্যার....

—যা যা অসম্ভব, যা যা হতেই পারে না, সেগুলো একটা একটা করে বাদ দাও। যা পড়ে থাকবে, সেটা যতই কল্পনাতীত মনে হোক, সত্যি হতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও যা যা অসম্ভব, বাদ দাও একটা একটা করে। এই এলিমিনেশনটা করতে সময় লাগবে, কিন্তু ধৈর্য হারিয়ো না। একটা সময় দেখবে, যেটা ভাবোইনি কখনও, সেটাই আসলে ঘটেছে। সেটাই সত্যি!

আশিক শোনেন চুপচাপ। মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসেন। ফের গন্তব্য আলিপুর। যেতে যেতে ভাবেন, আবাসনের পুরো কম্পাউন্ডটা আঁতিপাঁতি করে তল্লাশি করা হয়েছিল ঘটনার দিন। কিছুই পাওয়া যায়নি। গল্পের গোয়েন্দা হলে নির্ঘাত খুঁজে পেতেন আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, কাদায় পায়ের ছাপ কিংবা নিদেনপক্ষে কোনও হুমকি-চিরকুট! কল্পনার শার্লক হোমসের তত্ত্বকথা শুনতে ভাল। বাস্তব অনেক রুক্ষ জমির।

জিজ্ঞাসাবাদ আজও সারাদিন ধরে চালিয়ে যাওয়াই যায়। চালাতে হবেও। কিন্তু 'লিড' তো দরকার একটা এগোনোর। কাউকে চেপে ধরতে গেলে, সে বাড়ির লোকই হোক বা কাজের লোক, একটা সূত্র তো দরকার। সেটা কোথায়?

সূত্র অমিলই থাকল। তথ্যসংগ্রহের কাজ যা যা বাকি ছিল, করলেন আশিক। আবাসনের বাসিন্দাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেন দীর্ঘক্ষণ। অজানা কোনও তথ্য আর উঠে এল কই?

১৩ তারিখ রাত্রে আবাসন থেকে বেরনোর সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনাকয়েক সাংবাদিক ছুটে এসে 'বুম' ধরলেন আশিকের মুখের সামনে। পাশ কাটিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় আশিক শুনতে পেলেন, 'আপনারা দেখলেন দিনভর তদন্তের পর ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা বেরিয়ে এলেন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুলিশ। খুনের পর প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হতে চলল, অথচ ...'

পরের দিন, ১৪ অগস্টের দুপুরে যখন শ্রীনিকেত-এ পৌঁছলেন আশিক, ততক্ষণে আটচল্লিশ ঘণ্টা সত্যিই পেরিয়ে গিয়েছে ললিতা-হত্যার পর। ছুটিতে থাকা দুই কাজের লোক ফিরে এসেছেন। অমলেশ দুপুরে। রাজেশ বিকেলের দিকে। যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কিছু পাওয়া গেল না। অন্যরা যা বলেছিলেন, ওঁরাও

তাই বললেন... ললিতার ব্যবহার মাঝেমাঝে রুক্ষ হলেও আদতে সহৃদয় প্রকৃতির মহিলা ছিলেন।

অমলেশের গলা বুজে এল ললিতার কথা বলতে গিয়ে।

—আমার স্ত্রী-র অপারেশনের জন্য ছুটিতে গিয়েছিলাম। হাজার তিরিশেক টাকার মতো খরচ হত। দিদা বলে ডাকতাম ওঁকে। ধার চেয়েছিলাম কিছু। পাঁচ হাজার এক কথায় দিয়ে দিয়েছিলেন।

—কোথায় অপারেশন হল স্ত্রী-র? কী অসুখ?

—মধ্যমগ্রামের নার্সিংহোমে স্যার। গলব্লাডারে স্টোন। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। এখন ঠিক আছে।

রাজেশও কেঁদে ফেললেন 'মা-জি'-র কথা বলতে গিয়ে।

—মা-জি আমাকে ছেলের মতো ভালবাসত। বকাঝকা করলে পরে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিত। কলকাতার বাইরে তীর্থে গেলে আমি সঙ্গে যেতাম। আমাকে ছাড়া যেতই না। হিন্দি সিনেমা দেখতে আমি খুব ভালবাসি। নতুন ছবি রিলিজ় হলে নিজে টাকা দিত টিকিটের। বসুশ্রীতে অজয় দেবগনের 'Yuva' দেখার টাকা দিয়েছিল এই তো গত মাসে।

দ্বিতীয় দফার জেরায় ত্রিলোকি তথ্য দিলেন আর একটা। গৃহকর্মী সীতার সঙ্গে নাকি লিফটম্যান লক্ষ্মণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ইদানীং। প্রায়ই লক্ষ্মণ এই ফ্ল্যাটে আসত। যেটা ললিতা বিন্দুমাত্র পছন্দ করতেন না। সীতাকে নাকি সপ্তাহখানেক আগে এ নিয়ে বকাঝকাও করেছিলেন। লক্ষ্মণকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন চেঁচিয়ে। এই ব্যাপারটার আরও গভীরে যাবেন, ঠিক করলেন আশিক। প্রেমে বাধা বড় বিপজ্জনক জিনিস। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় অনেক সময়। তেমন কিছু ঘটেছিল?

সন্ধে হয়ে গেল প্রশ্নোত্তর-পর্ব মিটতে মিটতে। আলিপুর কোর্টের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে ওঁর ভবানীপুরের বাড়িতে দেখা করতে আশিক বেরলেন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। তার আগে সুনীল গোয়েঙ্কাকে এক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেছে। সুনীলের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে কণামাত্র অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি আশিক। মায়ের এহেন মৃত্যুতে পুত্রের যেমন শোকগ্রস্ত হওয়ার কথা, তেমনই। আশিকও তোলেননি 'প্রোবেট'-এর কথা। আগে দেখা যাক ওই উকিলের সঙ্গে কথা বলে, সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারটা কতটা এগিয়েছে, আদৌ এগিয়েছে কি না।

হাজরা মোড়ের সিগন্যালে গাড়ি থামল। দু' মিনিট গেল, চার মিনিট গেল, থেমেই আছে। কী ব্যাপার? গাড়ি থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে এল ড্রাইভার।

একটা বড় মিছিল যাচ্ছে স্যার। ট্র্যাফিক সার্জেন্ট বললেন, গাড়ি ছাড়তে কম করে হলেও আরও মিনিট দশ।

অপেক্ষা ছাড়া কী আর করার? আশিক আনমনা তাকিয়ে থাকেন গাড়ির বাইরে। বসুশ্রীর ইভনিং শো শুরু হওয়ার মুখে। লোক ঢুকছে। সিনেমার পোস্টারের দিকে তাকান আশিক। 'Yuva'.. starring Ajay Devgan, Abhishek Bachchan..।

এই ছবিটার কথাই বলছিল রাজেশ ছেলেটা। অজয় দেবগনের ফ্যান, কোনও ছবিই নাকি মিস করে না। নিজের ওই বয়সটার কথা মনে পড়ে আশিকের। অমিতাভ বচ্চনের একটা ছবিও মিস করতেন না তখন। এখনও করেন না। বিগ বি-র কত ছবি যে এই বসুশ্রীতেই দেখেছেন। তবে এই হলে দেখা যে ছবিটা মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছিল, তার প্রতিটা দৃশ্য এখনও মুখস্থ বলতে পারবেন। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'।

মিছিল হাজরা মোড় পেরিয়ে গেছে। সিগন্যাল গাঢ় সবুজ। গাড়িঘোড়া চলতে শুরু করেছে ফের। যখন গাড়ি যদুবাবুর বাজার পেরোচ্ছে, হঠাৎই আশিক তরঙ্গস্রোত টের পান মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলোয়। যাকে Hercule Poirot বলতেন, 'the little grey cells'।

—এই, গাড়ি ঘোরাও!

ড্রাইভার অবাক দৃষ্টিতে তাকান পিছন ফিরে। অধৈর্য আশিক ফের নির্দেশ দেন।

—বলছি তো গাড়ি ঘোরাও!

গাড়ি ফের দক্ষিণমুখী। থেমেছে গিয়ে সেই হাজরা মোড়েই। আশিক সোজা গিয়ে ঢুকেছেন বসুশ্রীতে, ম্যানেজারের ঘরে। পুলিশ দেখে ম্যানেজার সামান্য হতচকিত। উঠে পড়েছেন চেয়ার ছেড়ে।

—কী ব্যাপার স্যার?

—তেমন কিছু না, একটা ব্যাপার জানার ছিল।

—বলুন না স্যার... আপনার জন্য চা-কফি কিছু...

—না না, দরকার নেই... সামান্য ব্যাপার... আচ্ছা, এই 'Yuva' বলে সিনেমাটা কতদিন ধরে চলছে এখানে?

—এই তো গত সপ্তাহ থেকে স্যার, মানে গত শুক্রবার ৬ তারিখ থেকে। রিলিজ় হয়েছে মাসদুয়েক আগে। অন্য একটা ছবি ভাল চলছিল। 'Yuva' লেগেছে গত সপ্তাহ থেকে।

আশিকের হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায় হঠাৎ। তা হলে কি যা ভাবছেন, তা-ই? আজ শনিবার, ১৪ তারিখ। ছবি রিলিজ় করেছে ৬ তারিখ। মানে বসুশ্রীতে ছবিটা দেখতে গেলে ৬ থেকে ১৩-র মধ্যে দেখতে হবে রাজেশকে। রাজেশ ছুটিতে ওড়িশা গিয়েছিল ৮ তারিখ। ফিরেছে আজ বিকেলে। তা হলে ছবিটা দেখল কবে? যদি ছয় বা সাত তারিখে দেখে না থাকে, তা হলে ৮ থেকে ১৩-র মধ্যে দেখেছে। কিন্তু বলল তো গত মাসে বসুশ্রীতে দেখেছে! কী করে সম্ভব? ছুটিতে ওড়িশায় যাওয়ার গল্পটা তা হলে ডাহা মিথ্যে? ওই সময়টার মধ্যে কোনও একদিন অন্তত কলকাতায় ছিল? বাবার অসুখের নাম করে ছুটি নিয়ে কেন ছিল শহরে? মিথ্যে বলল কেন? যার একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না।

যতটা না সমাপতন, তার থেকে ঢের বেশি কাজ করেছিল তদন্তকারীর সহজাত অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে বসুশ্রীতে দেখা 'জয় বাবা ফেলুনাথ' স্মৃতিতে ফিরে এসেছিল আশিকের, প্রিয় সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল হঠাৎ, মনে পড়েছিল সংলাপটা। এবং মনে পড়তেই যদুবাবুর বাজারের কাছে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিলেন আশিক, ড্রাইভারকে বলেছিলেন গাড়ি ঘোরাতে।

ছবিটা যখন দেখেছিলেন, তখন বোধহয় ক্লাস নাইন বা টেন। শেষ দৃশ্যে মছলিবাবার বেশধারী ফেলুদা নয়, মগনলালের ডেরায় লালমোহনবাবুর দিকে তাক করে সেই 'knife throwing'-এর দমবন্ধ করা সিনটাও নয়, কিশোর আশিকের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ছবির অন্য একটা জায়গা। যেখানে ঘোষালবাড়ির কর্মী বিকাশের মিথ্যে ধরে ফেলেছিল ফেলুদা। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় ছিলেন, জানতে চাওয়ায় বিকাশ বলেছিলেন, গান শুনছিলেন রেডিয়োতে। আখতারি।

ফেলুদার সন্দেহ হওয়াতে যাচাই করেছিল আকাশবাণীর প্রোগ্রাম তালিকা থেকে। ওইসময় আখতারি হচ্ছিলই না। আশিকের দারুণ লেগেছিল মিষ্টির দোকানে ফেলুদার চেপে ধরা বিকাশকে, কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে নিয়ে যাওয়া যন্তরমন্তরের ছাদে, সেই সংলাপ সহ, 'যার একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না।'

রাজেশেরও একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকেও আর বিশ্বাস করা চলে না। উকিলের বাড়ি আর যাওয়া হল না আশিকের। গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা 'শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস'। রাজেশ ছিল ছাদের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। আশিক এগারো তলায় নামিয়ে আনলেন। কোন ভণিতা না করে চোখে চোখ রাখলেন রাজেশের।

—Yuva সিনেমাটা কেমন লেগেছিল?

হঠাৎ এ প্রশ্নে কিছুটা থতমত খেয়ে যায় রাজেশ।

—মানে?

—বলছি, কেমন লেগেছিল?

—ভাল স্যার...

—কবে দেখলি?

—এই তো গত মাসে স্যার। আপনাকে বললাম তো বিকেলে, বসুশ্রীতে।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল না আশিকের। কলার চেপে ধরে হিড়হিড় করে ফ্ল্যাটের বাইরে লিফটে। নীচে নেমে গাড়িতে তুলে সোজা লালবাজার। গাড়িতে একটা শব্দও ব্যয় করলেন না আশিক। বেশ বুঝতে পারছিলেন, ঘামতে শুরু করেছে পাশে বসা রাজেশ। মুখচোখ থেকে ব্লটিং পেপার দিয়ে যেন রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ।

কতশত ধুরন্ধর অপরাধীর লালবাজারের ইন্টারোগেশন রুমে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে দেখেছেন আশিক, ইয়ত্তা নেই। তুলনায় এ ছোকরা তো নেহাতই চুনোপুঁটি! হাতি-ঘোড়া যেখানে তলিয়ে যায়, মশা সেখানে কী করে জল মাপবে? খুচরো চড়-থাপ্পড় খরচ হল একটা-দুটো, এবং বলতে শুরু করল রাজেশ। গোয়েন্দারা শুনতে থাকলেন ললিতাদেবীর হত্যার রুদ্ধশ্বাস নেপথ্যকথা।

—আমার বাবার কোনও অসুখ-টসুখ হয়নি স্যার। গ্রামের বাড়ির এক বন্ধুকে বলেছিলাম, যে বাড়িতে কাজ করি, সেখানে ছুটি কিছুতেই দিতে চায় না। তুই ফোন করে বলবি, বাবার অসুখ। তা হলে এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি আসতে পারব।

—তারপর?

—স্যার, বাড়িতে আমি যাইনি। নরেন্দ্রপুরে আমাদের এক দূরসম্পর্কের মাসি থাকেন। বউবাজারে একটা বাড়িতে কাজ করেন। ওঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম আট তারিখ। আমাকে ঘরের চাবি দিয়ে মাসি সকালে বেরিয়ে যেত কাজে। আমি বেরলে চাবিটা জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে কাছের একটা টেবিলের উপর রেখে দিতাম। আমার ফেরার আগে মাসি চলে এলে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা নিয়ে দরজা খুলত।

—বেশ ..

—পরের দিন, ভবানীপুরের একটা দোকান থেকে একটা ভিআইপি সুটকেস কিনলাম। তার পরের দিন Yuva দেখলাম বসুশ্রীতে। এগারো তারিখ ভোরে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম।

—এগারো তারিখ ভোরে?

—হ্যাঁ স্যার, এগারো তারিখ।

—কীভাবে ঢুকলি?

—স্যার, গেট দিয়ে ঢুকতে পারব না জানতাম। নাইটগার্ড দু'জনের একজন জেগে থাকত, একজন ঘুমোত পালা করে। গেটে তালা দিয়ে রাখত রাত বারোটার পর। ঢোকার রাস্তা ছিল না।

—তা হলে?

—বাড়িটার চারদিকে বেশ কিছু উঁচু গাছ আছে, নিশ্চয়ই দেখেছেন স্যার। পশ্চিম দিকে বেশি। আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, গাছে উঠে ওখান দিয়ে পাঁচিল টপকাব। টপকে বাড়ির ভিতর যাওয়ার সময় পাঁচিলের তারে লেগেছিল পায়ে।

—দেখা ...কোথায় লেগেছিল?

ট্রাউজার হাঁটু অবধি তুলে ক্ষতচিহ্ন দেখায় রাজেশ। ফের বলতে শুরু করে।

—ওই সময়টায় লিফটম্যান থাকে না, কেয়ারটেকারের অফিসের সামনে খাটিয়ায় অচ্ছেবর ভাইয়া ঘুমিয়ে থাকে। কেউ কোত্থাও থাকে না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ছাদে। অন্য কাজের লোকেরা তখন সবাই ঘুমোচ্ছে।

—তারপর?

—ছাদে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এগারো তলার রান্নাঘরের সামনে নেমে এলাম। জানতাম, মা-জি ভোরে উঠবে। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দরজা খুলে দিয়ে পুজোয় বসবে। সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ঠাকুরঘরে পুজো করবে। বারান্দা থেকে কালীঘাট মন্দিরের চুড়ো দেখা যেত। পুজো শেষ হলে দশ মিনিট বারান্দায় দাঁড়িয়ে

ওদিকে তাকিয়ে প্রণাম করত মা-জি। দরজা খুলে গেল সাড়ে পাঁচটায়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

—হুঁ...

—বসার ঘরে এসে হলঘরের কোনায় যে বাথরুমটা সবসময় বন্ধ থাকত, সেটার ছিটকিনি খুলে ঢুকে পড়লাম। ভিতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

—বাথরুমে?

—লুকোনোর ওটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা ছিল স্যার। ওই বাথরুমটা বহু বছর ব্যবহার হয় না। ওর মধ্যে কেউ থাকতে পারে, কেউ ভাবতেও পারবে না, জানতাম।

—তারপর?

—ভেবেই রেখেছিলাম, খুনটা রাতে করে পরদিন ভোরে বেরিয়ে যাব। সারাদিন ওই বাথরুমেই থাকলাম।

আশিক এবং সঙ্গীরা স্তব্ধ হয়ে যান। বলে কী! এভাবেও প্ল্যান করা যায়!

—সঙ্গে একটা চটের ব্যাগ ছিল। মাসির বাড়ি থেকে একটা বড় কাঠ কাটার ছুরি এনেছিলাম। দু'প্যাকেট বিস্কুট আর কয়েকটা টিফিন কেকও এনেছিলাম। সারাদিনে ওগুলো খেলাম। বাথরুমেই ঘুমোলাম। একটুও সাড়াশব্দ করিনি সারাদিন। অপেক্ষা করে থাকলাম রাতের জন্য।

—বলতে থাক...

—রাত যখন তিনটে, বাথরুম থেকে বেরলাম। মা-জি নিজের শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছে। বারান্দায় লোহার পাইপ রাখা ছিল কয়েকটা। একটা নিলাম। আগে মা-জি র মুখ চেপে ধরলাম। জেগে গেল। আমার জামাটা চেপে ধরল। টানাহ্যাঁচড়া হল। পাইপ দিয়ে মা-জির মাথায় মারলাম জোরে। রক্ত বেরচ্ছিল খুব। বেডশিট দিয়ে মুড়লাম মা-জিকে। টেনে টেনে নিয়ে গেলাম। ড্রয়ারে স্টোররুমের চাবি থাকত। সেটা দিয়ে স্টোররুম খুলে ঢোকালাম বডিটাকে।

—হুঁ...

—মা-জির তখনও নিশ্বাস পড়ছিল। ভয় পেয়ে গেলাম, তা হলে কি মরেনি? ছুরিটা চালালাম গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরতে লাগল। একটু পরে নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

—এরপর আলমারি খুললি, টাকাপয়সা নিলি, ব্যাগে ভরলি...

—হ্যাঁ স্যার, বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর দিয়ে। ছাদে উঠে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। যেভাবে ঢুকেছিলাম, সেভাবেই বেরলাম। পাঁচিল টপকে। চটের ব্যাগটা আগে ছুড়ে বাইরে ফেললাম। তারপর দেওয়াল টপকে বেরিয়ে এলাম। তখন ভোর পাঁচটা সোয়া পাঁচটা হবে।

—তারপর?

—নরেন্দ্রপুরে মাসির বাড়িতে এলাম। মাসি তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। ভিআইপি-তে টাকাপয়সা ভরে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলাম ওড়িশার। পরদিন খুব ভোরে পৌঁছলাম। বাড়িতে সুটকেসটা রেখে এসেছি। বাড়িতে বললাম, একদিনের জন্য এসেছি। ত্রিলোকিদা বিকেলে ফোন করল। বলল, পুলিশ চলে আসতে বলছে। মা-জি খুন হয়ে গেছেন। আমি গতকাল বিকেলের ট্রেন ধরে আজ কলকাতা চলে এলাম।

—স্টোররুমের চাবিটা?

—কয়েকটা বাড়ি পরে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। চলুন স্যার, দেখিয়ে দিচ্ছি।

—সে তো যাবই, কিন্তু তোকে তোর মা-জি এত ভালবাসতেন, মারলি কেন?

—টাকার লোভে স্যার। বারোশো টাকা মাইনে পেতাম স্যার। ওতে কিছু হয়? সিনেমায় দেখতাম বড়লোকরা কীভাবে জীবন কাটায়। কত মস্তি। ভাবতাম, সারাটা জীবন কি এই চাকরগিরি করেই কেটে

যাবে? কিছুদিন পরে সব ঠান্ডা হয়ে গেলে চাকরিটা ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, টাকাটা দিয়ে ব্যবসা শুরু করব কিছু।

রাতেই আশিকের নেতৃত্বে রাজেশকে নিয়ে টিম রওনা দিল ওড়িশায়। গ্রামের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সেই ভিআইপি সুটকেস। যার মধ্যে ভরতি টাকার বান্ডিল। সব মিলিয়ে এক লক্ষ আটান্ন হাজার। পাওয়া গেল রক্তমাখা শার্ট, যার দুটো বোতাম নেই। কলকাতায় ফিরে রাজেশের বয়ান অনুযায়ী অশোকা রোডের ফুটপাথ সংলগ্ন একটা ঝোপ থেকে পাওয়া গেল স্টোররুমের সেই চাবি। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, রাজেশের ওড়িশার বাড়ি থেকে পাওয়া শার্টের বোতাম আর ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া দুটো বোতাম একই পোশাকের। কী বাকি থাকে আর পারিপার্শ্বিক প্রমাণের? কী বাকি থাকে আর অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার?

শাস্তি হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসের। আশিকের তদন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছিল আদালতের।

বিচারসিদ্ধান্তের অংশ

মার্ডার ফর গেইন। টাকার জন্য খুন। লাভের জন্য খুন। লাভ কি হয় আদৌ? হয় 'গেইন' আদৌ?

আইন তো যথাসময়ে এসে কড়া নাড়েই দরজায়।

পুনশ্চ: অনিল এবং সুনীল, এই নামদুটি পরিবর্তিত।

বিপুলা এ পৃথিবীর যতটুকু জানি

—বাবা!

নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা আর্তচিৎকার। তারপর হাঁটু মুড়ে মাটিতেই বসে পড়ে অঝোর কান্না। পোড়খাওয়া পুলিশ অফিসাররাও থামাতে পারছিলেন না তিরিশ বছরের যুবককে। যাঁর বাবার দেহ ততক্ষণে বাইরে আনা হয়েছে মাটি খুঁড়ে। যুবক কেঁদে চলেছেন জন্মদাতার দেহ আঁকড়ে ধরে।

'দেহ' মানে যতটুক অবশিষ্ট রয়েছে আর। পচন ধরেছে। কাদামাটির প্রলেপ সর্বাঙ্গে। বালতি বালতি জল দিয়ে ধুয়েমুছে কিছুটা পরিষ্কার হল অবয়ব। দেখে যতটা আন্দাজ করা যায়, মৃতের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে। মাথার বাঁ দিকে দুটো গভীর ক্ষত। মুখ বাঁধা একটুকরো কাপড় দিয়ে। গলায় ফাঁসের দাগ স্পষ্ট। ডান হাতে উল্কিতে আঁকা ত্রিশূল। বাঁ হাতের উল্কিতে লেখা, 'বিনোদ'।

কালীঘাট থানার বড়বাবু মোবাইল বার করেন পকেট থেকে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে এখনই জানানো দরকার। ফোনে ধরেন ওসি হোমিসাইডকে।

—স্যার, বডি রিকভার্ড হয়েছে একটা। সেমি-ডিকম্পোজ়ড। ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। মাটির নীচে পোঁতা ছিল। গলায় 'লিগেচার মার্ক' আছে। হেড ইনজুরি ভিজিবল। মার্ডার।

ফোন রেখে দুটো কাজ করেন ওসি হোমিসাইড। এক, ডিডি-র ফটোগ্রাফি সেকশনে নির্দেশ, ফটোগ্রাফার যাতে যত দ্রুত পৌঁছে যায় স্পটে। দুই, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে ফোন করে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে অনুরোধ, 'স্যার, একটা টিম যদি তাড়াতাড়ি পাঠানো যায়, দেখুন প্লিজ়।'

পরের কাজ বলতে গোয়েন্দাপ্রধানকে খবরটা জানানো এবং দু'-তিনজন সহকর্মীকে নিয়ে তড়িঘড়ি গাড়িতে উঠে বসা। ড্রাইভার গৌতম গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে হাতঘড়ির দিকে তাকান। বিকেল চারটে। মানে,আজ বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়তো মাঝরাত হয়ে যাবে।

বহু বছর হয়ে গেল হোমিসাইড বিভাগের গাড়ি চালাচ্ছেন। ওসি যখন এত হন্তদন্ত হয়ে গাড়িতে উঠে বসছেন, নির্ঘাত খুন হয়েছে কোথাও। এবার ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তদন্ত চলবে। লালবাজারের কর্তারা আসবেন একে একে। সন্ধে পেরিয়ে রাত গড়িয়ে যাবে। সারারাত বাড়ি ফেরা হয়নি, গাড়ি নিয়ে ছুটতে হয়েছে টালা থেকে টালিগঞ্জ, এমন যে কত হয়েছে এতদিনের চাকরিতে। কে জানে আজ কপালে কী আছে?

লালবাজারের গেট পেরিয়ে ডানদিকে টার্ন নিতে নিতে জিজ্ঞেস করেন গৌতম।

—কোথায় স্যার?

—কালীঘাট। হরিশ মুখার্জি রোড ধরো, তাড়াতাড়ি হবে। থানার কাছেই।

থানার কাছে বলেই চাঞ্চল্য আরও বেশি। গাড়ি ঢুকতেই পারল না ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। আটকে গেল। সরু রাস্তায় জমাট ভিড় স্থানীয় মানুষের। ঠেলেঠুলে ওসি হোমিসাইডকে রাস্তা করে দিলেন কালীঘাট থানার এক কনস্টেবল, যাঁর মুখে রুমাল চাপা দেওয়া, 'আসুন স্যার, বড়বাবু আর বাকিরা বাড়ির ভিতরে। যা দুর্গন্ধ, টেকা যাচ্ছে না।'

বিনোদের মৃতদেহ

টেকা যে মুশকিল, গলিতে ঢুকতে ঢুকতেই টের পেয়েছিলেন ওসি হোমিসাইড। অবাক হননি। ফোনে

তো জেনেইছেন, বডি সেমি-ডিকম্পোজ়ড। পচতে থাকা মনুষ্যদেহের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে উঠে আসারই কথা। বাড়ির ভিতরে ঢুকে যখন 'বডি'-র উপর চোখ রাখলেন প্রথম, তখনও মৃতদেহের পাশে বসে আছাড়িপিছাড়ি কেঁদে চলেছেন যুবক। ফটোগ্রাফার এসে গেছেন। দেহের ছবি উঠছে বিভিন্ন দিক থেকে। শাটার টেপার 'ক্লিক ক্লিক' আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সদ্য পিতৃহারার বিলাপে।

বিনোদ বর্মণ হত্যা মামলা। কালীঘাট থানা। কেস নম্বর ১৫৬, তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১। খুন এবং প্রমাণ লোপাট।

২০/৩/সি ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের একটি তালাবন্ধ বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে, ফোনে খবর এসেছিল কালীঘাট থানায়। থানার খুব কাছেই ওই রাস্তা। দূরত্ব খুব বেশি হলে আড়াইশো মিটার। ওসি পৌঁছলেন দ্রুত।

একটা ছোট একতলা পাকা বাড়ি। ঢোকার মুখে লোহার গ্রিল। যাতে তিনটে তালা ঝুলছে। ঘরের মধ্যে ঢোকার দরজা গ্রিলের পিছনে। সেই দরজাতেও তালা ঝুলছে একটা। কৌতূহলী জনতা ভিড় জমিয়েছে বাড়ির সামনে।

কার বাড়ি? স্থানীয় মানুষের থেকে জানা গেল, বাড়ির মালিকের নাম বিনোদ বর্মণ। এই বাড়িটা কিনেছেন বছরের শুরুর দিকে। তবে এখানে থাকেন না। কোথায় থাকেন? কালীঘাট শ্মশানের কাছে হিউম রোডে। এক অফিসার সঙ্গে সঙ্গেই গেলেন হিউম রোডে। এবং মিনিট কুড়ির মধ্যে ফিরলেন বছর তিরিশের এক যুবককে নিয়ে। কে ইনি? রাজেশ বর্মণ, এই বাড়ির মালিক বিনোদের একমাত্র ছেলে। পেশায় অটোচালক। বাড়ির সামনে ওই ভিড়ভাট্টা আর ভিতর থেকে দুর্গন্ধের বহর দেখে দৃশ্যতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রাজেশ। হাত চেপে ধরেন ওসি-র।

—স্যার, বাবা গত ২৫ তারিখ বেলা ১১টা নাগাদ আমাদের হিউম রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। বাবা রোজ সকালে ঘণ্টাখানেকের জন্য এখানে আসত দেখভাল করতে। তারপর ব্যবসার কাজ সেরে রাতে ফিরত। সে-রাতে ফেরেনি দেখে এখানে এসেছিলাম খোঁজ করতে। তালা বন্ধ ছিল। আমরা ভাবছিলাম, হয়তো ব্যবসার জরুরি কোনও কাজে কলকাতার বাইরে গেছে। মাঝেমাঝেই যেতে হত। কিন্তু পরের দিনও যখন ফিরল না, তখন মিসিং ডায়েরি করেছি আপনাদের থানায়। রাতের দিকে। খুব ভয় করছে স্যার।

—তালাগুলোর ডুপ্লিকেট চাবি আছে আপনাদের বাড়িতে?

—না স্যার, চাবি এক সেটই ছিল। বাবা নিজের কাছে রাখত।

ওসি তাকান সঙ্গী সাব-ইনস্পেকটরের দিকে। যিনি বোঝেন, এখন কী করণীয়। তালাটা ভাঙতে হবে।

ভাঙা হল গ্রিলে লাগানো তিনটে তালা। ভিতরের দরজার তালাও। পুলিশ ঢুকল ভিতরে। দু'কামরার বাড়ি। একটা বাথরুম। আসবাবপত্র বিশেষ নেই। চেয়ার-টেবিল একটা করে, খাট একটা। যাতে সাদামাটা বেডশিট আর একটা বালিশ শুধু। বেশ বোঝা যায়, বাড়ি ফাঁকাই পড়ে থাকত। নিয়মিত বসবাস করত না কেউ। ব্যবহৃত হত না খাট-বিছানা।

গন্ধের উৎসের হদিশ ঘরে মিলল না। মিলল বাড়ির পিছন দিকে। বাউন্ডারি ওয়াল আর ঘরের গাঁথনির মাঝে একফালি লম্বা জায়গায়। যার একটা অংশে মাটি আলগা হয়ে আছে। উপরে থিকথিক করছে পোকা।

খোঁড়ার ব্যবস্থা করতে আধঘণ্টার মতো লাগল। মাটি কাটার লোক ডাকা হল। জোগাড় হল কোদাল-শাবল-ঝুড়ি। মাটি একটু খুঁড়তেই বেরল এক পুরুষের মৃতদেহ। কাদামাটি মাখা সারা শরীরে। পলকের দেখাতেই চিনলেন রাজেশ। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মাটিতে।

—বাবা!

মাটি খুঁড়ে যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিনোদের মৃতদেহ

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন সব। জানালেন, যা বোঝা যাচ্ছিল সাদা চোখেও। খুনি বা খুনিরা গর্ত যেটা খুঁড়েছিল, সেটা গন্ধ ঢাকা দেওয়ার মতো গভীর ছিল না। আড়াই ফুট বাই ছয়-সাত ফুটের মতো খুঁড়ে মৃতদেহ শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল আলগা ভাবে, তাড়াহুড়োয়। প্রমাণ লোপাটের কাজটা মোটেই পরিপাটি হয়নি। গর্তটা যদি আরও বেশ কিছুটা গভীরে খোঁড়া হত লম্বায়-চওড়ায়, সময় নিয়ে উপরে পর্যাপ্ত মাটি চাপা দেওয়া হত, পচনশীল দেহের গন্ধ এভাবে ছিটকে আসত না বাইরে। পচেগলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা সময়ের পর পড়ে থাকত হাড়গোড়।

অপরাধের ঘটনাস্থল আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখাটা তদন্তের গোড়ার কথা। সবাই জানে। তবে ওই গোড়ার রুটিনমাফিক কাজটায় এতটুকু ঢিলে দেওয়ার বিলাসিতা দেখানো যায় না। দেখালে ভুগতে হয় চার্জশিট দেওয়ার সময়। অপরাধের কিনারা করে ফেলেও হিমশিম খেতে হয় প্রমাণ জোগাড়ে। যে প্রমাণ হয়তো নাগালের মধ্যেই থাকত, ‘প্লেস অফ অকারেন্স’-এর তল্লাশিতে আরও বেশি মনোযোগী হলে।

মনোযোগে খামতি রাখল না পুলিশ। সন্ধে হয়ে গেছে। ড্রাগন লাইট নিয়ে ওসি হোমিসাইড আঁতিপাঁতি তল্লাশি শুরু করলেন বাড়ির। ‘কষ্ট করলে কেষ্ট’ বলতে মিলল একটা প্লাস্টিকের বোতাম। গর্ত যেখানে খোঁড়া হয়েছিল, তার ফুট দশেক দূরে। মৃতের শার্ট ছিঁড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল? খুনি বা খুনিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়? বোতাম ছাড়াও সংগ্রহ করা হল ঘরের দেওয়ালে ছোপ ছোপ বাদামি দাগের স্যাম্পল। নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাওয়া রক্ত?

বিনোদের বাড়ির দেওয়ালে রক্তের ছিটে

সময় লাগল তল্লাশি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে। বিনোদ বর্মণের দেহ যখন বেরল মোমিনপুরের কাঁটাপুকুর মর্গের উদ্দেশে, রাত গড়িয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটা। ইতিমধ্যে গোয়েন্দাপ্রধান এবং ডিসি সাউথ ঘুরে গেছেন অকুস্থল। ফোনে সব জানানো হয়েছে নগরপালকে। যিনি পত্রপাঠ কেসের তদন্তের ভার দিয়েছেন গোয়েন্দা বিভাগকে। রহস্যভেদের দায়িত্ব পেয়েছেন হোমিসাইড বিভাগের তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর সুশান্ত ধর (বর্তমানে গোয়েন্দা বিভাগেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসাবে কর্মরত), যিনি লালবাজার থেকে কালীঘাট আসার পথে সঙ্গী হয়েছিলেন ওসি হোমিসাইডের।

ময়নাতদন্ত হতে হতে পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। এই জাতীয় খুনের মামলায় অনেক ক্ষেত্রেই পোস্টমর্টেমের সময় তদন্তকারী অফিসার নিজেই উপস্থিত থাকেন। সুশান্তও ছিলেন। ময়নাতদন্ত জানাল, মাথায় কোনও ভারী জিনিসের আঘাতে খুন, ‘ante-mortem and homicidal’। এটুকু অনুমেয়ই ছিল। বাড়তি যেটা ডাক্তারবাবু বললেন, সেটাও মৃতদেহ আবিষ্কারের সময়ই আন্দাজ করা গিয়েছিল। এই খুনে ‘খুনি’ নয়, ‘খুনিরা’ যুক্ত। মৃত বিনোদের শারীরিক গঠন ছিল যথেষ্ট মজবুত। তাঁকে কাবু করে, নিশ্বাস বন্ধ করে মারার পর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া, একার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই।

কখন হয়েছিল খুনটা? দ্বিধাহীন জানালেন ডাক্তারবাবু, ২৫ তারিখ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দুটোর মধ্যে। দেহ উদ্ধার হয়েছিল ২৯ তারিখ বিকেলে। বিনোদকে খুন করা হয়েছিল তার প্রায় ৯৬ ঘণ্টা আগে!

খুনিদের সন্ধান শুরু করলেন সুশান্ত। বিকেল থেকে প্রায় মাঝরাত, কালীঘাট থানা এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকলেন। বিনোদের পরিবারের লোকজন, স্থানীয় মানুষ এবং ওই অঞ্চলের পরিচিত সোর্সদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা তথ্য সংগ্রহ করলেন, সংক্ষেপে এরকম।

বর্মণ পরিবার আদতে বিহারের। কিন্তু প্রায় চার পুরুষ ধরে বসবাস কলকাতায়। কালীঘাটের ২, হিউম রোডের বাড়িতে। সোনারুপোর গয়নার পারিবারিক ব্যবসা ছিল বর্মণদের। বিনোদ বর্মণরা ছিলেন ছ’ভাই। বিনোদ সবার বড়। ব্যবসার দেখাশোনার পাশাপাশি কাজ করতেন ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে। ২০০৩ সালে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছিলেন ব্যবসায়।

মেজোভাই দিলীপ মারা গেছেন। সেজো ঘনশ্যাম তিরিশ বছর আগে বিবাগী হয়ে নিরুদ্দেশ। চতুর্থ ভাই

অশোকের ব্যবসায়িক বুদ্ধির কিছু অভাব ছিল। স্বতন্ত্র দায়িত্ব নিতে গিয়ে প্রচুর টাকা লোকসান করেছিলেন। বিনোদকে সাহায্য করতেন ব্যবসার টুকিটাকি কাজে। কিন্তু ইদানীং সেটুকুও করতে পারতেন না ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ায়। পঞ্চম ভাইয়ের নাম প্রদীপ। ব্যবসার কাজে যে শ্রম এবং মনোযোগ প্রয়োজন, দুটোর কোনওটাই আয়ত্ত করে উঠতে পারেননি প্রদীপ। হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত দিন গুজরান বাস্তুহারা বাজারে মাছ কেটে। ছোটভাই স্বপন জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ।

অসুস্থ বৃদ্ধা মা গোদাবরী দেবী মারা গিয়েছিলেন এই মাসের শুরুতেই। মা এবং বিকলাঙ্গ ছোটভাই স্বপনের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করতেন বিনোদই। ভাইদের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা শুধু তাঁরই ছিল। প্রদীপ-অশোকের সংসারেও টানাটানি হত যখন, বড়দা বিনোদই ছিলেন সহায়।

বিনোদের স্ত্রী বেশ কয়েক বছর যাবৎ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। চিকিৎসা চললেও উন্নতি হয়নি বিশেষ। একমাত্র পুত্র রাজেশ ব্যবসার হাল ধরুন, আপ্রাণ চেয়েছিলেন বিনোদ। সে চাওয়া পূর্ণ হয়নি। ব্যবসার কাজে নিয়মিত সময় দেওয়ায় তীব্র অনীহা ছিল রাজেশের। বরং প্রবল উৎসাহ ছিল ব্যবসার টাকা মদ-মাংস-মোচ্ছবে উৎসর্গ করায়। শেষমেশ সমস্ত ব্যবসায়িক দায়দায়িত্ব থেকে বাধ্য হয়েই রাজেশকে অব্যাহতি দেন বিনোদ। মাসে মাসে রাজেশের জন্য নামমাত্র হাতখরচ বরাদ্দ করেছিলেন। অগত্যা রাজেশ শুরু করেন অটো চালানো। বিয়ে করেছেন বছরদুয়েক আগে। এখনও নিঃসন্তান।

বিনোদের বন্ধুমহলে কারা ছিলেন? দুটো নাম পেলেন সুশান্ত, যাদের সঙ্গে বিনোদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মন্টু দাস এবং প্রবাল দস্তিদার। দু'জনেই বিনোদের সমবয়সি, বয়স ষাট ছুঁইছুঁই। দু'জনেই কালীঘাটে বিনোদের পাড়ারই বাসিন্দা বহু বছর ধরে।

মন্টুবাবু পটুয়াপাড়ায় মূর্তি গড়ার কাজ করেন। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে প্রায় নিত্য যাতায়াত। প্রবালের কালীঘাট মার্কেটে একটা জামাকাপড়ের দোকান আছে ছোট।

মন্টু-প্রবালের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে একটা তথ্য পাওয়া গেল। বিনোদের নারীবিষয়ে স্বাভাবিকের বেশিই দুর্বলতা ছিল। স্ত্রী মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে যে দুর্বলতা বেড়েছিল উত্তরোত্তর। নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াত ছিল নিয়মিত। দুই আবাল্য বন্ধুর কাছে কিছুই অজানা ছিল না।

ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে যে বাড়িটা বিনোদ বছরের শুরুতে কিনেছিলেন, তার লাগোয়া বাড়িতে বাস রীতা নস্কর নামের এক বছর চল্লিশের মহিলার। যাঁর স্বামী মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। এক ছেলে, হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, ক্লাস নাইনে। এই রীতার সঙ্গে বিনোদের সম্পর্ক নিয়ে পাড়ায় নাকি কানাঘুষো হচ্ছিল ইদানীং। বিনোদ-রীতাকে নাকি একসঙ্গে স্থানীয় সিনেমাহলে দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েকবার, এমন কথাও রটেছিল পাড়ায়।

রীতাকে সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলেন না সুশান্ত। ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন হস্টেলে। পরের দিন সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফেরার কথা।

১ অক্টোবর, সকাল এগারোটা। লালবাজার।

অফিসে এসেই সোজা ওসি হোমিসাইডের ঘরে ঢোকেন সুশান্ত। তদন্তে এখনও পর্যন্ত যা যা তথ্য এসেছে হাতে, জানাবেন। আলোচনাও প্রয়োজন, কী কী ভাবে এগোনো যায়, সে নিয়ে।

—স্যার, পরিচিত লোকজন হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। বিনোদ যে রোজ সকালে ওই সময় ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িতে যেতেন, জানত খুনিরা।

—হুঁ, অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হচ্ছে। একেবারে অচেনা-অজানা কেউ দিনের বেলায় এসে ঘরে ঢুকে মেরে পুঁতে দিয়ে যাবে, এটা হাইলি আনলাইকলি। আচ্ছা, ও রাস্তায় তো মোটামুটি মানুষজনের ভিড় লেগেই থাকে। কেউ কিছু দেখেনি? আই মিন, কাউকে ঢুকতে ও-বাড়িতে?

—দেখার তো কথা। তবে খোঁজখবর করার সময়ও তো বিশেষ পাইনি। গতকাল বিকেল থেকে রাত তো বেসিক ইনফর্মেশন নিতেই কেটে গেল।

—সোর্স?

—লাগিয়েছি স্যার। কাল-পরশুর মধ্যে কিছু না কিছু খবর আসবেই।

—আচ্ছা, ধরেই নেওয়া যাক, পরিচিতরা মেরেছে। কারা হতে পারে, ভেবেছ কিছু? মানে, প্রিলিমিনারি আইডিয়া কোনও?

—দেখুন স্যার, একদিনে তো সবটা জানা হয়ে ওঠেনি। পরিচিতির বৃত্তে কারা কারা ছিলেন, ব্যবসায়িক শত্রুতা কিছু ছিল কিনা, সেসব ডিটেলে জানতে আরও দিনদুয়েক তো লাগবেই। তবে যাঁদের কথা এখন পর্যন্ত জানা গেছে, তাঁরা কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। মোটিভ সকলেরই ছিল অল্পবিস্তর।

—যেমন?

—ধরুন স্যার, রাজেশ। ব্যবসা থেকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল বাবা। অটো চালিয়ে আর ক'পয়সা হয়? নেশার ঠেকে প্রায়ই দেখা যায়, সোর্স ইনফর্মেশন। টাকার দরকার ছিল। মোটিভ? বাবাকে মেরে ব্যবসার দখল নেওয়া। মিসিং ডায়েরিটা স্রেফ আমাদের মিসলিড করতে। আর ওই আকুলিবিকুলি কান্নাটা স্রেফ নাটক।

—হুঁ...

—আবার একই কারণে দুই ভাই অশোক আর প্রদীপকেও সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখা যায় না। ওদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। তার উপর দাদার এই রমরমা।

—হ্যাঁ, কিন্তু যদি উইল-টুইল বিনোদ না করে গিয়ে থাকেন, লেখাপড়া যদি কিছু না থাকে, বিনোদের মৃত্যুর পর তো ব্যবসার দখল নিয়ে রাজেশ আর ওর কাকাদের মধ্যে ঝামেলা লাগবে।

—আমি এই পয়েন্টেই আসছিলাম স্যার। এমন হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে রাজেশ আর তার দুই কাকা মিলেই বিনোদকে মেরেছে। আফটার অল, কাজটা কারও একার নয়। খুনটা যে একাধিক লোক মিলে করেছে, সেটা তো পরিষ্কার।

—হুঁ, অসম্ভব নয়। আর রীতা? বা বন্ধু যে দু'জনের কথা বললে, মন্টু, আর কী যেন নাম অন্যজনের?

—প্রবাল। দুই বন্ধু মিলেও করতেই পারে। কিন্তু মোটিভ তো কিছু দেখছি না। ছোটবেলার বন্ধুকে মারতে যাবে কেন হঠাৎ? আর রীতা নস্করের সঙ্গে তো এখনও কথাই বলা গেল না। আজ বলব।

—হ্যাঁ, শুধু রীতা নন, সকলের সঙ্গেই আর একবার ডিটেলে কথা বলো আজ, সময় নিয়ে। থানাতেই ডেকে নাও বিকেলের দিকে।

—রাইট স্যার।

—আর হ্যাঁ, রাজেশ এবং অন্য যাঁদের কথা বললে, মোবাইল রেকর্ডস পেয়েছ? ভিক্টিমেরটা?

—রিকুইজিশন কাল সন্ধেবেলায়ই পাঠিয়ে দিয়েছি। শেষ তিন মাসের চেয়েছি। আজ সন্ধের মধ্যে ডেফিনিটলি পেয়ে যাব।

—হ্যাঁ, ওটা থেকে 'লিড' কিছু একটা পাওয়া উচিত। আর না পেলেও কয়েকজনকে 'এলিমিনেট' অন্তত করতে পারবে সাসপেক্টদের লিস্ট থেকে।

১ অক্টোবর, কালীঘাট থানা। বিকেল সাড়ে চারটে।

থানায় উপস্থিত বর্মণ পরিবারের তিন সদস্য রাজেশ-অশোক-প্রদীপ, দুই বাল্যবন্ধু মন্টু দাস-প্রবাল দস্তিদার, এবং প্রতিবেশিনী রীতা নস্কর। সুশান্ত থানায় চলে এসেছেন সোয়া চারটেয়। এঁদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে আরও অনেক খোঁজখবর নেওয়ার আছে। প্রত্যেকের গতিবিধির উপর নজর রাখাও প্রয়োজন। সেসব করাই যাবে। মোবাইল রেকর্ডস এসে যাবে সন্ধের মধ্যে। কোনও অসংগতি পেলে চেপে ধরতে আর কতক্ষণ? এক রীতা ছাড়া প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এঁদের সবারই হয়ে গেছে। তবু আরও একবার বাজিয়ে

নেওয়া দরকার সবাইকে। এবং এই 'বাজিয়ে নেওয়া'-র কাজটা একটু অন্যভাবে করবেন, ঠিক করলেন সুশান্ত। শুরু হল দ্বিতীয় দফার জেরা।

জেরা নিয়ে কিছু কথা প্রাসঙ্গিক এখানে। বাস্তবের তদন্তের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁদের যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদ হল পৃথিবীর নীরসতম কাজগুলোর একটা। অন্তত তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই। শুরুর দিকে সন্দেহের পরিধি থাকে বিস্তৃত। নাম কী, বাবার নাম কী, বাড়ি কোথায়, কে কে আছে বাড়িতে, কী করেন, আগে কী করতেন... এমন গুচ্ছের কেজো প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ তৈরি করতে হয় তথ্যভাণ্ডার। নীরস, কিন্তু জরুরি। ওটাই ভিত, ওটাই বুনিয়াদ। যার উপর বাড়ি উঠবে।

জেরার পদ্ধতি বা 'Interrogation techniques' নিয়ে প্রচুর তত্ত্ব আছে অপরাধবিজ্ঞানে। ১৯৭৪ সালে John E. Reid প্রবর্তিত 'Reid Technique' একসময় প্রবল সমাদৃত ছিল তদন্তকারীদের কাছে। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। Reid-এর তত্ত্বের নির্যাস হল, জেরায় যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করো। তারপর অপরাধের ধরন এবং সন্দেহভাজনদের সঙ্গে সেই তথ্যের যোগসূত্র স্থাপন করো জিজ্ঞাসাবাদে।

কীভাবে? প্রত্যেক সন্দেহভাজনের জীবনধারা এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্যের একটা ছবি এঁকে ফেলো মনে মনে। অমুকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন, পারিবারিক জীবনই বা কেমন, কর্মজীবনে কতটা অস্থিরতা, প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরে শরীরী ভাষায় কোনও উদ্বেগ ধরা পড়েছে কিনা, চিন্তিত হয়ে পড়লে কোনও মুদ্রাদোষ চোখে পড়ে কিনা, সব মগজে 'স্টোর' করে রাখো। সামগ্রিক ভাবে একটা নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করো, যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে। সেই ধারণার ভিত্তিতে পরের পর্যায়ে প্রশ্নমালার গতিপথ নির্ধারণ করো। সে প্রশ্ন কখনও হোক আন্তরিক এবং তথ্যমূলক, কখনও ব্যক্তিবিশেষে হোক প্ররোচনামূলক। প্রতিক্রিয়া লক্ষ করো গভীর মনোযোগে এবং অপেক্ষায় থাকো উত্তরের অসংগতির। পরিভাষায়, 'factual analysis' আর 'behaviour analysis'।

Reid-এর তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কও আছে। পালটা তত্ত্ব আছে। অনেকে মনে করেন, এ ভাবে অপরাধীর থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের পদ্ধতি 'থিয়োরি' হিসাবে শুনতে ভাল। তবে বাস্তবে কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ আছে। সংশয় আছে ব্যবহারের বা শরীরী ভাষার তারতম্যের ভিত্তিতে ধারণা তৈরির বিষয়ে। পুলিশের প্রশ্নের মুখে পড়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষও নার্ভাস হয়ে যেতেই পারেন। হাতের তালু ঘেমে উঠতে পারে। পাল্‌স রেট বেড়ে যেতে পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। আকছার হয়ে থাকে, দেখেছি আমরা। জেরার সময় ব্যবহারের পরিবর্তনের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী নন Reid Technique-এর বিরোধীরা। Reid-এর পদ্ধতিতে তত্ত্বের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিয়ে বরাবর আপত্তি জানিয়ে এসেছেন অপরাধবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ।

আপত্তিটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, জিজ্ঞাসাবাদকে তত্ত্বের ঘেরাটোপে বন্দি করে ফেললে ফল মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই। কোন ক্ষেত্রে কোন স্ট্র্যাটেজি কাজ করবে, বলা মুশকিল। জেরা করতে করতেই অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারীকে পদ্ধতি বদলে ফেলতে হয় পরিস্থিতির বিচারে। ব্যাকরণসিদ্ধ প্রথার পরোয়া করলে চলে না তখন।

যেমন ধরুন, বহুপ্রচলিত 'Good cop, Bad cop' টেকনিক। সন্দেহভাজনকে যদি কিছুটা আবেগপ্রবণ মনে হয়, এই পদ্ধতিতে কাজ হয় বেশি। 'Bad cop' অর্থাৎ 'খারাপ পুলিশ' ইচ্ছাকৃত ভাবে রূঢ় ভাষায় জেরা করে সন্দেহভাজনকে মানসিক ভাবে দুমড়ে দিলেন। আর কিছুক্ষণের বিরতির পর 'Good cop' অর্থাৎ 'ভাল পুলিশ' এসে পিঠে সহানুভূতির হাত রাখলেন, 'আগের জনের কথায় কিছু মনে করবেন না প্লিজ়। নিন, জল খান। আপনি কী অসহনীয় পরিস্থিতিতে ক্রাইমটা করতে বাধ্য হয়েছেন, আমি বুঝি। আপনার জায়গায় থাকলে আমিও একই জিনিস করতাম। কিছু বলতে হবে না এখন আপনাকে। যখন ইচ্ছে হয়, বলবেন। না ইচ্ছে হলে বলবেন না।'

এই পন্থায় অভাবিত কাজ দেয় কখনও কখনও। বাবা খুব বকাবকি করার পর মা পিঠে হাত রেখে আদর

করে দিলে, বা উলটোটা হলে, বাচ্চারা যেমন হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে কাঙ্ক্ষিত সহানুভূতির ছোঁয়ায়, এ অনেকটা তেমন। 'Good cop'-এর কাছে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি আসে অপরাধের।

উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। মোদ্দা কথা হল, তত্ত্বসর্বস্বতায় আটকে থাকতে নেই তদন্তকারীকে। টেকনিকের জন্য খেলা নয়। খেলার জন্যই টেকনিক। যে টেকনিকে যখন যেভাবে রান আসতে পারে, সেটাই তখন সেখানে ব্যাটসম্যানের সেরা টেকনিক। সে ব্যাটিং-ম্যানুয়াল যা-ই বলুক না কেন।

সুশান্ত জেরা শুরু করলেন ব্যাকরণের তোয়াক্কা না করেই। প্রথম থেকেই চালু করে দিলেন 'শক থেরাপি'। মনস্তাত্ত্বিক 'শক', আচমকা ঝটকা। কথা নেই বার্তা নেই, শুরুতেই সবাইকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হতভম্ব-হতচকিত করে দিয়ে। এবং যাচাই করে নেওয়া বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া।

বাড়ি ফেরার কিছুটা তাড়াও ছিল সুশান্তর। সন্ধে হয়ে যাবে একটু পরেই। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আকাশ ভেঙে। থামার ন্যূনতম লক্ষণ নেই। রাত্রে যাদবপুরে এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠান। একবার না গেলেই নয়। বুড়ি ছুঁয়ে আসাই, তবু একবার মুখ দেখাতেই হবে, সে যত রাতই হোক। এমনিতেই পুলিশ মহলে একটা রসিকতা চালু আছে, 'পুলিশের শনিবার নেই, রবিবার নেই, পরিবার নেই।' আজকের নেমন্তন্নটায় না গেলে সত্যিই 'পরিবার' থাকার সম্ভাবনা কম। বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করে আছে, সুশান্ত ফিরলে একসঙ্গে যাওয়া হবে। কিন্তু এ যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সময়মতো বেরতে পারলে হয়। বিরক্ত লাগে সুশান্তর, দ্রুত শুরু করেন রাজেশকে দিয়ে।

—ভাই, আপনি কিন্তু আগাগোড়া একটা কথা মিথ্যে বলেছেন।

হকচকিয়ে যান রাজেশ।

—আমি? কী স্যার?

—একটা ম্যাটাডোর কেনার টাকা চেয়েছিলেন বাবার কাছে। বিনোদবাবু দেননি। বলেছিলেন, 'তোকে টাকা দেওয়া মানে জলে দেওয়া। মদ খেয়ে উড়িয়ে দিবি দু'দিনে।' চেতলার জুয়ার ঠেকে এ নিয়ে তো পরদিন বাবাকে প্রচুর গালমন্দ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দেখে নেব বুড়োকে!'

—ভুল খবর স্যার, ডাহা মিথ্যে!

—মোটেই মিথ্যে নয়! আপনি যান না চেতলা লক গেটের পাশের ঠেকে প্রতি রাত্রে?

রাজেশ আমতা আমতা করতে থাকেন এবার।

—যাই স্যার। অনেকেই যায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাবার কাছে টাকাও চাইনি আর ওসব বলিওনি ঠেকে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন স্যার।

—খোঁজ না নিয়ে কী আর বলছি? বাবাকে মেরে বাড়িটা হাতানোর মতলব করেছিলেন কিছু গুন্ডা-বদমাইশদের নিয়ে। ভুল বলছি?

রাজেশ রেগে যান হঠাৎ।

—হ্যাঁ স্যার, ভুল বলছেন। একশোবার ভুল বলছেন। হাজারবার ভুল বলছেন। আমি মরে গেলেও নিজের বাবাকে খুন করার কথা ভাবতেই পারব না। কী প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে? যা খুশি বলে যাবেন, আর মেনে নিতে হবে?

সুশান্ত শোনেন চুপচাপ। সত্যিই, প্রমাণ তো কিছু নেই। এ তো স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছোড়া চলছে। লাগলে তুক, না লাগলে তাক। মুখে অবশ্য বুঝতে দেন না রাজেশকে।

—কী প্রমাণ আছে, ঠিক সময়ে বলব। আমরা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। কাল দুপুরের দিকে খবর পাঠাব। লালবাজারে চলে আসবেন।

রাজেশের চোখে আতঙ্কের ছায়া পড়ে।

—লালবাজারে কেন স্যার?

সুশান্ত থেমে থেমে উত্তরটা দেন, সময় নিয়ে।

—আসলে কী জানেন, থানায় বসে ঠিক হয় না। দেখছেন তো, কত লোক কত সমস্যা নিয়ে আসছে যাচ্ছে। এখানে ঠিক হয় না ব্যাপারটা। লালবাজারে আলাদা ঘর আছে জেরা করার। কাল আসুন, বুঝতে পারবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, যত্নআত্তির কোনও ত্রুটি হবে না।

রাজেশের আতঙ্ক দৃশ্যতই আরও গাঢ় হয়। লালবাজারে যত্নআত্তি মানে? পাশে বসে থাকা মন্টুবাবুর হাত চেপে ধরেন রাজেশ।

—মন্টুকাকু, স্যাররা ভাবছেন আমি বাবাকে মেরেছি। আমি কেন নিজের বাবাকে মারতে যাব? তুমি তো আমাকে ছোট থেকে দেখেছ। তোমার মনে হয়, আমি বাবাকে মারতে পারি? তুমি বলো স্যারকে ...

মন্টু সত্যিই রাজেশকে জন্মাতে দেখেছেন, বিনোদের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব। পিঠে হাত রাখেন পুত্রসম রাজেশের, তাকান সুশান্তর দিকে।

—স্যার, জানি না কী প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা। তবে এটুকু বলতে পারি, আর যাই করুক, খুন করার ছেলে রাজেশ নয়। বিশ্বাস করুন।

সুশান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন মন্টুকে। তাকান রীতার দিকে।

—কিছু মনে করবেন না রীতাদেবী, আপনার সঙ্গে বিনোদবাবুর সম্পর্ক ঠিক কেমন ছিল?

মহিলা এ প্রশ্ন আশা করেননি। অবাক দৃষ্টিতে তাকান।

—কেমন সম্পর্ক মানে?

—মানে আর নতুন করে কী বোঝাব? আপনিও বুঝছেন, কী বলতে চাইছি। বিনোদবাবুর সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্কের কথা বলছি। বাধ্য হয়েই বলছি।

—এসব কী বলছেন স্যার!

—আপনার অজানা কিছু বলছি কি? আর না জেনে এ ধরনের কথা বলবই বা কেন? বিনোদ যখন ঈশ্বর গাঙ্গুলির বাড়িতে যেতেন রোজ, মাঝেমাঝে আপনি যেতেন না দুপুরের দিকে? কেন যেতেন? ওঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাড়িটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে জোর করতেন না? একটা শব্দও মিথ্যে এর?

রীতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সুশান্তর দিকে। তারপর কেঁদেই ফেলেন প্রায়।

—এ আপনি কী বলছেন স্যার? বিনোদদার সঙ্গে দাদা-বোনের সম্পর্ক ছিল। ওঁর বাড়িতে যাইই নি কোনওদিন। উনিই বরং গত ভাইফোঁটায় আমার বাড়িতে এসে ফোঁটা নিয়ে গেছেন। রাস্তাঘাটে দেখা হলে দু'-একটা কথা হত। আলাপ ছিল। এইটুকুই। খোঁজ নিয়ে দেখুন না পাড়ায়, সেলাই করে সংসার চালাই। মিথ্যে স্যার, আপনাকে যে এসব খবর দিয়েছে, মিথ্যে বলেছে। ডাকুন না একবার আমার সামনে...

—সময় হলেই ডাকব। যাক গে, বৃষ্টি থামলে বাড়ি যেতে পারেন। আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। কাল বিকেলের দিকে আপনাকেও একবার লালবাজার আসতে হতে পারে। থানা জানিয়ে দেবে, কখন।

রীতার মুখ থেকে কথা বেরয় না। চেয়ারেই বসে থাকেন। যেন নড়াচড়ারও ক্ষমতা হারিয়েছেন।

সুশান্ত দেখেও দেখেন না। ঘড়িতে চোখ বুলোন। পৌনে ছ'টা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মন্টু-প্রবাল-অশোক-প্রদীপ এখনও বাকি। তাড়াতাড়ি সেরে বেরতে হবে এবার। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে একটু। থামেনি, তবে আগের মতো মুষলধার চোখরাঙানি নেই।

—মন্টুবাবু, কী কী কারণে আপনি বাল্যবন্ধু বিনোদকে খুন করতে পারেন বলবেন একটু...

কথা জোগায় না স্তম্ভিত প্রৌঢ়র মুখে। সুশান্ত আবার জিজ্ঞেস করেন।

—বলুন মন্টুবাবু... কেন মারলেন বিনোদবাবুকে? ছোটবেলার বন্ধুকে এভাবে মারতে হাত কাঁপল না? আপনার তো নরকে ঠাঁই হওয়াও মুশকিল ...

মন্টুকে আক্ষরিক অর্থেই বাক্‌রুদ্ধ দেখায়।

—স্যার, আমি ছাপোষা মানুষ। কালীঘাট মন্দিরে পাঁঠাবলি দিই, পটুয়াপাড়ায় মূর্তি বানাই। গায়ক অমৃক সিং অরোরার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন স্যার? ওঁর বাড়ির কালীপুজোয় আমিই মূর্তি বানাই বহু বছর হল। জিজ্ঞেস করে দেখবেন আমার ব্যাপারে। আমি খুন করব বিনোদকে?

—সে না হয় জিজ্ঞেস করব। আর আপনি যদি না-ও মেরে থাকেন, আর কে মারতে পারে আপনার বন্ধুকে? কী মনে হয়?

বিহ্বল মন্টু হাতজোড় করে ফেলেন এবার। চশমা খুলে চোখ মোছেন।

—কী বলব স্যার? বিনোদের তো কোনও শত্রু ছিল না। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ ছিল।

সুশান্তর হঠাৎই চোখ চলে যায় করজোড় মন্টুর বাঁ হাতের দিকে। লাল ছোপ একটা বুড়ো আঙুলে।

ইনস্টিংক্ট। ইংরেজি শব্দ। কী বাংলা হয়? সহজাত প্রবৃত্তি? আগাথা ক্রিস্টির 'The Mysterious Affair at Styles' উপন্যাসে অদ্বিতীয় Hercule Poirot এক জায়গায় বলছেন, 'Instinct is a marvellous thing. It can neither be explained, nor can be ignored.' সহজাত প্রবৃত্তি এক আশ্চর্য বস্তু। ব্যাখ্যাও করা যায় না, উপেক্ষাও না।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় সন্দেহভাজনের শরীরের প্রতিটি নড়াচড়া শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ করা যে-কোনও বুদ্ধিমান তদন্তকারীর সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ইনস্টিংক্ট। যেটা অভাবিত ভাবে কাজে লেগে গেল সুশান্তর।

—ওটা কীসের দাগ মন্টুবাবু? লাল দাগটা?

মন্টুকে সামান্য অপ্রস্তুত দেখায়, সামলে নেন পরমুহূর্তেই।

—মূর্তি গড়ি তো, রং লেগে যায়, লেগে গেছে অসাবধানে।

সুশান্ত উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। মন্টুবাবুর বাঁ হাতটা ধরে লাল ছোপটা দেখলেন মিনিটখানেক। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন চোখাচোখি।

—মিথ্যে বলছেন কেন? এটা মূর্তির রং নয়। এটা তো লাল ওষুধ, মারকিউরোক্রোম।

মন্টুবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকান সুশান্তর দিকে। তোতলাতে থাকেন হঠাৎ।

—পাঁঠা কাটি তো... রক্ত ছিটকে বোধহয়...

সুশান্ত শোনেন, এবং আগ্রাসী আক্রমণে যান নিমেষে। লোভনীয় ফ্লাইটেড ডেলিভারিতে ঠিক যেভাবে স্টেপ আউট করে ব্যাটসম্যান।

—একবার বলছেন মূর্তির রং, একবার বলছেন বলির রক্ত। আমাকে দেখে যদি নির্বোধ বলে মনে হয় আপনার, তা হলে ভুল মনে হয়। কোথায় কেটে গেছে আপনার? লাল ওষুধের দরকার পড়ল কেন?

মন্টু বসে থাকেন বজ্রাহতের মতো। টেনে দাঁড় করান সুশান্ত।

—জামাটা খুলুন।

জামা খোলার পর দেখা গেল, মন্টুর ডান কনুইয়ের কাছে ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন। দেখেই বোঝা যায়, ক্ষত খুব পুরনো নয়। সবে মামড়ি পড়তে শুরু করেছে। ফরেনসিক সায়েন্সের ভাষায়, 'brush abrasion', রাফ সারফেসের সঙ্গে শরীরের কোনও অংশের ঘর্ষণজনিত ক্ষতচিহ্ন।

—এটা কবে হল? কী ভাবে হল?

মন্টু নিরুত্তর। কাঁপছেন। সুশান্ত বলতে থাকেন।

—আমি বলি? আমি বলি, কীভাবে হয়েছিল? বিনোদকে খুন করে যখন বডিটা টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন পোঁতার জন্য, দেওয়ালে ঘষা লেগেছিল। ঠিক বলছি?

স্রেফ আন্দাজেই বলা, এবং লক্ষ্যভেদ! মন্টু দাস কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসে পড়েন। পা জড়িয়ে ধরেন সুশান্তর। কাঁদতে শুরু করেন অঝোরে।

—সব বলছি স্যার। আমি একা মারিনি। অশোক আর প্রদীপও ছিল।

অশোক বর্মণ আর প্রদীপ বর্মণ, মৃত বিনোদের দুই সহোদরের দিকে তাকান সুশান্ত। দু'জনে যেন সহসাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকা রাজেশ শুনছিলেন সব। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন অশোকের উপর, ঝাঁকাতে থাকেন কাকার শার্টের কলার, 'তোমরা মেরেছ বাবাকে? তোমরা?'

দু'জন কনস্টেবল সরিয়ে নিয়ে যান রাজেশকে। মোবাইল কল রেকর্ডের আর দরকার পড়বে না আপাতত, বোঝেন সুশান্ত। বোঝেন, ওসি হোমিসাইডকে ফোন করা দরকার এখনই। বোঝেন, নেমন্তন্ন রক্ষা লাটে উঠল। বাড়ি যাওয়ার কোনও গল্পই নেই আর। 'পরিবার' থাকবে কিনা, ভাবার সময় নেই এখন।

মন্টু বলতে শুরু করলেন। মুখ খুললেন অশোক আর প্রদীপও। পরদা উঠল হত্যারহস্যের।

বিনোদদের মা গোদাবরী দেবী সেপ্টেম্বরের শুরুতে মারা যাওয়ার পরই মায়ের ঘরের দখলদারি নিয়ে অশোক-প্রদীপের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় বিনোদের। মায়ের ঘরের সম্পূর্ণ দখল নিতে চেয়েছিলেন বিনোদ, একরকম জোর করেই। বাধা দেন অশোক-প্রদীপ। মায়ের শ্রাদ্ধের দিনও তীব্র বাদানুবাদ হয় এ নিয়ে। বিনোদ বলেন, 'মায়ের চিকিৎসার সব খরচ যখন আমি দিতাম, ঘরের উপর আমারই দাবি সবার আগে।' এ যুক্তি মানতে চাননি ভাইরা। যাঁরা নিজেদের দিন-আনি-দিন-খাই জীবনযাত্রার সঙ্গে বড়দার রাজা-মারি-বাদশা-মারি চালচলনের তুলনা করে দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগতেন হীনম্মন্যতায়, ঈর্ষায়। যে ঈর্ষায় প্রবল ঘৃতাহুতি দিয়েছিল বিনোদের ঘর দখলের চেষ্টা।

মন্টু দাস এ পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ। অশোক-প্রদীপদের বড় হতে দেখেছেন। মন্টুদা-র শরণাপন্ন হলেন দুই ভাই, 'তুমি বড়দাকে বোঝাও। ওর টাকার জোর আছে। ঠিক কোনওভাবে ঘরটা দখল করে নেবে। জোরজার করলে কিন্তু আমরাও ছাড়ব না। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে বলে উঠতে-বসতে গালিগালাজ করে। কথা শোনায় রোজ। অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। তা ছাড়া ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িটাও তো আছে। ওটা বেচে দিলে তো অনেক টাকা পাবে। মায়ের ঘরটাও দরকার? বাড়াবাড়ি করলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। মেরেই ফেলব।'

অশোক আর প্রদীপ জানতেন না, বিনোদের ব্যাপারে ঈর্ষা শুধু তাঁরাই নন, আপাতদৃষ্টিতে অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু মন্টুও পোষণ করতেন।

—স্যার, একসঙ্গে বড় হয়েছি বিনোদের সঙ্গে। হাফপ্যান্টের বয়সের বন্ধু। গত এক-দেড় বছরে ব্যবসার যত রমরমা বাড়ছিল, বিনোদ যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিল। আচার-আচরণই পালটে গেছিল। একসঙ্গে আড্ডা দিতাম বা তাস খেলতাম ঠিকই। কিন্তু ও মাঝেমাঝেই কথাবার্তায় বুঝিয়ে দিত, যে ও বড়লোক আর আমরা ছাপোষা। ও পেরেছে, আমরা পারিনি।

—বলে যান, শুনছি।

—আমারও স্যার টানাটানির সংসার। কোনওভাবে দিন চলে। পুজোর মরশুমেই যা মূর্তি গড়ে টাকা আসে কিছু। বাকি বছরটা চালাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

—টানাটানির সংসার বলে ছোটবেলার বন্ধুকে মেরে ফেললেন? মেরে পুঁতে রাখলেন?

—বিশ্বাস করুন, বিনোদকে মারার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন। গত মাসে ওর থেকে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম বাড়িটা সারানোর জন্য। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক। শুনে হাসতে হাসতে বলল, 'দিতে পারি, কিন্তু শোধ দিবি, তার গ্যারান্টি কী? ফস করে কোনদিন মরে যাবি, আমার টাকা জলে যাবে।' ওই অপমানটা প্রচণ্ড গায়ে লেগেছিল আমার। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল। মুখে শুধু বলেছিলাম, 'দিতে হবে না টাকা।' বিনোদ তারপরেও দিতে চেয়েছিল টাকা। নিইনি। সম্মানে লেগেছিল। রাগ হয়েছিল খুব। দয়া দেখাচ্ছে?

—তারপর?

—অশোক-প্রদীপরা যখন এসে বলল, বিনোদ মায়ের ঘরের দখল নিতে চাইছে, যখন বলল, জবরদস্তি করলে ওরা মেরেই ফেলবে 'বড়দা'-কে, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এল। নিজের ভাইদের সঙ্গে যে কুকুর-ছাগলের মতো ব্যবহার করে, টাকার গরমে ছোটবেলার বন্ধুকে অপমান করতে যার বাধে না, তার চরম

শাস্তিই পাওয়া উচিত।

—প্ল্যানটা কী করলেন?

—ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িটা ভাল করে সারিয়ে-সুরিয়ে বেচে দেওয়ার কথা ভাবছিল বিনোদ। আমাকে বলেছিল, 'দ্যাখ না একটা ভাল কোনও খদ্দের।' আমি অশোক-প্রদীপকে বললাম, 'তোদের বড়দা এই বাড়িটা বেচে দিয়ে মোটা টাকা পাবে আর সেই দিয়ে ব্যবসা আরও ফুলেফেঁপে উঠবে। মামলা করে তোদের মায়ের ঘরটাও দখল নেবে। একটা উপায় আছে আমাদের তিনজনেরই বড়লোক হওয়ার। শুনতে চাস তো বলব।'

অশোক এবার থামিয়ে দেন মন্টুকে।

—আমি বলছি স্যার। মন্টুদা বলল, 'বিনোদের কাছ থেকে বাড়ির দলিলটা কোনওভাবে বাগিয়ে তারপর পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। দলিলটা জাল করে বাড়িটা বিক্রি করে যা টাকা পাব, সেটা তিনজন ভাগ করে নেব।'

প্রদীপ বলতে শুরু করেন অশোকের কথা শেষ হতে না হতেই।

—আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম মন্টুদাকে, 'যদি পুলিশ ধরে ফেলে?' মন্টুদা বলেছিল, 'আরে, বডি পেলে তো ধরবে। পুঁতে দেব মাটির নীচে। খুঁজেই তো পাবে না কেউ। লোকে কিছুদিন পরে ভাববে, মেন্টাল পেশেন্ট বউ-কে ফেলে রেখে বাড়ি বেচে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে চলে গেছে অন্য কোথাও। দ্যাখ ভেবে, তোরা রাজি আছিস কিনা?'

বক্তা এবার অশোক।

—বাড়ি ফেরার পথে আমরা দু'জন আলোচনা করে ঠিক করলাম, রোজকার অর্থকষ্ট আর বড়দার অপমানের থেকে বাঁচতে এটাই সেরা রাস্তা।

সুশান্ত ইশারায় থামতে বলেন দুই ভাইকে। তাকান মন্টুর দিকে। শক্ত সবল চেহারার প্রৌঢ় মাথা নিচু করে বসে আছেন নিশ্চুপ।

—মন্টুবাবু, বাকিটা আপনার মুখ থেকেই শুনি। ধরা তো পড়েই গেছেন, চুপ করে থেকে আর লাভ নেই।

উনষাট বছরের মন্টু মুখ তোলেন, বলতে থাকেন ধীরে ধীরে, বন্ধুহত্যার বৃত্তান্ত।

—২৪ তারিখ সন্ধেবেলা বিনোদকে ফোন করলাম। বললাম, 'একজন ভাল খদ্দের পেয়েছি। বাড়িটা দেখতে চাইছে। দলিলটা নিয়ে কাল সাড়ে এগারোটায় আসতে পারবি?' জানতাম, ওই সময়টায় রোজ ও এমনিতেই আসে। বিনোদ বলল, 'ঠিক আছে, আসব।'

—আসার পর?

—রাতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম অশোক-প্রদীপকে। কথা ছিল, ওরা কাছেপিঠে থাকবে। বিনোদ এলে আমি ঢুকব। ঢোকার আগে একটা মিসড কল দেব অশোককে। ওরাও চলে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

—বেশ ...

—বিনোদ এল দলিল নিয়ে। আমি টুকটাক কথাবার্তা চালালাম কয়েক মিনিট। বিনোদ জানতে চাইল, 'খদ্দের কখন আসবে রে?' আমি বললাম, 'এখুনি এসে পড়বে।' বলতে বলতেই অশোক আর প্রদীপ ঢুকল। বিনোদ চমকে উঠে বলল, 'আরে, তোরা?'

প্ল্যানমাফিক একটা বড় ব্যাগে শাবল আর কয়েক টুকরো কাপড় নিয়ে এসেছিল ওরা। বিনোদ কিছু বোঝার আগেই ব্যাগ থেকে শাবলটা বার করলাম আমি। ওরা দু'জন বিনোদের হাত চেপে ধরল, আর আমি সজোরে শাবল চালালাম কপালে। পরপর দু'বার। বিনোদ কাটা গাছের মতো পড়ে গেল।

—তারপর গলায় কাপড়ের ফাঁস দিলেন, মুখে কাপড় গুঁজলেন, আর বাড়ির পিছনে বিনোদকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিলেন, এই তো?

—হ্যাঁ স্যার, তার আগে বিনোদের প্যান্ট-জামা খুলে নিয়েছিলাম। প্যান্ট থেকে চাবির গোছাটা নিলাম। মেঝের রক্তের দাগ জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ঘর তালাবন্ধ করে দলিলটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিনোদের শার্ট-প্যান্ট ব্যাগে ভরে নিয়ে।

প্রমাণ একত্রিত করার কাজটা খুব দুঃসাধ্য ছিল না চার্জশিট তৈরির সময়।

এক, রক্তের দাগ-লাগা শাবল উদ্ধার হয়েছিল অশোকের ঘর থেকে। রক্তের দাগের নমুনা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মিলে গিয়েছিল ঘরের দেওয়াল থেকে সংগৃহীত রক্তের নমুনার সঙ্গে।

দুই, বিনোদের রক্তমাখা শার্টপ্যান্ট মন্টু দাসের বাড়ির তল্লাশিতে পাওয়া গেছিল। এক্ষেত্রেও পোশাকের রক্তের নমুনা আর অকুস্থল থেকে সংগৃহীত রক্তের নমুনা মিলে গিয়েছিল পরীক্ষায়। উদ্ধার হওয়া শার্টে একটা বোতাম ছিল অমিল। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া প্লাস্টিকের বোতামই যে সেই বোতাম, একই শার্টের, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে নিখুঁত প্রমাণিত হয়েছিল।

তিন, প্রদীপের কাছে ছিল বিনোদের সেই বাড়ির দলিল। উদ্ধার হয়েছিল হিউম রোডের বাড়িতে প্রদীপের ঘরের ট্রাঙ্ক থেকে।

চার, কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছিল বিনোদ এবং আততায়ী-ত্রয়ীর কল রেকর্ড। খুনের আগের সন্ধেয় বিনোদকে ফোন মন্টুর, খুনের দিন সকালে মন্টুর মিসড কল অশোককে, চারজনের ফোনের টাওয়ার লোকেশন খুনের সময় একই বিন্দুতে মিলে যাওয়া, পারিপার্শ্বিক প্রমাণও ছিল অকাট্য।

পাঁচ বছরের বিচারপর্বের শেষে মন্টু-অশোক-প্রদীপকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শুনিয়েছিলেন বিচারক। কারাদণ্ড যাবজ্জীবন। যে সাজা ওঁরা এখনও ভোগ করছেন।

স্বামী-স্ত্রীকে খুন করছে সন্দেহের বশে। স্ত্রী ষড়যন্ত্রে শরিক হচ্ছে প্রেমিকের সঙ্গে, স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। ছেলে সম্পত্তির লোভে ছক কষছে বাবার ভবলীলা সাঙ্গ করার। বাবার হাত কাঁপছে না সন্তান-নিধনে। ছোটবেলার বন্ধু অর্থলিপ্সায় পথের কাঁটা ভাবছে বন্ধুকে, বন্ধুর ভাইদের সঙ্গে সজ্ঞানে প্ল্যান করছে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার!

বিচারসিদ্ধান্তের শেষাংশ

কল্পনার গল্প-উপন্যাসে এসব পড়া এক। বাস্তবের এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা কাগজে পড়া এক। কিন্তু ঘটনায় জড়িত রক্তমাংসের চরিত্রগুলোর সঙ্গে তদন্ত চলাকালীন নিয়মিত ভাবের আদানপ্রদান আরেক। তদন্ত যাঁরা করেন এ ধরনের বিরল মামলায়, তাঁদের কিছুটা সুযোগ ঘটে অপরাধীর মনোজগৎকে সত্তর মিলিমিটার স্ক্রিনে দেখার।

দেখেও যে খুব বেশি শেখা যায়, এমন দাবিই বা করি কী করে? সম্পর্কের যোগ-ভাগ-গুণ-বিয়োগ মেলে না অপরাধের দুনিয়ায়। এ এক অন্য পৃথিবী।

বিপুলা যে পৃথিবী। যার কতটুকুই বা জানি!

পুনশ্চ: রীতা নস্কর নামটি পরিবর্তিত। মহিলার সামাজিক বিড়ম্বনা অভিপ্রেত নয়। তাই।

আংটি, তবে বাদশাহি নয়

ওরা ছুটছে। পাশাপাশি, ঊর্ধ্বশ্বাসে। নিজের নিজের ট্র্যাকে। শুরুর দিকে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান উনিশ-বিশ। কিন্তু সেটা ওই শুরুর দিকেই যা। তিরিশ-চল্লিশ মিটার পরেই ছবিটা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। তিন-চারজনের একটা দল ছিটকে বেরিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাল রাখতে পারছে না বাকিরা।

ফিনিশিং পয়েন্টের একশো মিটার আগে একটা টার্ন আছে। তারপর এসপার-ওসপারের দৌড়। হাতে দূরবিন উঠে এসেছে জনতার। প্রতিটা ইঞ্চি-সেন্টিমিটারের এগোনো-পিছনোয় জান্তব উল্লাস ছিটকে আসছে গ্যালারি থেকে। উত্তেজিত ধারাভাষ্য যথেচ্ছ বারুদ জোগাচ্ছে সে উল্লাসে, 'Number 3 in the lead, but for how long? 2 catching up fast, so is 5 and keep an eye on number 4 too.. Goodness me, this is as close as it gets!'

ওরা ছুটতে থাকে মরণ-বাঁচন। দৌড় শেষ হয়। আনন্দ-হতাশা-উচ্ছ্বাস-আক্ষেপের কোলাজ তৈরি হয় গ্যালারিতে। ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড, ফলাফল ঘোষণার পর ধারাভাষ্যকার রাশ টানেন নাটকীয়তায়, স্বাভাবিক গলায় জানিয়ে দেন পরের দৌড়ের সময়। অন্য ঘোড়া, অন্য দৌড়।

শুভজিৎ দেখছিলেন উদাসীন। রেসের মাঠে জীবনে আসেননি এই খুনটা হওয়ার আগে। আজ এই প্রথমবার এলেন। কে জানে, আর কতবার আসতে হবে? যখন ফোনটা থানায় এসেছিল সপ্তাহখানেক আগে, কে ভেবেছিল, এত ঝক্কি পোহাতে হবে? কে ভেবেছিল, এতটা সময় কাটাতে হবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে?

১৬ অগস্ট, ২০০৭, বৃহস্পতিবার।

—নমস্কার, টালিগঞ্জ থানা...

স্বভাবসিদ্ধ কেজো গলায় ফোনটা তুলেছিলেন শুভজিৎ। থানায় ঢুকে নিজের চেয়ারে বসেছেন আধঘণ্টা হল। লম্বা দিন সামনে। একটু পরে আলিপুর কোর্টে যেতে হবে একটা পুরনো মামলায় সাক্ষী দিতে। একটা বধূনির্যাতন আর একটা চুরি, অন্তত দুটো মামলার চার্জশিট লিখে ফেলতেই হবে আজ। নানা ঝামেলায় লেখা হয়ে ওঠেনি। একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে। বড়বাবু গত রাতেও তাগাদা দিয়েছেন। বকাঝকাও করেছেন একটু।

চুরির কেসটার চার্জশিটে হাত দিতে না দিতেই ফোনের ক্রিং ক্রিং। একটু বিরক্তি নিয়েই রিসিভার কানে নিয়েছিলেন শুভজিৎ। এবং দূরভাষের অন্য প্রান্ত থেকে যা ভেসে এসেছিল, শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে কয়েক সেকেন্ডই লেগেছিল মাত্র।

—স্যার, এখানে একটা মার্ডার হয়ে গেছে।

—এখানে মানে?

—পার্ক সাইড রোড, ২৪ নম্বর। তাড়াতাড়ি আসুন স্যার... খুন...

গাড়িতে থানা থেকে দূরত্ব খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেক। আর একটা কেস সম্ভবত ঘাড়ে চাপতে যাচ্ছে, যেতে যেতে ভাবছিলেন শুভজিৎ। সব মামলায় মগজের পুষ্টি হয় না। চুরি-ছিনতাই ইত্যাদির অধিকাংশই তো 'ধর তক্তা মার পেরেক' ঘরানার তদন্ত। আর খুনের মামলা মানেই যে রহস্য হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, এমনও নয়।

দশের মধ্যে ন'টা মামলায় রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার-উত্তেজনা অনেক দূরের গ্রহ। বেশিরভাগ খুনের মামলায়

প্রথম দিনই জানা হয়ে যাচ্ছে, খুনি কে। হয় গৃহভৃত্য মনিবকে খুন করে টাকাপয়সা লুঠ করে পলাতক, নয় পুরনো শত্রুতার জেরে বন্ধুকে খুন বন্ধুর। বা, প্রত্যাখ্যান সহ্য না করতে পেরে প্রেমিকাকে খুন প্রেমিকের। রহস্য কই? শুধু ফেরার অপরাধীকে গ্রেফতার, গুচ্ছের লোকের জবানবন্দি নেওয়া, চার্জশিটে যাতে ফাঁকফোকর না থাকে, সেটা দেখা। মাথা খাটানোর মতো মামলা বছরে বড়জোর একটা-দুটো। ওই বুদ্ধি খরচ করার প্রক্রিয়াটা দারুণ লাগে শুভজিতের। ওই জন্যই তো পুলিশের চাকরিতে আসা।

ছোটবেলা থেকে গোয়েন্দা গল্পের পোকা। ফেলুদা-ব্যোমকেশের মতো একটার পর এক রহস্যের সমাধান করবেন, এমনই ভাবতেন শুভজিৎ স্কুলবেলায়। চাকরিতে এসে সাময়িক মোহভঙ্গ ঘটেছিল, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশপাতাল তফাতে। কোথায় ফেলুদার মগজাস্ত্রের রোম্যান্স, আর কোথায়ই-বা ব্যোমকেশ বক্সীর সত্যান্বেষণের রোমাঞ্চ! কল্পনার গোয়েন্দাকাহিনির গা-ছমছম উত্তেজনা যদি হয় সবুজে সবুজ ইডেন গার্ডেন্স, বাস্তবের তদন্ত তুলনায় ছিরিছাঁদহীন কাঁকরভরতি পাড়ার ফুটবল মাঠ।

ভাবনায় ছেদ পড়ে ড্রাইভারের ব্রেক কষার শব্দে। গাড়ি থেমেছে একটা জটলার সামান্য দূরে। পুলিশের গাড়ি দেখে কয়েকজনকে উৎসুক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে শুভজিৎ বোঝেন, 'স্পট'-এ পৌঁছে গেছেন।

রাসবিহারী মোড় থেকে যদি হাঁটা দেন গড়িয়াহাটের দিকে, কিছুটা এগিয়ে বাঁ হাতে পড়বে পার্ক সাইড রোড। ঢোকা যায় শরৎ বোস রোডের দিক থেকেও। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলোর দিকে একবার চোখ বুলোলেই বোঝা যায়, এ মহল্লায় উচ্চবিত্তেরই বাস প্রধানত।

বছর তিরিশের এক যুবক এগিয়ে আসেন শুভজিতের দিকে।

—স্যার, থানায় আমিই ফোন করেছিলাম। কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকি। বাজার করে ফিরছিলাম। ২৪ নম্বরের ফ্ল্যাটগুলোয় যে ছেলেটা সপ্তাহে দু'বার সিঁড়ি-টিঁড়ি ঝাঁট দিতে আসে, সেই প্রথম নেমে এসে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছিল। গন্ধ পেয়ে ওর সন্দেহ হয়েছিল। ভয়ও পেয়েছিল। অনেকবার বেল বাজিয়েও সাড়া পায়নি ভিতর থেকে। আমরা কয়েকজন গেলাম। যা বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছিল... দরজা ভেজানো ছিল, ভিতরে ঢুকে দেখলাম...

শুভজিৎ থামিয়ে দেন যুবককে।

২৪এ, পার্ক সাইড রোডের ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢোকার প্রবেশপথ

—দাঁড়ান, দেখছি।

দুটো তিনতলা বাড়ি। একটার পিছনে আরেকটা। সামনেরটা ২৪বি, পিছনেরটা ২৪এ। সামনের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ। যা পেরিয়ে পৌঁছতে হয় পিছনের ২৪এ-র সিঁড়ির কাছে। কৌতূহলী জটলা পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই গন্ধ নাকে ছিটকে আসে শুভজিতের। সেই গন্ধ, যার সঙ্গে ডাক্তার বা পুলিশের পরিচয় ঘটে যায় চাকরির শুরুতেই। একদম প্রথম দিকে গা গুলোত শুভজিতের, পচাগলা দেহ দেখলে। অবশ্য সয়েও গেছিল দ্রুত। এখন তো কিছুই মনে হয় না আর। অভ্যেস।

প্রতি তলায় একটা করে ফ্ল্যাট। তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের অর্ধেক খোলা দরজার দিকে তাকান শুভজিৎ। কেউ খুলেছিল, না কি খোলাই ছিল, খোঁজ নেওয়ার জন্য অনেক সময় পড়ে আছে। আগে তো দেখা যাক, আদৌ খুন, আত্মহত্যা, না অন্য কিছু?

ফ্ল্যাট আয়তনে বড় নয় খুব। কত হবে? সাড়ে ছ'শো স্কোয়ারফুট মেরেকেটে। একটা মাঝারি মাপের ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং, একটা শোয়ার ঘর, বারান্দা একফালি। রান্নাঘর আর বাথরুম। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবিকল নিল ডাউন অবস্থায় বসে রয়েছেন শোওয়ার ঘরে ঢোকার মুখে। বয়স মাঝপঞ্চাশ মনে হয় দেখে। আলতো পিঠ ঠেকে আছে দেওয়ালে। স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে আছেন। 'আছেন' লেখা ভুল হল, 'ছিলেন'। প্রাণহীন দেহে পচন ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা পিছমোড়া করে। মুখে কাপড়

গোঁজা। নাক থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে জমাট বেঁধেছে ঠোঁটের কোণে। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়ছে না তেমন। প্রতিরোধজনিত ক্ষত (defensive wound) অবশ্য আছে কিছু শরীরে। ছড়ে যাওয়ার দাগ, আঁচড়ের চিহ্ন কিছু। ধস্তাধস্তি হয়েছিল সম্ভবত খুনি বা খুনিদের সঙ্গে।

যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল শ্যামপ্রসাদের দেহ

ফ্ল্যাটের বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন উৎসুক, তাঁদের জিজ্ঞেস করে মৃতের পরিচয় জানলেন শুভজিৎ। শ্যামপ্রসাদ রায়। একাই থাকতেন এবাড়িতে। আরও অনেক কিছু জানার আছে। তবে তার আগে তদন্তের প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলা দরকার। বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো, ডগ স্কোয়াডকে খবর দেওয়া, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের তলব করা। এবং বড়বাবুকে ফোনে জানানো ঘটনাটা।

শ্যামপ্রসাদ রায় হত্যা মামলা। আজ থেকে এগারো বছর আগের ঘটনা। টালিগঞ্জ থানা। কেস নম্বর ২২২, তারিখ ১৬/৮/২০০৭। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায়। খুন এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা।

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ার ফ্ল্যাটে একাকী বসবাসকারী প্রৌঢ় খুন। প্রতিক্রিয়ায় যা যা হওয়ার, হল। শহরে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে কাগজে নিউজ়প্রিন্ট খরচ কিছু, এলাকায় পুলিশ পিকেট, ডিসি ডিডি, ডিসি সাউথ-সহ সিনিয়র অফিসারদের অকুস্থলে আসা একাধিকবার। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড শাখার অফিসাররা পুরো দিনটাই কাটালেন পার্ক সাইড রোডে। বিকেল নাগাদ সিদ্ধান্ত হল, আপাতত টালিগঞ্জ থানাই থাকবে তদন্তের দায়িত্বে, প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য হোমিসাইড বিভাগ তো রইলই। তদন্তভার ন্যস্ত হল শুভজিতের উপরই। শুভজিৎ সেন, টালিগঞ্জ থানার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর (বর্তমানে মেট্রো রেল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার-ইন-চার্জ)।

ময়নাতদন্তের ফল তেমনই, যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল। 'Death was due to the effects of violent Asphyxia by the process of smothering added with gagging and homicidal in nature.' মুখে কাপড় গুঁজে, চেপে ধরে, শ্বাসরোধ। মৃতদেহের কাটাছেঁড়ার পর ডাক্তারবাবু আরও জানালেন, defensive wounds দেখে যা মনে হচ্ছে, একজন নয়, প্রৌঢ়কে কাবু করতে প্রয়োজন হয়েছিল একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতির।

খুনটা কখন হয়েছিল? নির্দিষ্ট ডাক্তারি মতামত পাওয়া গেল, ময়নাতদন্তের আনুমানিক ছেষট্টি থেকে সত্তর ঘণ্টা আগে। থানায় ফোন এসেছিল ১৬ অগস্ট সকাল দশটা নাগাদ। তারপর দেহ উদ্ধারের পর পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি মিটিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। ১৭ তারিখ দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল পোস্টমর্টেম সম্পূর্ণ হতে। হিসেব করে যা দাঁড়াল, খুনটা হয়েছিল ১৪ অগস্ট সন্ধে ছ'টা থেকে রাত দশটার মধ্যে।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ফ্ল্যাটের ডাইনে-বাঁয়ে-উপর-নীচে খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও এমন কিছু পেলেন না, যা তদন্তে দিশা দেখাতে পারে। 'ডেভেলপ' করে 'ম্যাচ' করানোর মতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফুটপ্রিন্ট নেই। শোওয়ার ঘরের আলমারি হোক বা অন্যান্য আসবাবপত্র, অক্ষত। আলমারির চাবি পড়ে আছে ড্রয়ারে। খুলে দেখা হল। অবিকৃত সব কিছু। জামাকাপড় নিপাট সাজানো, হাজার চারেক টাকা পড়ে আছে। দুর্মূল্য কিছু বাড়িতে ছিল, এমন ইঙ্গিত নেই। ফ্ল্যাট বৈভবহীন। ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন, ভাবার দূরতম কারণ নেই আপাতদৃষ্টিতে।

খুন হওয়ার প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা পরে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না ঘ্রাণযোগ্য এমন কিছু, যা তদন্তে সাহায্যের হাত বাড়াবে। তবু এল পুলিশ কুকুর। নিয়মরক্ষার আসা-যাওয়া। কাজের কাজ হল না কিছু। মৃত প্রৌঢ়ের ব্যাপারে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শুভজিৎ প্রাথমিকভাবে যা জানলেন, এরকম:

শ্যামপ্রসাদ রায়ের বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। মেজোভাই সলিলপ্রসাদের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সপরিবারে অবসরজীবন কাটান চেতলার জৈনুদ্দিন মিস্ত্রি লেনে। বড়ভাই থাকেন কলকাতার বাইরে বহু বছর ধরে।

তিন ভাই যে যার নিজের মতো থাকতেন। পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ-কথাবার্তা ছিল না বললেই চলে, জানালেন সলিলপ্রসাদ। বড়ভাই অসুস্থ। খবর দেওয়া হল, কিন্তু আসতে পারলেন না। কিন্তু মৃতের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কেউ?

জানা গেল, পেশায় উকিল শ্যামপ্রসাদবাবু আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। বিবাহিত। এক মেয়ে আছে। কিন্তু প্রায় দশ-বারো বছর হয়ে গেল স্ত্রী এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন মেয়েকে নিয়ে। এখন থাকেন যাদবপুর থানা এলাকার গোলাম মহম্মদ শাহ রোডে দাদার আশ্রয়ে। মেয়ে বেহালার একটি স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। ক্লাস এইট। আইনি ডিভোর্স দু'জনের হয়নি ঠিকই, কিন্তু সম্পর্ক ছিল না কোনও উভয় পক্ষে। মৃত্যুর খবরেও এলেন না স্ত্রী, মেয়েও না।

কেন মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন শ্যামপ্রসাদের স্ত্রী কৃষ্ণা? বনিবনার অভাব কী কারণে? সদুত্তর পাওয়া গেল না সলিলবাবুর কাছে। সাফ জানালেন, ভাইয়ের ব্যক্তিজীবন নিয়ে মাথা ঘামাননি কখনও।

গোলাম মহম্মদ শাহ রোড বেশি দূরে নয়। শুভজিৎ যখন কৃষ্ণাদেবীর বাড়িতে গিয়ে অতীত দাম্পত্য নিয়ে প্রশ্ন করলেন সন্ধের দিকে, মহিলা সোজাসাপটা জানিয়ে দিলেন, 'উনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিলেন। নিজেরটার বাইরে কিছু ভাবতে পারতেন না। চেষ্টা করেছিলাম অ্যাডজাস্ট করার। একটা পর্যায়ের পর পারিনি। এর বেশি বলার কিছু নেই। বহু বছর হল কোনও যোগাযোগ ছিল না। উনি কখনও খোঁজ নেননি। আমরা মা-মেয়েও কোনও উৎসাহ দেখাইনি।'

শুভজিৎ তবু খুঁচিয়েছিলেন মহিলাকে, 'আচ্ছা ম্যাডাম, লাস্ট কোয়েশ্চেন, মানে, মিস্টার রায়ের কি চরিত্রের কোনও দোষ ছিল, আই মিন অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে...?' দৃশ্যতই বিরক্ত কৃষ্ণা থামিয়ে দিয়েছিলেন মাঝপথে। উত্তর দিয়েছিলেন কেটে কেটে, 'যতদিন একসঙ্গে ছিলাম, চোখে পড়েনি অমন কিছু। পরের কথা বলতে পারব না।' শুভজিৎ আর কথা বাড়াননি।

১৭ অগস্ট, শুক্রবার।

দেহ উদ্ধারের পরের দিনটা, সকাল থেকে সন্ধে অবধি শুভজিৎ কাটিয়েছিলেন ২৪এ এবং ২৪বি পার্ক সাইড রোডের ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। প্রত্যেকের বয়ান নিয়েছিলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। ১৪ তারিখ বিকেল থেকে রাত, কে কোথায় ছিলেন, খোঁজ নিয়েছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পাতা ভরতি হয়ে গিয়েছিল নোটবুকের। দিশা তবু ছিল দূর অস্ত। তথ্য অবশ্য মিলেছিল কিছু।

তথ্য বলতে, শ্যামপ্রসাদের বাবা সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতায় সম্পত্তি করেছিলেন প্রচুর। একাধিক বাড়ি কিনেছিলেন শহরে। তিন ভাইকে ভাগ করে দিয়েছিলেন অস্থাবর সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ হিসেবে শ্যামপ্রসাদ পেয়েছিলেন পার্ক সাইড রোডের দুটো তিনতলা বাড়ি। প্রতি তলায় একটা করে ফ্ল্যাট। মোট ছ'টা। যার পাঁচটা বেচে দিয়েছিলেন। নিজে রেখেছিলেন একটা, ২৪এ-র তিনতলা।

পাড়াপ্রতিবেশীরা শ্যামপ্রসাদকে অন্তর্মুখী প্রকৃতির মানুষ হিসেবেই জানতেন। এ পাড়ায় ছিলেন প্রায় বছর কুড়ি। কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কোর্টে যাতায়াতের পথে বা বাজারহাট করার সময় পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলেও 'কী কেমন আছেন?' আর 'হ্যাঁ, চলছে'-র গণ্ডি পেরনোয় ঘোর অনীহা ছিল ভদ্রলোকের।

নিজের মতো থাকতে ভালবাসতেন। নিজে রান্না করে খেতেন। নিজেই বাসন মাজতেন, কাপড় কাচতেন। খবরের কাগজ নিতেন না। কাজের লোক বলতে কেউ ছিল না। একজন শুধু এসে ঘরদোর-বাথরুম পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন, সপ্তাহে দু'বার। শুধু ওঁর ফ্ল্যাটের নয়, সবারই। এই সাফাইকর্মীই ১৬ অগস্ট সকালে সাফসুতরো করতে এসে দরজার বাইরে থেকে দুর্গন্ধ পান এবং হইচই করে লোক জড়ো করেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বাকি পাঁচটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কাউকে সন্দেহ করার কোনও কারণ খুঁজে

পেলেন না শুভজিৎ। তবে আরও খোঁজখবর করার আছে। একদিনে আর কী-ই বা বোঝা যায়? সোর্স লাগাতে হবে। যে যা বলেছেন সেদিন নিজের গতিবিধির ব্যাপারে, সেটা যাচাই করতে হবে।

এই যাচাই করার প্রক্রিয়াটা কী যে ভীষণ পরিশ্রমসাধ্য হত বছর বারো-তেরো আগে হলে! ভাগ্যিস মোবাইল ফোন ভারতে এসে গেছে নয়ের দশকের মাঝামাঝি, ১৯৯৫-তে। প্রাক্-মোবাইল যুগে 'অ্যালিবাই' যাচাই করতে কত না কাঠখড় পোড়াতে হত সেসময়ের গোয়েন্দাদের, ভাবলেই আঁতকে উঠতে হয় মোবাইল-উত্তর যুগের তদন্তকারীদের। যে যখন যেখানে ছিল বলেছে, সেখান থেকে অমুক সময়ে বেরিয়ে তমুক জায়গায় গিয়েছিল বলে দাবি করছে, সবটা মিলিয়ে নিতে হত জায়গায় গিয়ে, প্রত্যক্ষদর্শীদের খোঁজ করে।

আর মোবাইল এসে যাওয়ার পর? প্রযুক্তির আনুকূল্যে দ্রুত মিলবে CDR (Call Details Record) এবং টাওয়ার লোকেশন। যা নিমেষে প্রশ্নাতীত জানিয়ে দেবে, কে কখন কোথায় ছিলেন, কতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বলেছেন বা মেসেজ চালাচালি করেছেন। কেউ মিথ্যে বলার চেষ্টা করলেই চেপে ধরা যায় নিমেষে, 'টাওয়ার তো অন্য কথা বলছে!'

সন্ধেবেলা থানায় ফিরে নোটবই খোলেন শুভজিৎ। টাওয়ার সত্যিই অন্য কথা বলছে কিনা, জেনে যাওয়া যাবে স্বচ্ছন্দে। সবার মোবাইল নম্বর নিয়েছেন শুভজিৎ। পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন সংশ্লিষ্ট 'সার্ভিস প্রোভাইডার'-দের কাছে। CDR হাতে এসে যাবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। শুধু প্রতিবেশীদের নয়, আসবে শ্যামপ্রসাদের মোবাইল কলরেকর্ডও। যে বা যারাই ফ্ল্যাটে ঢুকে খুনটা করেছিল, তারা ফোনটা নিয়ে গেছে ওঁর। ফ্ল্যাটের কোথাও পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। রেকর্ডটা পেলে একটা ধারণা তো অন্তত হবে, ওঁর পরিচিত বৃত্তে কারা ছিলেন। আর কে বলতে পারে, অধরা সূত্রও চলে আসবে না হাতের মুঠোয়?

একগুচ্ছ কলরেকর্ডের পাতার পর পাতা ঘেঁটেঘুঁটে কাজের মধ্যে জানা গেল এই, প্রতিবেশীরা কেউ মিথ্যে বলেননি। যে যা বলেছিলেন ১৪ অগস্টের গতিবিধি নিয়ে, মিলছে হুবহু। এতেই যে সটান সন্দেহের বৃত্তের বাইরে ছিটকে গেলেন ওঁরা, এমন নয়। হতেই পারে, কেউ লোক লাগিয়ে খুনটা করিয়েছেন, এবং নিজের 'অ্যালিবাই' নিশ্ছিদ্র রেখেছেন। হতেই পারে, কারও সঙ্গে এমন কিছু শত্রুতা ছিল শ্যামপ্রসাদের, যা এখনও অজানা। সবে তো চব্বিশ ঘণ্টা হয়েছে।

শ্যামপ্রসাদের কলরেকর্ড বলছে, ১৪ তারিখ সকালে কোর্টে গিয়েছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ ফিরে আসেন বাড়িতে। সেই থেকে বাড়িতেই ছিলেন, বেরননি আর। গত এক মাসের কথোপকথন আর এসএমএস-এর খতিয়ান জানাচ্ছে, মোবাইলে দীর্ঘক্ষণের আলাপচারিতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কথাবার্তা মূলত পেশাগত পরিচিতির বলয়েই হত। মেসেজও যা কিছু, কাজের ব্যাপারেই। কোনও মহিলার সঙ্গে ফোন বা মেসেজ আদানপ্রদানের রেকর্ড নেই। বিপ্লব ঘোষ নামের একজনের সঙ্গে কথা বলতেন প্রায়ই, পাওয়া গেল রেকর্ড থেকে। সে-রাতেই শুভজিৎ ছুটলেন বিপ্লববাবুর কসবার বাড়িতে। যদি সূত্র মেলে কিছু।

সূত্র বলা যায় না সে অর্থে, কিন্তু একটা অজানা তথ্য পাওয়া গেল বাহান্ন বছরের বিপ্লববাবুর কাছে। ছোটখাটো ব্যবসা করেন। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সংসার। বিপ্লব জানালেন, শ্যামপ্রসাদের একটাই নেশা ছিল। ঘোড়দৌড়ের। বিপ্লববাবুও একই নেশায় আসক্ত এবং রেসকোর্সে যাতায়াতের সুবাদে ঘোড়দৌড়ের মাঠেই বছরদুয়েক আগে আলাপ শ্যামপ্রসাদের সঙ্গে। ফোনালাপ যেটুকু হত, সে ওই ঘোড়া নিয়েই। পরের শনিবারে কী কী রেস আছে, কোনটায় কোন ঘোড়া ফেভারিট, কত টাকা কোন রেসে কোন ঘোড়ার উপর লাগানো উচিত বা অনুচিত, এইসব।

রেসভাগ্য কেমন ছিল শ্যামপ্রসাদের? বিপ্লব জানালেন, ইদানীং কপাল মন্দ যাচ্ছিল শ্যামপ্রসাদের। গত কয়েক মাসে হারছিলেন লাগাতার। এবং মরিয়া হয়ে আরও বেশি টাকা লাগাচ্ছিলেন পরের রেসে। ভাগ্য তবু সহায় হচ্ছিল না কিছুতেই।

—জানেন শুভজিৎবাবু, আমি বারণ করেছিলাম। বুঝিয়েছিলাম, একটু বুঝেশুনে খেলতে। শ্যাম শুনত

না। বলত, এখানে আজ যে ফকির, কাল সে রাজা।

—শেষ কবে দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?

—লাস্ট দুটো শনিবার যাইনি। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। তার আগের শনিবার শেষ দেখা হয়েছিল। সেদিনও আমি বারবার বললাম 'প্লেস' খেলতে। কিন্তু শ্যামের জেদ, ও সেই 'উইন'-ই খেলবে।

—'প্লেস' মানে?

—ওটা রেসের মাঠের ভাষা। ধরুন ৫ নম্বর ঘোড়ার উপর 'প্লেস' খেললেন। মানে, প্রথম তিনটে 'প্লেস', ফাস্ট-সেকেন্ড-থার্ডের মধ্যে আপনার ঘোড়া থাকলে লাভ। পাঁচশো লাগিয়ে হয়তো ছ'শো-সাড়ে ছ'শো এল।

—আর 'উইন'?

—'উইন' মানে ৫ নম্বর জিতবেই ধরে আপনি টাকা লাগালেন। জিতলে লাগানো টাকা ডবল হয়ে যেতে পারে প্রায়, কিন্তু হারলে পুরো টাকাই জলে। 'প্লেস' খেললেও হারতেই পারেন, তবে ন্যাচারালি ঝুঁকি কম। কিন্তু ওই যে, শ্যামের জেদ...

—তা এত যে টাকা জলে যাচ্ছিল, সমস্যা হচ্ছিল না?

—হচ্ছিল তো। শ্যামের ওকালতির পসার তো তেমন একটা ভাল ছিল না। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ফ্ল্যাটগুলো বেচে ভালই টাকা পেয়েছিল। ব্যাংকে ছিল। সেই ভাঙিয়েই চলত। কিন্তু ওভাবে কি অনন্তকাল চলে বলুন? ইদানীং বলত, বাড়ির ছাদ আর চিলেকোঠার ঘরটা বেচে দেবে। খদ্দের খুঁজতে বলেছিল। এ নেশা ভয়ংকর নেশা শুভজিৎবাবু। কপাল খারাপ হলে রাজাকেও পথের ভিখিরি বানিয়ে ছাড়ে। কাগজে শ্যামের খবরটা দেখেছি। খুব খারাপ লেগেছে। কে মারল ওভাবে? জানতে পারলেন কিছু?

—সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। আপনার কী মনে হয়?

—আমি তো অবাক হয়ে গেছি খবরটা শুনে। শ্যামের কোনও শত্রু ছিল বলে তো মনে হয় না। টাকাপয়সাও যে অনেক ছিল, তাও নয়।

—অন্য কোনও দোষ, মানে মহিলা-টহিলা...

—দেখুন, আমি শ্যামকে দু'বছর ধরে জানি। ওঁর নারীবিষয়ে কোনও আগ্রহই ছিল না। ধ্যানজ্ঞান একটাই ছিল, রেসের মাঠ।

—একবার রেসকোর্সে যেতে চাই। কবে গেলে ভাল হয় বলুন তো? কথাটথা বলতে হবে একটু ওখানের স্টাফদের সঙ্গে।

—কালই যান না। আজ ১৭, শুক্র। কাল শনি। কাল চারটে রেস। দুপুর দুপুর চলে যেতে পারেন। আমি একজনের নাম-নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। মণিময়। ওখানের মাঝামাঝি স্তরের স্টাফ। ভাল ছেলে। আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে।

—আপনি যাবেন না কাল?

—না, কাল বাড়িতে লোকজন আসার কথা আছে কিছু। আর আমি এভরি স্যাটারডে যাইও না। শ্যাম রেগুলার ছিল। আমি মাসে বড়জোর দু'বার।

১৮ অগস্ট, শনিবার। রেসকোর্সে ভরদুপুর।

ঘোড়াগুলো ছুটছে। পাশাপাশি, ঊর্ধ্বশ্বাসে। ধুলো উড়ছে ট্র্যাকে এলোমেলো। শুরুর দিকে একে-অন্যের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলা, তিরিশ-চল্লিশ মিটার পরেই ছবিটা বদলে গিয়ে ছিটকে বেরনো তিন-চারজনের দলের। এবং ফিনিশিং পয়েন্টে সবার আগে পৌঁছনোর মরণবাঁচন দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্যালারির শব্দব্রহ্ম।

শুভজিৎ দেখতে থাকেন উদাসীন। এই প্রথম আসা রেসের মাঠে। কে জানে আর কতবার আসতে হবে? অথচ জায়গাটা কী সুন্দর! এত সবুজ চারদিকে। কী অপূর্ব লাগে এখান থেকে ভিক্টোরিয়াকে! ঘোড়দৌড়ে ন্যূনতম রুচি নেই শুভজিতের, কখনও ছিলও না। তবু ভাবেন, এই কেস মিটে গেলে এমনিই আর একদিন

এলে হয়। খুনের তদন্তে নয়। স্রেফ সবুজ শুষে নিতে। কোনও এক উইকডে-তে, যেদিন কোনও দৌড় থাকবে না।

মণিময় এসে পড়েছেন। মধ্যতিরিশের সপ্রতিভ যুবক। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। শুভজিৎ কোনও ভণিতা করেন না।

—বিপ্লববাবুর থেকে আপনার নম্বর পেয়েছি। বিপ্লব ঘোষ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, উনি ফোন করেছিলেন সকালে। শ্যামদার খুনের ব্যাপারে বলছিলেন...

—হ্যাঁ, সেই ব্যাপারেই আসা। উনি তো নিয়মিত আসতেন এখানে।

—ইয়েস স্যার, আমি এখানে বছরচারেক আছি। হি ওয়াজ় আ রেগুলার। প্রতি শনিবার দেখা হত। একটু ইনট্রোভার্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। বেশি কথা হত না।

—বুঝলাম। গত কয়েক সপ্তাহে বিশেষ কিছু লক্ষ করেছিলেন ওঁর ব্যবহারে? মানে যতটুকু কথা হত, যতটুকু বোঝা যায় বাইরে থেকে?

মণিময়ের উত্তরে স্নায়ু সামান্য সক্রিয় হয়ে ওঠে শুভজিতের।

—হ্যাঁ স্যার। বিপ্লবদা সকালে ফোন করার পর থেকেই ভাবছিলাম এটা। গ্যালারিতে আমাদের যে স্টাফরা থাকে, তারাও সবাই প্রায় চিনত শ্যামদাকে। ওরাও বলল।... জানি না এটা জরুরি কিনা...

—কী?

—তেমন কিছু নয়। আমার কাজটা বেসিক্যালি রেসের সময় গ্যালারিতে রেসকোর্সের কর্মীদের উপর খবরদারি করা। শেষ দুটো শনিবার শ্যামবাবুর সঙ্গে তিনটে ইয়ং ছেলেকে বসতে দেখেছিলাম। গল্পগুজব করছিলেন খুব। একটু অবাকই হয়েছিলাম। শ্যামবাবু তো বড় একটা মিশুকে প্রকৃতির ছিলেন না।

—তিনটে ছেলে? কেমন দেখতে? আগে দেখেছিলেন কখনও ওদের?

—স্যার, সেভাবে তো খেয়াল নেই। হাজার হাজার লোক আসে এখানে। বিপ্লবদা বললেন আর আপনি জানতে চাইছেন বলে ভেবেটেবে যেটুকু মনে পড়ছে, বয়স বেশি নয় ওদের। এই ধরুন তেইশ-চব্বিশ হবে। দু'জনের ছিপছিপে চেহারা। একজন একটু গোলগাল। মাঝারি হাইট সবার। এর বেশি মনে নেই স্যার।

যতটুকু মনে ছিল মণিময়ের, তা দিয়ে 'Portrait Parle' হয় না, হয় না চিহ্নিতকরণের জন্য ছবি আঁকানো। ছিপছিপে-গোলগাল-কমবয়সি-মাঝারি হাইট, এ দিয়ে হয়? এমন শ'খানেক লোক তো এই রেসকোর্সেই এ মুহূর্তে পাওয়া যাবে। অবশ্য চেহারার বিশদ বিবরণ পেলেই যে সূত্র মিলত কোনও, এমন না-ও তো হতে পারে। তিনটে ছেলের সঙ্গে পরপর দুটো শনিবার শ্যামপ্রসাদ গল্প করেছিলেন গ্যালারিতে, কী এমন অস্বাভাবিক? মণিময় হয়তো একটু বেশিই চিন্তা করে ফেলেছেন। এমন হয়, অভিজ্ঞতায় দেখেছেন শুভজিৎ। সবাই গোয়েন্দা হতে চায়। এবং সুযোগ পেলে কল্পনার উড়ান ব্যস্ত হয়ে পড়ে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে।

—মণিময়বাবু, চললাম আজ। একটু চোখকান খোলা রাখবেন প্লিজ়। ওই ছেলেগুলোকে আবার যেদিন দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন।

—শিয়োর স্যার।

শুভজিৎ হাঁটতে শুরু করেন রেসকোর্সের মেন গেটের দিকে। নতুন দৌড়ের প্রস্তুতি ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে। ধারাভাষ্যকার তারস্বরে উত্তেজনা আমদানি করছেন আপ্রাণ, 'There you are! Lightning speed lined up at No. 1, Whispering Beauty at number 2 and watch out for Sweet Silver at 3...'

অন্য ঘোড়া, অন্য দৌড়।

১৯ অগস্ট, রবিবার।

শুধু একটা কেস নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না থানার অফিসারদের। অন্য কেসের ডায়েরি লেখা আছে। 'ল

অ্যান্ড অর্ডার' ডিউটি আছে। রোজকার রুটিন কাজ আছে। রবিবার 'অফ' ছিল। তবু থানায় এসেছেন শুভজিৎ বকেয়া কাজ সারতে। যা যা বেরিয়ে এসেছে এখনও পর্যন্ত খুনের তদন্তে, বাকি কাজ সেরে ঠান্ডা মাথায় সাজাতে থাকেন শুভজিৎ।

এক, শ্যামপ্রসাদের চরিত্র সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে রেস ছাড়া অন্য আসক্তি ছিল না। মহিলাঘটিত কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

দুই, শ্যামবাবুর অর্থকরী সমস্যা ছিল রেসের মাঠে বেপরোয়া টাকা ওড়ানোর ফলস্বরূপ। চিলেকোঠার ঘর সহ ছাদটা বেচে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। বিলাসী জীবনযাপন করতেন না।

এই লোককে খুন করে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। ফ্ল্যাটের ফরেনসিক পরীক্ষাও বলছে, আলমারি-ড্রয়ার বা অন্য জিনিসপত্র ছোঁয়ইনি খুনি বা খুনিরা। ছোঁয়ার মতো দামি কিছু ছিলই না আদপে। 'মার্ডার ফর গেইন' হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণতম।

তিন, সন্দেহভাজনদের তালিকা তৈরি করতে গিয়েই তো হোঁচট। কাকে সন্দেহ করবেন? প্রতিবেশীদের 'অ্যালিবাই' যাচাই করা হয়ে গেছে প্রযুক্তি-প্রমাণে। বিপ্লববাবু? যা বলেছেন, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, জানাচ্ছে মোবাইল-মানচিত্র। রইল বাকি রেসকোর্সের ওই তিনটে ছেলে। যাদের সম্পর্কে ধারণা করারই অবকাশ ঘটেনি। সন্দেহ তো পরের কথা।

চার, এবং সবচেয়ে মোক্ষম চার, মোটিভ? তদন্ত দু'ভাবে হয়। 'কে' থেকে 'কেন'? আর, 'কেন' থেকে 'কে'? অনেক মামলায় সন্দেহভাজন অপরাধী ধরা পড়ে যায় ঘটনাপরম্পরায় বা তথ্যসূত্রে। অপরাধের কার্যকারণ জানা যায় জেরায়। এসব ক্ষেত্রে আগে 'কে', পরে 'কেন'। এ তদন্ত সরলরৈখিক।

জটিলতা আসে তখনই, যখন কূলকিনারা পাওয়া যায় না অপরাধীর, সংগৃহীত তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না কোনও সম্ভাব্য ইঙ্গিত। এই অবস্থাতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'মোটিভ'। 'কেন' থেকে শুরু হয় 'কে'-র সন্ধান। কেন খুন হলেন শ্যামপ্রসাদ? 'কে মারবে'-র থেকেও বড়, কেন মারবে? টাকা ছিল না, যৌন-ঈর্ষার গল্প ছিল না, ব্যক্তিগত শত্রুতারও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কোনও। তাহলে?

২০ অগস্ট, সোমবার।

অপরাধ সে যেমনই হোক, তদন্তের গতিপথ কিছু ক্ষেত্রে ধার ধারে না যুক্তি-তর্কের। তোয়াক্কা করে না প্রথাগত ব্যাকরণের। সব নিয়ম, সব পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কখনও কখনও কিনারাসূত্র অভাবিত সমাপতনে এসে পড়ে তদন্তকারীর নাকের ডগায়। শুধু সিনেমাতেই নয়, বাস্তবেও ঘটে এমন। কদাচিৎই, কিন্তু ঘটে।

সিনেমার প্রসঙ্গ উঠলই যখন, 'সোনার কেল্লা' ভাবুন। জয়পুরের রাস্তায় অটোসফরে লালমোহনবাবুর যদি চোখে না পড়ত সোনারংয়ের পাথরবাটির দোকান, যদি না দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন ফেলুদার, জয়সলমিরের কথা মাথায়ই আসত না 'সোনার কেল্লা'-র সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে। ওই চোখে পড়াটা এবং দুয়ে-দুয়ে চারের সম্ভাবনার আবছা আভাস পাওয়ামাত্র অটো থামিয়ে প্রদোষ মিত্রের নেমে পড়া, রহস্যভেদে অন্যতম প্রধান deductive moment ওটাই। 'Hajra' আর 'Hazra'-র তফাত তো আরও পরে। সার্কিট হাউসে, দুম করে ডক্টর হাজরার মুকুলকে নিয়ে বারমের রওনা হয়ে যাওয়ার খবর মন্দার বোসের থেকে পাওয়ার পর।

রক্তমাংসের গোয়েন্দাদের ভাগ্যে এহেন মুহূর্ত উদয় হয় কালেভদ্রে। কিন্তু যখন হয়, তখন 'কোথা হইতে কী হইয়া' যায়, হার মেনে যায় কল্পনার রহস্যকাহিনিও। ঠিক যেমনটা ঘটল ২০ অগস্টের সন্ধেয়।

রবিবার সারাদিন কাজ করেছেন। সোমবারও সাততাড়াতাড়ি এসেছেন থানায়, ডিসি সাউথের মাসিক ক্রাইম কনফারেন্সের প্রস্তুতি-পরিসংখ্যান তৈরি করতে সাহায্য করেছেন ওসি-কে। বড়বাবু সদয় হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন সন্ধের মুখে, 'বাড়ি যাও আজ। অত চাপ নেওয়ার কিছু নেই। সব কেস সাতদিনের মধ্যেই ক্র্যাক করতে হবে, এমন কথা নেই। দেখা যাক আর কয়েকদিন। ডিসি ডিডি ফোন করেছিলেন একটু আগে। ডেভেলপমেন্ট কিছু হল কিনা, জানতে চাইছিলেন।'

থানা থেকে বেরিয়ে মন একটু খারাপই হয়ে যায় শুভজিতের। গোয়েন্দাপ্রধানের এই 'জানতে চাওয়া'-র অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। অগ্রগতি যদি দ্রুত না হয়, লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগ দায়িত্ব নেবে তদন্তের। স্বাভাবিক, এটাই প্রথা। হইচই ফেলে-দেওয়া মামলায় দ্রুত কিনারা থানাস্তরে সম্ভব না হলে এটাই হয়ে থাকে।

শুভজিৎ থাকতেন উলটোডাঙার পুলিশ আবাসনে। বাড়ি থেকে থানায় যাতায়াত মোটরসাইকেলে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে গিরিশ পার্কের কাছাকাছি পৌঁছনোর সময় শুভজিতের মনে হল, একবার সুরজিতের ঠেকে এক কাপ চা খেয়ে ফেরা যাক। একটু আড্ডা দিলে মাথাটা হালকা হতে পারে।

সুরজিত রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় শুভজিতের। ভদ্রলোক বেশ কিছুটা ছোট বছর চল্লিশের শুভজিতের থেকে। গিরিশ পার্ক এলাকায় একটা শরীরচর্চার আখড়া চালান। যেখানে রোজ সন্ধেয় ছেলেছোকরারা আসে ঘাম ঝরাতে। সুরজিতের গ্রহরত্নের কারবারও আছে একটা। খুব বড়সড় কিছু ব্যবসা নয়, মাঝারিই। সুরজিতের ঠেকে মাঝে মাঝে অফিসফেরত ঢুঁ মেরে একটু গল্পগুজব করে আসেন শুভজিৎ।

—আরে শুভজিৎদা, অনেকদিন পরে? খবর কী?

—এই তো, চলছে ভাই। আসা হয়নি মাসখানেক হল, ভাবলাম একটু চা খেয়ে যাই।

—বেশ করেছ, কিন্তু তোমাকে এত উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ঠিক আছে তো?

—শরীর তো ঠিকই আছে, মনটাই বিগড়ে আছে। একটা খুনের মামলা নিয়ে ফেঁসে আছি। একজন বয়স্ক মানুষ নিজের ফ্ল্যাটে...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজে দেখেছি। ওটা তুমি ইনভেসটিগেট করছ?

—আর বলো কেন? তিনদিন হয়ে গেল, কোনও লিড নেই।

—সবে তো তিনদিন, পেয়ে যাবে ঠিক।

—সব অ্যাঙ্গল মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। তবু এগোনো যাচ্ছে না। এসব মামলায় কী জানো, শুরুর দিকে 'লিড' পেয়ে গেলে ভাল। যত দেরি হয়, তত মুশকিল হয়ে যায়। একটা কেসের উপরই তো আর দিনের পর দিন ফোকাস করা যায় না।

—হুঁ, নাও, চা খাও।

চায়ের কাপে আনমনা চুমুক দেন শুভজিৎ। চানাচুরের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন সুরজিৎ।

—অত চিন্তা কোরো না। হয়ে যাবে ঠিক। এক এক সময় লাক খারাপ যায়।

—যা বলেছ। কপাল খারাপ। নির্ঘাত রাহুর দৃষ্টি পড়েছে, বুঝলে? দাও না একটা ভাল দেখে আংটি-টাংটি।

সুরজিৎ হেসে ফেলেন।

—সে না হয় দেব দেখেশুনে। আংটির কথায় মনে এল, যা দিনকাল পড়েছে! সেদিন যা কাণ্ড হল...

—কী?

—আর বোলো না। এই তো দিনতিনেক আগে হবে, দুটো ছেলে একটা আংটি নিয়ে এখানে এসে বলে কী, 'এটার দাম এক কোটি টাকা। আপনার তো স্টোনের ব্যবসা আছে। খদ্দের জোগাড় করে দিতে পারেন?'

—কোটি টাকা?

—আরে, আমি তো হাঁ! বলে কী! আংটিটা অবশ্য সত্যিই অন্যরকম দেখতে। কারুকাজ আছে অনেক। মধ্যের পাথরটা বেশ বড়, আর খুব ঝকমকে। দেখলে হিরে বলে ভুল হতে পারে। তবে হাতে নিয়ে একটু উলটেপালটে দেখেই বুঝলাম, খুব দামি কিছু নয়। হিরে তো নয়ই। দাম মেরেকেটে ওই দশ-বিশ হাজার হতে পারে ম্যাক্সিমাম।

আংটির গল্পে কোনও উৎসাহ পান না শুভজিৎ। স্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই বলেন, 'তারপর?'

—তারপর আর কী? বললাম, 'ভাই, এর দাম এক লাখও হবে না, কোটি তো অনেক দূরের ব্যাপার। বড়জোর হাজার দশেক পেতে পারো।' শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু'জন। বললাম, 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

—কী বলল?

—কিছু বলল না। হনহন করে বেরিয়ে গেল।

—চোরাই মাল হতে পারে। কোথাও থেকে হাতিয়েছে, তারপর এখানে-সেখানে আগডুম-বাগডুম দাম হেঁকে বাজিয়ে দেখছে।

—দেখেশুনে কিন্তু চোর মনে হয়নি। ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হল।

—আগে দেখেছ ওদের? মানে আগে এসেছিল কখনও এখানে?

—না না, আগে দেখিনি। কেন?

—না, এমনিই। চেহারার ডেসক্রিপশনটা ভাল করে জেনে নিতাম আর কী, ডিডি-তে একটা anti-fraud সেকশন আছে, ওরা এসব গ্যাং-এর ব্যাপারে খবরটবর রাখে, জাস্ট বলে রাখতাম। যাক গে ছাড়ো, উঠি আজ...

—আমার তো খুব ডিটেলে মনে নেই, তবে দাঁড়াও দাঁড়াও, সাত্যকিকে ডাকি। সাত্যকির সঙ্গেই তো এসেছিল ওরা। সাত্যকি, এই সাত্যকি!

লাগোয়া ঘরটায় চলছিল যুবকদের রোজকার শরীরচর্চা। সেখান থেকে সাড়া দেয় এক যুবক।

—হ্যাঁ সুরজিৎদা ...

—আয় না একবার এখানে...

পুলিশের পোশাকে শুভজিৎকে দেখে হঠাৎই একটু থমকে যায় যুবক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সুরজিতের দিকে।

—হ্যাঁ রে, ওই সেদিন তোর সঙ্গে দুটো ছেলে এসেছিল না... ওই যে রে, আংটি নিয়ে একটা...

'আংটি' শব্দটা সুরজিৎ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চোখমুখ সাদা হয়ে যায় সাত্যকির। শুভজিৎ লক্ষ করেন, হাত-পা কাঁপছে ছেলেটির। কী হল হঠাৎ? সুরজিৎও ঘাবড়ে যান সাত্যকির চেহারা দেখে।

—শরীর খারাপ লাগছে নাকি রে? ইনি টালিগঞ্জ থানার অফিসার, ওই ছেলেদুটোর ব্যাপারে জানতে চাইছিলেন।

বলতে না বলতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে সাত্যকি। কান্নায় জড়িয়ে যায় ভয়ার্ত গলার স্বর।

—স্যার... আমি যাইনি সেদিন। খুনে আমি ছিলাম না! বিশ্বাস করুন, আমি যাইনি ওদের সঙ্গে! ওরা মেরেছে।

শুভজিৎ শুনলেন, এবং উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। ক্লান্তি অন্তর্হিত। শ্রান্তি নিরুদ্দেশ। খুন? ওরা? সেদিন? সুরজিৎ কিছু বলতে যাওয়ার আগেই থামিয়ে দিলেন।

—সুরজিৎ, বাকিদের চলে যেতে বলো আজ। আরেক কাপ চা হলে ভাল হয়। এই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার আছে। সময় লাগবে।

সময় লাগল না বেশি। পরের যে বাক্যটি সাত্যকির মুখ থেকে বেরল, তাতে শুভজিৎ বুঝলেন, শ্যামপ্রসাদ হত্যা মামলা গোয়েন্দাবিভাগের হাতে যাচ্ছে না। ভাগ্য ফেরাতে আংটিরও প্রয়োজন পড়ছে না আপাতত।

—স্যার, ওরাই বলেছিল, আংটির খদ্দের খুঁজে দিতে। আমি সুরজিৎদার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। ওরা বলেছিল, শ্যামদার আংটিটার দাম নাকি এক কোটি। কিন্তু আমি যাইনি স্যার সেদিন, খুনে আমি ছিলাম না।

সাত্যকি মল্লিক। বয়স বছর চব্বিশ। মধ্য কলকাতার পোস্তা এলাকার বনেদি এবং সম্পন্ন পরিবারের সন্তান।

আশৈশব সঙ্গী থেকেছে সচ্ছলতা। স্কুলজীবন কেটেছে পার্ক সার্কাসের ডন বসকোতে। সপ্রতিভ চেহারা, কথাবার্তায় চৌকস।

স্কুল-কলেজের পাট চোকানোর পর আপাতত কর্মহীন। কিন্তু বেকারত্ব কোনও আঁচড় বসাতে পারেনি আয়েশি জীবনযাপনে। অফুরান হাতখরচা, যার অর্ধেক ব্যয় হত ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে খানাপিনায়, আর বাকি অর্ধেক রেসের মাঠে।

যে দুই বন্ধু নিয়মিত সাত্যকির সঙ্গী হত ঘোড়দৌড়ের মাঠে, তাদের মধ্যে একজনের নাম অরিন্দম। অরিন্দম ঘোষ ওরফে বাবলা। বয়স ২৬, টালিগঞ্জ রোডের বাসিন্দা। বিবাহিত, স্ত্রী এবং দেড় বছরের কন্যাসন্তান আছে। উপার্জন? টুকটাক জমি-বাড়ির দালালি করে যতটুকু হয়। অর্থাভাব ছিল। চটজলদি বড়লোক হওয়ার বাসনাও। অরিন্দমও ডন বসকোরই প্রাক্তনী।

রেসের মাঠে সাত্যকি-অরিন্দমের অন্য সঙ্গীর নাম অম্লান দত্ত। বয়স সবে কুড়ি পেরিয়ে একুশ। বাড়ি রসা রোডে। বেকার। অরিন্দম ঘোষের বন্ধু একসঙ্গে ফুটবল খেলার সূত্রে। পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন অম্লান। 'বাবার হোটেলেই' দিন গুজরান। বাকি দু'জনের পকেটের জোর ছিল না, সাত্যকিই জোগাতেন ফুর্তির রসদ। পোস্তা এলাকার তারাসুন্দরী পার্কে নিয়মিত আড্ডা বসত ত্রয়ীর। আর মাসে অন্তত দুটো শনিবার গন্তব্য ছিল রেসকোর্স।

রেসকোর্সেই ত্রয়ীর আলাপ শ্যামপ্রসাদ রায় বা 'শ্যামদা'-র সঙ্গে। কথায় কথায় একদিন শ্যামপ্রসাদ তিনজনকে বলেন, তাঁর কাছে একটা বহুমূল্য আংটি আছে। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। 'অ্যান্টিক ভ্যালু' প্রচুর এ আংটির। আংটির মধ্যে একটা দুর্মূল্য পাথর বসানো। ওই পাথরের জন্যই আংটিটার দাম প্রায় এক কোটি। একা মানুষ, বয়স হয়েছে। আজ আছেন, কাল নেই। আংটিটা বিক্রি করে দিতে চান এবার, খদ্দের খুঁজছেন। আশি-নব্বই লাখ পেলেও দিয়ে দেবেন।

প্রথমে বিশ্বাস হয়নি সাত্যকি-অরিন্দমদের। এত দামের আংটি আবার হয় নাকি? শ্যামপ্রসাদ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে বলেন, 'তোমরা বাড়িতে এসো একদিন। দেখলে বুঝবে।'

—দেখে কী বুঝেছিলে?

বিধ্বস্ত সাত্যকির কাছে জানতে চান শুভজিৎ।

—বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজন। দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল স্যার। সত্যিই অমন আংটি দেখিনি আগে। শেপটা hexagonal, মধ্যের পাথরটা থেকে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম, শ্যামদা নির্ঘাত দামটা বেশি বাড়িয়ে বলছে, তবে এর দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ হতেই পারে।

—তারপর?

—বলছি স্যার। আমরা সন্ধেবেলা পোস্তার পার্কে আড্ডা দিতাম প্রায় রোজ। সঞ্জয়দাও থাকত।

—কে সঞ্জয়?

—সঞ্জয়দা। ব্যান্ডেলের ছেলে। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। বড়বাজারে আসত টুকটাক ব্যবসার কাজে। এখানে ওর এক আত্মীয়ের বাড়িও আছে। পার্কেই আলাপ।

—বেশ...

—সঞ্জয়দাকে বললাম। সব শুনে বলল, 'এক কোটি হয়তো হবে না, কিন্তু যদি ধর পঁচিশ-তিরিশ লাখও হয়, আংটিটা হাতাতে পারলে আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে। তোরা ভদ্রলোককে বল, এখানে আংটিটা নিয়ে আসতে কোনও একদিন। বল, কাস্টমার পাওয়া গেছে। আংটি দেখতে চাইছে। আমি লোক ফিট করছি, যারা রাস্তায় ছিনতাই করে নেবে আংটিটা। নিয়ে পরে আমাদের দিয়ে দেবে। আর আমরাও কেস খাব না। ছিনতাই যারা করবে, তাদের কয়েক হাজার টাকা ঠেকিয়ে দেব।'

—তারপর?

—শ্যামদাকে রেসকোর্সে বললাম একদিন। উনি বললেন, অত দামি জিনিস বাইরে নিয়ে বেরবেন না।

কাস্টমারকে বাড়িতে আসতে বলো।

—তোমরা কী করলে এরপর?

—সঞ্জয়দা সব শুনে বলল, 'এক কাজ কর। চল, ওঁর বাড়ি যাই। আমি কাস্টমার সাজব। আমাকে তো চেনে না। ভালয় ভালয় দিলে ভাল, নয় তো কেড়ে নেব। আংটিটা পেলে লাইফ বদলে যাবে আমাদের।'

—হুঁ...

—রেসকোর্সে শ্যামদার সঙ্গে দেখা হল গত শনিবার।

—মানে ১১ তারিখ?

—তাই হবে স্যার, তারিখ মনে নেই। শ্যামদাকে বললাম, 'কাস্টমার পাওয়া গেছে। আপনার বাড়িতে আনব?' উনি বললেন, 'ঠিক আছে। মঙ্গলবার বিকেলে আনো।'

—মানে চোদ্দো তারিখ।

—তাই হবে স্যার। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না শুরু থেকেই। আমি বলে দিয়েছিলাম, যেতে পারব না। নেমন্তন্ন আছে। আমি যাইনি স্যার।

—যাওনি?

—না স্যার, বিশ্বাস করুন। সঞ্জয়দা আরও চারজনকে জুটিয়েছিল।

—কোন চারজন?

—বলছি। কালো স্যান্ট্রো করে ওরা শ্যামদার বাড়ি গিয়েছিল স্যার। আগের রাতে পার্কে সব কথা হয়েছিল। পোস্তাতে একজন ব্যবসায়ী আছে। রাজেশ নাম। ওর ড্রাইভারের নাম রাম। ওই গাড়ি করে শ্যামদার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

—চারজনের একজন হল, বাকি তিন?

—দু'জনের নাম বিজয়। একজন বিজয় রায়। হাওড়ায় বাড়ি। লিলুয়া বোধহয়। আরেকজনের পদবি সিং। বিজয়বাহাদুর সিং। বড়বাজারে শাড়ির দোকানে অর্ডার সাপ্লাই করে। সঞ্জয়দা চিনত এদের।

—আরেকজন?

—অমিত নাম। কী করে জানি না। ওরা জানে। আগে এক-দু'বার দেখেছি। কাছেপিঠেই থাকে। এগজ্যাক্ট জানি না।

নির্দিষ্ট ভাবে সব জানার দরকারও ছিল না আর। সাত্যকির থেকে শুভজিৎ নিয়ে নিলেন অম্লান-সঞ্জয়-অরিন্দম ঘোষের মোবাইল নম্বর। কাজ বলতে বাকি ছিল একে একে সাতজনকে ধরা। সে-রাতে আর বাড়ি ফেরা হল না শুভজিতের। ফিরলেন থানায়। প্রথমেই হানা দিলেন টালিগঞ্জে অরিন্দম ঘোষের বাড়ি। বাড়িতে নেই। অরিন্দমের বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেকটর। জানতে চাইলেন শান্ত ভাবে, 'বাড়িতে পুলিশ কেন?' সব শুনে ততোধিক শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে জানতাম এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। কোথায় আর যাবে? আশেপাশেই থাকবে। রাত দেড়টা-দুটোর আগে তো বাড়ি ফেরে না। ফোন নম্বরটা দিয়ে যান আপনার, বাবলা বাড়ি ফিরলেই খবর দেব।'

—একটা ছবি পাওয়া যাবে আপনার ছেলের?

বিনা বাক্যব্যয়ে ছেলের ছবি এনে শুভজিতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অরিন্দমের বাবা। বাড়ি ফেরার আগেই ধরা পড়ল অরিন্দম। ফোনের উপর প্রযুক্তি-প্রহরা চালু হয়ে গিয়েছিল সে-রাতেই, জানা যাচ্ছিল গতিবিধি। ভবানী সিনেমা থেকে নাইট শো দেখে বেরনোর মুখে ধরা হল। টালিগঞ্জ থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলল রাতভর। খুনের বৃত্তান্ত জানা গেল বিস্তারিত।

ছকের আসল কারিগর ছিলেন ব্যান্ডেলের সঞ্জয় ব্যানার্জি। তারাসুন্দরী পার্কের আড্ডায় অরিন্দমদের কাছে আংটি-বৃত্তান্ত শোনার পর সঞ্জয়ই মাথায় ঢোকান বাকিদের, আংটিটা হাতাতে পারলে সারা জীবন আর কারও

কোনও চিন্তা থাকবে না। সঞ্জয়ই জুটিয়েছিলেন কুকর্মের আরও চার শরিককে।

বিজয়বাহাদুর সিং ওরফে বাদল, বড়বাজারের একটা শাড়ির দোকানের অস্থায়ী কর্মী। লিলুয়ার বিজয় রায়, যার বড়বাজারেই ফলের রসের ছোট দোকান। হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিটের বাসিন্দা কুড়ি বছরের বেকার যুবক অমিত সিং। এবং যেহেতু কাজ হাসিল করার পর পালাতে হবে দ্রুত, গাড়ি দরকার। স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজেশ প্রসাদের ড্রাইভার রামকুমার মণ্ডলকে লোভ দেখিয়ে দলে টেনেছিলেন সঞ্জয়।

চিত্রনাট্য ছিল এরকম— শ্যামপ্রসাদ কোর্ট থেকে সাধারণত ফিরে আসেন পাঁচটার মধ্যে। সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে মালিকের কালো স্যান্ট্রো গাড়ি নিয়ে রামকুমার পৌঁছবে পার্কের কাছে। মালিককে আগের রাতে বলে রাখবে গাড়ি সার্ভিসিং-এর কথা। বাকিরা অপেক্ষা করবে পার্কে।

পৌনে পাঁচটার মধ্যে রাসবিহারী মোড়ের কাছে পৌঁছনো হবে। পৌনে ছ'টা থেকে ছ'টার মধ্যে এক এক করে সবাই পৌঁছে যাবে তিনতলায় শ্যামপ্রসাদের ফ্ল্যাটের সামনে। রামকুমার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবেন শরৎ বোস রোডের মুখে। সঞ্জয় যাবেন 'কাস্টমার' সেজে। আংটিটা দেখতে চাইবেন। এবং কিছুক্ষণ 'নাম-কা-ওয়াস্তে' দরদামের পর বলবেন, বাইরে ভাল দোকান থেকে যাচাই করে দু'-একদিন পরে আংটি ফেরত দিয়ে যাবেন। জানা কথা, শ্যামপ্রসাদ এ প্রস্তাবে রাজি হবেন না। তখন জোর করে কেড়ে নিতে হবে আংটি।

অরিন্দমকে বয়ানের মাঝপথেই থামান শুভজিৎ।

—শুধু কেড়ে নিয়ে পালালে তো সেটা একরকম হত। কিন্তু খুন...

—না স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম, আংটি নিয়ে পালিয়ে যাব। সঞ্জয়দা আর অম্লান যে অন্য প্ল্যান করেছে, ব্যাগে করে নারকেল দড়ি আর মুখে গোঁজার কাপড় নিয়ে গেছে, জানতাম না। বোকার মতো গেলাম ওদের সঙ্গে, ভুল হয়ে গেছে স্যার। সাত্যকি কিছু একটা আঁচ করে আগের রাতে আমাকে বলেছিল, 'যাস না বাবলা, এই সঞ্জয় লোকটা ক্রিমিন্যাল টাইপের মনে হচ্ছে। উলটোপালটা কিছু করলে ফেঁসে যাব।'

—বন্ধুর কথা শুনলে খুনের দায়ে জেল খাটতে হত না, এখন বলে আর কী লাভ?

—স্যার, ও কিছুতেই যেতে রাজি হল না। নেমন্তন্ন আছে বলে কাটিয়ে দিল। বলল, টাকার ভাগ লাগবে না ওর। বড়লোকের ছেলে, টাকার অভাব নেই। আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। সঞ্জয়দা বলেছিল, এক একজনের ভাগে কম করে পাঁচ-সাত লাখ করে পড়বে। টানাটানির সংসার, জমির দালালি করে আর কত হয়? বাবার পেনশনের টাকাতেই সংসারটা চলে। কিন্তু শ্যামদাকে খুন করার কথা কখনও মাথায় ছিল না, বিশ্বাস করুন।

—মাথায় এসেছিল কি না সেটা তো এখন আর জরুরি নয়...

—আমার কথাটা একটু শুনুন স্যার সঞ্জয়দা আংটিটা হাতে নিয়ে শ্যামদাকে বলল, 'দাদা,

দু'-একদিন পরে ফেরত দিয়ে যাব এটা। টাকাপয়সার কথা সেদিনই ফাইনাল করব। আগে তো দেখি সত্যিই যত বলছেন, তত দাম কিনা।' শ্যামদা এই শুনেই রেগে আগুন হয়ে চিৎকার শুরু করল, 'চালাকি পেয়েছেন? ফেরত দিন আমার জিনিস। আমি বিক্রি করব না আংটি।'

—তারপর কী হল?

—আমার দিকে তাকিয়ে শ্যামদা বলল, 'এসব কী ব্যাপার অরিন্দম? এ কেমন কাস্টমার নিয়ে এসেছ? আর এত লোক নিয়েই বা এসেছ কেন?'

—তারপর?

সঞ্জয়দা ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্যামদার উপর। ওর সঙ্গে অম্লান-অমিত আর দুই বিজয়। আমিও যোগ দিলাম স্যার। তখনও ভাবিনি, শ্যামদাকে মেরেই ফেলা হবে। সঞ্জয়দা বলতে থাকল, 'একে বাঁচিয়ে রাখলে আমাদের সর্বনাশ হবে। পুলিশকে সব বলবে। ধরা পড়বই কাল নয় পরশু।' আমি ভাবলাম, ঠিকই তো বলছে... তারপর তো জানেন স্যার, সবাই মিলে হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে...

—আংটিটা কোথায়? আর শ্যামবাবুর মোবাইল?

—মোবাইলটা ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলেছিল সঞ্জয়দা। বলেছিল, 'এটা রাখা রিস্কি। পুলিশ ক্লু পাবে।' আংটি সঞ্জয়দার কাছে আছে। পরদিন সকালে সাত্যকি সব শুনে বলল, 'তোকে আগেই বলেছিলাম বাবলা, যাস না। এখন তো পুলিশ পিছনে লেগে যাবে।' অম্লান আর আমি বললাম, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। আংটিটা বেচে টাকা যা পাব, নিয়ে পালিয়ে যাব কলকাতার বাইরে।' সাত্যকি যেখানে জিম করতে যেত, তার মালিকের জেম-জুয়েলারির কারবার ছিল। বললাম, একবার আংটিটা ওঁকে দেখানোর ব্যবস্থা করতে।

—সাত্যকি রাজি হল?

—প্রথমে হচ্ছিল না। আমরা জোরজার করায় নিমরাজি হল। পরদিন সন্ধেয় আংটিটা নিয়ে গেলাম। জিমের মালিক ভদ্রলোক দেখেশুনে বললেন, দাম বড়জোর হাজার দশেক হবে। আমরা চলে এলাম মন খারাপ করে। বুঝলাম, শ্যামদাই কোনও শাঁসালো খদ্দেরকে ঠকানোর মতলব এঁটেছিল আমাদের থ্রু দিয়ে।

—এরপর?

—সঞ্জয়দা সন্ধেবেলা পার্কে এসেছিল। বললাম সব। শুনে বলল, 'আমাকে আংটিটা দে। ব্যান্ডেলে ভাল দোকান আছে। আমি ওখানে দেখাব আংটিটা।' দিয়ে দিলাম। তারপর থেকে সঞ্জয়দার সঙ্গে কথা হয়নি আর। ফোন বন্ধ।

রাজকুমার, অমিত, বিজয়বাহাদুর এবং বিজয় রায়, এই চারজনকে ধরাটা কষ্টসাধ্য হল না বিশেষ। এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রেফতার হল। সঞ্জয় ছিলেন ধূর্তচূড়ামণি। কাগজে বেরিয়েছিল খুনের কিনারার খবর। জানতেন, পুলিশ হানা দেবেই ব্যান্ডেল স্টেশন রোডের বাড়িতে। পালিয়েছিলেন, মোবাইল দিনভর বন্ধ রাখতেন। চালু করতেন দিনে এক বা দু'বার। সঞ্জয়ের বাড়ি থেকে জোগাড় করা হয়েছিল ছবি। যা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সোর্সদের মধ্যে।

আংশিক প্রযুক্তি-সূত্র, আংশিক সোর্সের খবরের ভিত্তিতে সঞ্জয় ধরা পড়লেন ৮ সেপ্টেম্বর। আমহার্স্ট স্ট্রিটের 'ক্রাউন লজ' থেকে। যেখানে 'মনোজিৎ ব্যানার্জি' নামে উঠেছিলেন ৬ সেপ্টেম্বর। আসাম থেকে আসা ব্যবসায়ীর পরিচয়ে।

আংটি পাওয়া গেল না সঞ্জয়ের কাছেও। গেল কোথায়? সঞ্জয়ের বয়ান, 'আমি দু'-একটা দোকানে যাচাই করে দেখেছিলাম স্যার। বলল, পাথরটা দেখতেই দামি হিরের মতো। হিরে নয়। ভাবলাম, আরও কয়েকটা জায়গায় দেখাব। তার মধ্যেই কাগজে দেখলাম, বাবলা ধরা পড়ে গেছে। আংটিটা বেচা রিস্কি হয়ে যেত। নিজের কাছে রাখলেও প্রমাণ থেকে যেত। গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলাম স্যার।'

প্রত্যক্ষদর্শীহীন অপরাধ। পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানের অকাট্য প্রমাণমূল্য নেই আদালতে। যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সমর্থন থাকে ঠাসবুনোট। শুভজিতের পেশ করা চার্জশিটে ঘটনা-পরম্পরা উঠে এল চিত্রবৎ।

বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল রাজেশ প্রসাদের কালো স্যান্ট্রো গাড়িটা। রাজেশ নিজের সাক্ষ্যে জানালেন, গাড়িটা সার্ভিসিং-এর অজুহাতে ১৪ অগস্ট নিয়ে বেরিয়েছিলেন রামকুমার। সাত্যকি মল্লিক বিচারকের কাছে জবানবন্দি দিলেন (judicial confession, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারায়)। যাতে ধরা থাকল শ্যামপ্রসাদের সঙ্গে রেসের মাঠের আলাপ হওয়া থেকে শুরু করে আংটি হাতানোর পরিকল্পনা, সব। সুরজিৎ আদালতে চিহ্নিত করলেন অরিন্দম ঘোষ এবং অম্লান দত্তকে। আমহার্স্ট স্ট্রিটের 'ক্রাউন লজ' থেকে বোর্ডার্স রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যেখানে 'মনোজিৎ ব্যানার্জি' নামে সই করেছিলেন সঞ্জয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সে হস্তাক্ষর মিলে গিয়েছিল ধৃত সঞ্জয়ের থেকে সংগৃহীত হাতের লেখার নমুনার সঙ্গে।

অন্যতম অভিযুক্ত সঞ্জয় ব্যানার্জির হস্তাক্ষরের নমুনা, যা পাঠানো হয়েছিল ফরেনসিক পরীক্ষায়

কেউ কি দেখেছিলেন সেদিন ধৃতদের শ্যামপ্রসাদের বাড়িতে ঢুকতে? রহস্যভেদের পর অনেক খুঁজেছিলেন শুভজিৎ। ঢুকতে দেখেছিলেন, এমন কাউকে পাওয়া না গেলেও খোঁজ মিলেছিল এক স্থানীয় বাসিন্দার। যিনি অরিন্দম ঘোষকে চেনেন দীর্ঘদিন, একই এলাকায় থাকার সুবাদে। পার্ক সাইড রোডের কাছেই কারমেল স্কুল। বিকেলবেলা স্কুলছুটির পর মেয়েকে নিয়ে ফিরছিলেন স্কুটারে করে। পার্ক সাইড রোডের মুখে সাড়ে চারটে-পৌনে পাঁচটা নাগাদ অরিন্দম এবং অন্যদের একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। পাশে পার্ক করা ছিল সেই কালো স্যান্ট্রো। কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী রে বাবলা, এখানে এখন?' অরিন্দম বলেছিলেন, 'এই তো ইভনিং শো-তে মেনকায় সিনেমা দেখতে যাব আজ।' গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল এই সাক্ষ্য। যাতে সঙ্গত করেছিল ধৃত সাতের সেদিনের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন, বিকেল পৌনে পাঁচ থেকে সাড়ে ছ'টার।

বিচারপর্বে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন অভিযুক্ত সাতজন। অরিন্দম-অম্লান-সঞ্জয়, অমিত-বিজয় রায়-রাম কুমার-বিজয়বাহাদুর সিং। দণ্ডাদেশ? যাবজ্জীবন কারাবাস। এখনও জেলেই দিনযাপন।

বিচারসিদ্ধান্তের অংশ

মার্ক টোয়েন লিখেছিলেন, 'Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't.'

খাঁটি কথা। 'সত্যি' সত্যিই হার মানায় বাস্তবকে, ফিকশনকে বলে বলে গোল দিতে পারে কখনওসখনও। কল্পকাহিনির লক্ষ্মণরেখা চিহ্নিত থাকে সম্ভাব্যতার সীমায়। বাস্তবের সে দায় নেই। থাকলে এভাবে প্রাণ যায় শ্যামপ্রসাদের? এভাবে জেলকুঠুরিতে পচতে হয় সাতজনকে? অর্থলিপ্সা ছিল উভয়তই। যিনি খুন হলেন, তাঁর। যারা খুন করেছিল, তাদেরও।

স্নেহ অতি বিষম বস্তু। লোভ বিষমতর।

পুনশ্চ: সাত্যকি মল্লিক এবং সুরজিৎ রায়, এই দুটি নাম পরিবর্তিত। ওঁরা জীবিত। ওঁদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে এই কেস নিয়ে কৌতূহলী প্রশ্ন আর অহেতুক বিড়ম্বনার আবির্ভাব হোক এত বছর পরে, অভিপ্রেত নয়, তাই।

বিশ্বাসই বিশ্বাসঘাতক

দরজাটা বন্ধ কেন? মঞ্জুদির তো খুলে বেরিয়ে আসার কথা, বেরিয়ে দাঁড়ানোর কথা দরজার মুখে। এমনটাই তো হয়ে আসছে এতদিন ধরে। আজ অন্যথা কেন? কেউ আছে ভিতরে? সামান্য থমকান ডলি। একটু ইতস্তত করেন। বেল বাজান। উত্তর নেই কোনও। সামান্য জোরেই ডাক দেন এবার।

—মঞ্জুদি?

সেকেন্ড পাঁচেক পরেও যখন আওয়াজ নেই কোনও ঘরের ভিতর থেকে, গলা আর একটু চড়ান ডলি।

— মঞ্জুদি.. আমি ডলি। মঞ্জুদি...?

কী হল? এমন তো হওয়ার কথা নয়। মঞ্জুদি সাড়া দিচ্ছে না কেন? শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। মাথা-টাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেল? নাকি পেনশন তুলতে বেরিয়েছে? কিন্তু সে তো দিনচারেক আগেই তুলে এনেছে ব্যাংক থেকে। তা ছাড়া বেরলে তো দরজায় তালা দেওয়া থাকবে। নেই তো! উদ্বিগ্ন ডলির কী মনে হয়, দরজায় সামান্য চাপ দিয়ে দেখেন। এবং খুলে যায় অর্ধেকটা, ওই সামান্য চাপেই। দরজাটা খোলাই ছিল, ভেজানো। ডলি দ্বিধা কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই সামান্য একচিলতে জায়গা। পেরিয়ে বাঁ দিকে একটা শোওয়ার ঘর। খোলা। কেউ নেই ভিতরে। বিছানাটা ওলটপালট অবস্থায়। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ভয় পেয়ে যান ডলি। মঞ্জুদি কোথায়?

এ ফ্ল্যাটে সে-অর্থে ড্রয়িংরুমের কোনও বালাই নেই। ডানদিকে একটা ছোট প্যাসেজ। বাথরুম-রান্নাঘর ছাড়া আরেকটা শোওয়ার ঘর। যার দরজাটা একটু খোলা। ডলি ঠেলে খুললেন। এবং খুলেই দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থাণুবৎ।

'মঞ্জুদি' পড়ে আছেন বিছানায়। উপুড় হয়ে। লাল-সাদা রংয়ের যে নাইটিটা পরে ছিলেন, ভেসে যাচ্ছে রক্তে। শরীরের উপরিভাগ খাটের উপর। হাঁটু থেকে নিম্নাংশ খাটের নীচে। ঝুলছে। ঘর লন্ডভন্ড।

ডলি কাঁপতে থাকেন। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কোনওমতে উঠে আসেন তিনতলায়, নিজের ফ্ল্যাটে। হাত চেপে ধরেন স্বামী শেখরের, 'নীচে চলো... মঞ্জুদি...!'

মঞ্জুদেবীর ফ্ল্যাটের ভিতরের অংশ

সত্তর ছুঁইছুঁই শেখর দু'তলায় নামেন যত দ্রুত সম্ভব। দেখেন, এবং বোঝেন, প্রতিবেশীদের বা মৃতা মঞ্জুর আত্মীয়দের খবর দেওয়ার আগেও জরুরি পুলিশকে জানানো। থামান কাঁদতে থাকা ডলিকে।

—ওঁর মেয়েকে ফোন করো। আমি ততক্ষণ থানায় জানাচ্ছি।

সকাল সোয়া এগারোটায় ফোন বাজল কালীঘাট থানায়। ডিউটি অফিসার ধরলেন, শুনলেন, জানালেন ওসি-কে। দুটো ফোন করলেন ওসি। একটা ডিসি সাউথ-কে, আরেকটা ডিসি ডিডি-কে। তারপর গাড়িতে উঠে বসলেন, ড্রাইভারের প্রতি নির্দেশ এল ঝটিতি।

—নেপাল ভট্চাজ স্ট্রিট, তাড়াতাড়ি।

ডিসি সাউথও পার্ক স্ট্রিটের অফিস থেকে রওনা দিলেন। যার কিছু পরেই লালবাজার থেকে স্টার্ট নিল ডিসি ডিডি-র গাড়ি।

গন্তব্য? কোথায় আর, কালীঘাট।

ন'বছর আগের মামলা। মঞ্জু ঘোষাল হত্যারহস্য। কালীঘাট থানা, কেস নম্বর ১৮৬, তারিখ ৬ নভেম্বর, ২০০৯। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/৩৯৪ ধারায়। খুন, একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা এবং লুঠের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত আঘাত।

১, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। কালীঘাট থানা থেকে গাড়িতে মিনিট দুই-তিনের দূরত্বে। রাসবিহারী মোড় থেকে পশ্চিমদিকে কিছুটা এগিয়েই ডান হাতে পড়বে সদানন্দ রোড। সেই রাস্তা ধরে সামান্য এগিয়েই বাঁ দিকে পাবেন নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। বাদামতলা আষাঢ় সংঘের পুজোটা যে জায়গায় হয়, তার দশ-বিশ মিটারের মধ্যেই অকুস্থল।

একই ঠিকানাতে দুটো বাড়ি পাশাপাশি। দুটোই চারতলা। বাড়ি দুটোতে ভাড়াটিয়া হিসেবে ৩২টি পরিবারের বাস। একটাই বড় গেট ঢোকার।

মঞ্জু ঘোষাল যে ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন, সেটা দোতলায়। মঞ্জু এবং তাঁর স্বামী নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল, দু'জনেই ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। নারায়ণবাবু আটের দশকের শেষাশেষি চাকরি থেকে অবসর নেন। মঞ্জুও শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছিলেন ২০০৫ সালে।

ঘোষাল দম্পতির একমাত্র সন্তান, মানসী। ডাক নাম বুলা। সম্বন্ধ করে মানসীর বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৯-তে। সিঁথির বাসিন্দা দীপঙ্কর মিত্রের সঙ্গে। মানসী-দীপঙ্করের বিয়ের মাস দেড়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয় নারায়ণবাবুর। সেই থেকে মঞ্জু একাই থাকতেন দোতলার ওই ফ্ল্যাটে। যেখানে দিনদুপুরে কে বা কারা এসে কুপিয়ে খুন করে গেল ষাট বছরের প্রৌঢ়াকে।

কৌতূহলী প্রতিবেশীদের ভিড় সরিয়ে ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ খালি করে দিয়ে যা যা নজরে এল পুলিশের, জানানো যাক। মঞ্জু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন উপুড় হয়ে। চিত করে দিয়ে দেখা গেল, গালে ছড়ে যাওয়ার দাগ। শরীরের দু'জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত। গলার নলি কাটা। রক্ত ঝরেছে প্রচুর। দ্বিতীয় ক্ষতচিহ্ন পেটে। ছুরি হোক বা ধারালো অন্য কিছু, আততায়ী বা আততায়ীরা সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছিল পেটে। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। লাল-সাদা নাইটিটা রক্তধারায় প্রায় পুরোটাই লাল। সাদা রং খুঁজতে দূরবিন লাগবে।

যে অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছিল মৃতদেহ

মেঝেতে পড়ে প্লাস্টিকের চপ্পল একজোড়া, দৃশ্যতই মঞ্জুর রোজকার ব্যবহারের। চশমাটা পড়ে বিছানায়, বালিশের পাশে। বাড়ির ল্যান্ডফোনের রিসিভারটা মাটিতে পড়ে, তার ছেঁড়া। দুটো শোওয়ার ঘরই তছনছ অবস্থায়। বালিশ-বিছানা, আলনায় রাখা কাপড়চোপড়, প্লাস্টিকের ছোটখাটো ব্যাগ, কিছুই বাদ দেয়নি খুনি বা খুনিরা। হাতড়েছে সব।

যে বিছানায় মঞ্জুদেবীর মৃতদেহ পড়ে ছিল, তার পাশে স্টিলের আলমারি একটা। বন্ধ, কিন্তু চাবি ঘোরানোর জায়গায় একাধিক 'টুলমার্ক'। চাবি না পেয়ে কোনও যন্ত্রপাতি দিয়ে খোলার চেষ্টা করলে যেমন দাগ হয়। খুনের পর যে ফ্ল্যাটের যেখানে যা টাকাপয়সা-গয়নাগাটি আছে, হাতানোর মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল, বুঝতে ফেলুদা বা ব্যোমকেশ হওয়ার দরকার নেই। ঝলকের দেখাই যথেষ্ট।

মঞ্জুর মৃতদেহ উদ্ধার হল যে ঘরে, সে ঘরেই একটা মাঝারি সাইজের ডাইনিং টেবিল। যার উপর দুটো চায়ের কাপ। একটা স্টিলের, আরেকটা পোর্সেলিনের। চায়ের তলানি পড়ে আছে দুটো কাপেই। আর একটা বড় চায়ের কাপ পড়ে আছে মেঝেতে। হ্যান্ডলটা ভেঙে গেছে, পড়ে আছে কাপের পাশে। একটা নিশ্চয়ই মঞ্জুর, অন্য দুটো? খুনি এক নয়, দু'জন?

বাথরুমের ভিতরটা দেখা হল। অস্বাভাবিক কিছু নেই। দেখা হল রান্নাঘরও। সিঙ্কে কিছু থালাবাসন পড়ে আছে। কাপ-প্লেট-বাটি-চামচ-বয়াম রাখা আছে কিচেনের তাকে, যেমন থাকে যে-কোনও মধ্যবিত্ত বাড়িতে।

সবজি পড়ে আছে ঝুড়িভরতি।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘুরে দেখলেন ফ্ল্যাটের প্রতিটি ইঞ্চি-সেন্টিমিটার-মিলিমিটার। আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল দুটো জায়গায়। স্টিলের আলমারিতে, আর ডাইনিং টেবিলের উপর রাখা দুটো চায়ের কাপে। তৈরি হল 'seizure list', বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের তালিকায় থাকল মঞ্জুদেবীর বিছানায় লাগা রক্তের ছোপের নমুনা, রক্তমাখা বিছানার চাদর ও বালিশের কভার, নীল রংয়ের একটা ক্যারিব্যাগ রক্তমাখা, আঙুলের ছাপ সহ দুটো চায়ের কাপ, মাটিতে পড়ে থাকা কাপ এবং তার ভাঙা হ্যান্ডল।

ততক্ষণে এসে পৌঁছেছে গোয়েন্দাবিভাগের CD Van (Corpse Disposal), বিশেষ শববাহী গাড়ি। ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য যখন নীচে নামানো হচ্ছে মঞ্জুদেবীর নিথর দেহ, স্থানীয় মানুষের ভিড়ে থিকথিক নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। গাড়িতে তুলে 'বডি' বার করতেই কালঘাম ছুটে গেল পুলিশের। ডিসি সাউথ আর ডিসি ডিডি নীচে নামতেই ধেয়ে এল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কয়েক ডজন বুম।

—খুনের কারণ কিছু জানা গেল?

—আপনারা কি পরিচিত কাউকে সন্দেহ করছেন?

—সকালবেলা এভাবে একজন বয়স্ক মহিলা খুন হয়ে গেলেন, এটা কি শহরে নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা নয়?

—ফরেনসিক এক্সপার্টরা কী বললেন?

—সিপি কি স্পট ভিজিটে আসবেন?

প্রশ্ন ঝাঁকে ঝাঁকে। একে অন্যকে শেষ করার সুযোগ না দিয়েই। ডিসি ডিডি শান্ত ভাবে বললেন, 'তদন্ত সবে শুরু হয়েছে। খুনের কিনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার চেষ্টা করব আমরা। সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হবে।'

ডিসি সাউথ যোগ করলেন, 'একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে শহরের নাগরিকদের নিরাপত্তায় কলকাতা পুলিশ ব্যর্থ, এই ধারণা করা অতি সরলীকরণ হবে বলে আমাদের মনে হয়।'

এটুকুই যথেষ্ট ছিল। শুরু হয়ে যায় 'লাইভ' সম্প্রচার, কালীঘাট থেকে অমুকের সঙ্গে ক্যামেরায় তমুক।

'আপনারা শুনলেন, কালীঘাটে প্রৌঢ়ার নৃশংস খুনকে স্রেফ 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে দায় এড়ালেন ডিসি সাউথ। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এই ঘটনায় চূড়ান্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন শহরের বয়স্কদের নিরাপত্তা নিয়ে। থানার এত কাছে দিনদুপুরে ঘটে যাওয়া এই খুনে প্রশ্ন উঠছে কালীঘাট থানার ভূমিকা নিয়েও। আমরা এখন শুনে নেব, স্থানীয় বাসিন্দারা ঠিক কতটা আতঙ্কগ্রস্ত... আচ্ছা...আপনি তো এখানেই থাকেন... এভাবে দিনের বেলায় এই নৃশংস খুন...'

মিডিয়া মিডিয়ার কাজ করছিল। পুলিশ পুলিশের। যখন ফ্ল্যাটের ভিতরটা সরেজমিনে দেখছিলেন পুলিশকর্তারা-ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা, প্রাথমিক বিবরণ ফোনে শুনে নিয়েই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন নগরপাল। কেসটা ডিডি করবে। তদন্তের দায়িত্ব পড়েছিল হোমিসাইড শাখার তরুণ সাব-ইনস্পেকটর মলয়কুমার দত্তর উপর।

তথ্যসংগ্রহের প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে মলয় যখন বেরলেন বাড়ি ফেরার জন্য, রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে প্রায়। তিন-চারটে তো নয়, ৩২টা ফ্ল্যাট। সব মিলিয়ে একশোর উপর বাসিন্দা। প্রত্যেকের ঠিকুজিকুষ্ঠি জোগাড় করতেই তো ঘণ্টা তিনেক চলে গেল। তা-ও শেষ হয়নি পুরোটা। বাকি আছে আরও। কে কী করেন, ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন, কার মোবাইল নম্বর কত, খুঁটিয়ে জানতে আরও একটা দিন লাগবে।

তবে দিন একেবারে নিষ্ফলাও যায়নি। খুনটা যে পরিচিত বা পরিচিতরাই করেছে, এবং উদ্দেশ্য যে ছিল টাকাপয়সা-গয়নাগাটি লুঠপাট, সেটা মোটামুটি ধরা যেতেই পারে। এখনও 'মোটামুটি', কারণ এক শতাংশ

সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে থাকেই, খুনটা হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে, কিন্তু পুলিশকে 'মিসলিড' করতে চেহারা দেওয়া হল লুঠপাটের। তেমন কিছু তো এখনও মনে হচ্ছে না, ফিরতে ফিরতে ভাবেন মলয়। যা যা জানা গেল আজ দিনভর জিজ্ঞাসাবাদে, মনে মনে ঝালিয়ে নেন একবার।

ডলি রায়, যিনি আবিষ্কার করেন মৃতদেহ, মঞ্জুর ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশিনী ছিলেন। দু'জনে ছিলেন প্রায় সমবয়সিই। এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন দু'জনে, যে দুই পরিবারের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য আলাদা কলিংবেল ছিল দুটো ফ্ল্যাটেই। আলাদা বেল, আলাদা আওয়াজ।

মঞ্জু বছর পাঁচেক ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন। ব্লাডপ্রেসারের দোসর হয়েছিল ব্লাডসুগার। বছরখানেক হল ব্যাধির তালিকায় নতুন সংযোজন হয়েছিল আর্থারাইটিস। হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়ে থাকতেন বছরভর।

বাড়ির বাইরে বেরতেন মাসে একবারই। রিকশা করে ব্যাংকে যেতেন পেনশনের টাকা তুলতে। ব্যস, ওই একবারই। বাকি সময় ঘরেই। মাসকাবারি বাজার করে দিয়ে যেতেন মেয়ে মানসী বা জামাই দীপঙ্কর। রোজকার বাজারহাট আর টুকটাক কেনাকাটা, যখন প্রয়োজন হত, করে দিতেন প্রতিবেশীরাই। দিনে অন্তত দু'বার ডলি নিয়ম করে মঞ্জুর ফ্ল্যাটে আসতেন। ডলির থেকে আরও জানা গেল, মঞ্জু বাড়িতে সবসময় গলায় সোনার চেন পরে থাকতেন। আর হাতে সোনার চুড়ি। যা পাওয়া যায়নি মৃতদেহে। নিয়ে গেছে আততায়ীরা।

—কিছু দরকার হলে, বা এমনিই গল্প করার ইচ্ছে হলে মঞ্জুদি কলিংবেল বাজাত আমাদের ফ্ল্যাটে। যখন আমার যাওয়ার হত মঞ্জুদির ফ্ল্যাটে, আমিও বেল বাজাতাম উপর থেকে। মঞ্জুদি দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার মুখটায়। অপরিচিত কাউকে এমনিতে দরজা খুলতই না। ভিতর থেকে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করত, 'কে? কী দরকার?' চেনা কেউ এসেছে, একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে তবেই খুলত।

—আজও উপর থেকে বেল বাজিয়ে নীচে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে আমাদের। মঞ্জুদির হাঁটুর ব্যথা শুরু হওয়ার পর থেকেই ওই ব্যবস্থা। রোজ সকালে এগারোটা নাগাদ নীচে আসতাম জর্দা আর সেদিনের 'আনন্দবাজার' কাগজটা নিয়ে। আজও বেল বাজালাম। নীচে এলাম, দেখি দরজা বন্ধ। ডাকলাম, সাড়া দিল না। দরজা ঠেললাম একটু পরে। খুলে গেল। ঢুকে দেখি এই কাণ্ড....।

হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন ডলি।

আতঙ্কের ঘোর কাটার পর স্বামী শেখরকে উপর থেকে ডেকে এনেছিলেন ডলি। শেখর রায়, বয়স সত্তরের উপর। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। শেখর স্নেহ করতেন মঞ্জুকে, ডাকতেন 'মা' বলে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না, যা ডলি জানাননি পুলিশকে।

ডলি-শেখরের একমাত্র সন্তান সুমিত। বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। অবিবাহিত। নেপাল ভট্টাচার্য লেনেই একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস চালান। সুমিত রায়ের বয়ান অনুযায়ী, পৌনে দশটা নাগাদ রোজকার মতো অফিসে বেরিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে ফোন পান, মঞ্জুদেবী খুন হয়ে গেছেন। তড়িঘড়ি ফিরে আসেন।

আর একটি তথ্য দিলেন সুমিত। আন্দাজ সাড়ে ন'টা নাগাদ এক যুবক বেল বাজিয়েছিল তাঁদের তিনতলার ফ্ল্যাটে। বলেছিল, আনন্দবাজার পত্রিকার মার্কেটিং বিভাগের কর্মী। আনন্দবাজার এবং টেলিগ্রাফের দৈনিক গ্রাহক হওয়ার 'কম্বো অফার' নিতে আগ্রহী কিনা, জানতে চেয়েছিল। সুমিত আগ্রহ দেখাননি। যুবক উঠে গিয়েছিল চারতলায়।

চারতলায় কোথায় গিয়েছিল? ভরদ্বাজ পরিবারের ফ্ল্যাটে। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে দীর্ঘদিন এই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন ওমপ্রকাশ ভরদ্বাজ। ব্যবসা করেন। স্ত্রীর নাম মধুবালা। একমাত্র কন্যা প্রীতির বয়স একুশ। কস্টিং পড়ার পাশাপাশি চাকরি করেন সল্টলেকের একটি বিপিও-তে। প্রীতি জানালেন, আনন্দবাজারের ওই কর্মী তাঁদের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিল। 'কম্বো অফার' নিতে রাজি হয়েছিলেন প্রীতিরা। ফর্মে সই করে রিসিট দিয়ে গেছে যুবকটি। নিজের নাম আর ফোন নম্বরও লিখে দিয়েছে রিসিটের পিছনে। কী নাম? শুভঙ্কর দে।

ফোনে সঙ্গে সঙ্গেই শুভঙ্করকে ধরেছিলেন মলয়। বিকেল চারটে নাগাদ। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটের অফিস থেকে কালীঘাটে চলে এসেছিলেন বাইশ বছরের শুভঙ্কর। মিনিট পনেরো কথা বলেই মলয় বুঝেছিলেন, ছেলেটি সত্যিই মার্কেটিং-এর কাজে এসেছিল। কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। একটাই জিনিস শুধু জানার ছিল।

১, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিটের সেই ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি

—যখন উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে, বা নেমে আসছেন, কাউকে উঠতে বা নেমে যেতে দেখেছিলেন? মনে করে দেখুন...।

একটু ভাবেন শুভঙ্কর।

—না স্যার, অত খেয়াল করিনি। আমি ফোনে কয়েকটা এসএমএস চেক করতে করতে উঠছিলাম। খেয়াল করিনি।

—তবু মনে করে দেখুন না একটু...

শুভঙ্কর হাসেন।

—ভাল করে দেখলে তবে তো মনে থাকবে। দেখিইনি তো খেয়াল করে। এখন কিছু বলতে গেলে বানিয়ে বলতে হবে স্যার।

সূত্রের খোঁজে মরিয়া মলয় তবু প্রশ্ন করেন।

—যখন দোতলা থেকে তিনতলায় উঠছেন, দোতলার দরজা খোলা ছিল?

—না, বন্ধ ছিল। আমি তো দোতলাতেও বেল বাজিয়েছিলাম। মিনিট খানেক অপেক্ষা করেছিলাম। কেউ খোলেনি দরজা। তারপর তিনতলায় উঠে গিয়েছিলাম।

—সময় তখন আন্দাজ ক'টা হবে?

—এই সাড়ে ন'টার আশেপাশে হবে।

—যখন নেমে আসছিলেন, তখনও বন্ধ ছিল দোতলার দরজা?

শুভঙ্কর সামান্য হেসে ফেলেন এবার।

—খেয়াল করিনি এত স্যার।

এঁকে আর জিজ্ঞাসা করে নতুন কিছু পাওয়ার নেই। বরং জানা দরকার, কার কার রোজ মঞ্জুদেবীর ঘরে ঢোকার প্রবেশাধিকার ছিল। উত্তর পাওয়া গেল মানসী মৈত্রর কাছে। মৃতার একমাত্র সন্তান। যিনি কেঁদেই চলেছেন মায়ের ফ্ল্যাটে চলে আসার পর থেকে। সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন স্বামী দীপঙ্কর।

কান্নাভেজা গলায় যতটুকু বললেন সদ্য মাতৃহারা মানসী, মোটামুটি এই।

—মা একা থাকত বলে খুব সতর্ক ছিল অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে। আমিও মা-কে সাবধান করতাম নিয়মিত। একা মানুষ থাকে। কখন কী হয় বলা যায়?

—ওঁর বাজারহাট-টাট... এসব কি আপনিই...

—হ্যাঁ, সপ্তাহে একবার আমি এসে করে দিয়ে যেতাম। আমি না পারলে আমার স্বামী আসতেন। সপ্তাহের বাজার, ওষুধপত্র, এই সব। বাকি ডলি কাকিমারা দেখে নিতেন হঠাৎ কিছু দরকার হলে। আর উষাদি তো ছিলই।

'উষাদি' বলতে 'উষারানি দেবী'। আটপৌরে মলিন শাড়ির পঞ্চাশোর্ধ্বা মহিলা, যিনি ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছেন। উষারানি এ বাড়িতে ঠিকের কাজ করছেন প্রায় বছর দশেক হল। এই আবাসনের আরও তিনটে ফ্ল্যাটেও কাজ করেন। বাড়ি ক্যানিংয়ে। রোজ সকালের ট্রেনে আসেন কলকাতায়। মঞ্জুর ফ্ল্যাটে সাতটা-সাড়ে সাতটায় ঢুকে ঝাড়পোঁছ করে অন্য ফ্ল্যাটগুলোর কাজ সারেন।

দুপুরে ফের মঞ্জুর ফ্ল্যাটে চলে এসে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, একটু রান্নাবান্না, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা, এবং বিকেলের ট্রেনে বাড়ি ফেরা। মঞ্জুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

—'মা' আমাকে মেয়ের মতই ভালবাসতেন...

—আর কে আসত? কাজের লোক আর কেউ ছিল?

—হ্যাঁ স্যার, জগদীশ।

—কে জগদীশ?

জগদীশ যাদব। সুইপার, তিরিশ বছর বয়স। রোজ আটটার মধ্যে চলে এসে সাফসুতরো করে যেতেন বাথরুম। তারপর যেতেন আরও কয়েকটা ফ্ল্যাটে।

জগদীশ থাকেন কাছেই, চেতলার লকগেটের কাছে। বাড়িতেই ছিলেন। খবর পাঠাতেই এলেন শক্তপোক্ত চেহারার যুবক। কালো গেঞ্জি আর নীলরঙা বারমুডা পরিহিত জগদীশ জানালেন, যতক্ষণ ছিলেন মঞ্জুর ফ্ল্যাটে, অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি।

—আমি আটটায় ঢুকেছিলাম রোজকার মতো। বেরিয়েছিলাম সোয়া আটটা নাগাদ। উষাদি তখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল।

মলয় তাকান উষার দিকে। উষা ঘাড় নাড়েন, জগদীশ মিথ্যে বলছে না। আরও দুটো প্রশ্ন ছিল মলয়ের।

—অন্য ফ্ল্যাটগুলোর কাজ সেরে কখন বেরিয়েছিলেন?

—এই স্যার, দশটার কাছাকাছি হবে। পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে।

—হুঁ, বাড়ি কোথায় আপনার?

—বিহার স্যার। ছাপড়া। বছর সাতেক আগে কলকাতায় এসেছি পেট চালাতে।

এতগুলো ফ্ল্যাট, বাসিন্দাদের সবার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতেই কেটে গেল আরও দিনদুয়েক। স্বাভাবিক নিয়মে ওই চারতলা বাড়িতে কার কখন প্রবেশাধিকার ছিল, জানা জরুরি ছিল। কোন ফ্ল্যাটে কে কাগজ দিত, কোন ফ্ল্যাটে কে সুইপারের কাজ করত, ঠিকে কাজের লোক কে ছিল কাদের বাড়িতে, কোন দুধওয়ালা সকালে আসত দুধ দিতে, কেবল অপারেটর কারা কারা আসত ফ্ল্যাটবাড়িতে, এই সব।

তথ্য সংগ্রহের এই কাজটা যে কী পরিমাণে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' হতে পারে, সেটা তদন্তকারী অফিসার মাত্রই জানেন হাড়েহাড়ে। অপরাধটা করেছে হয়তো এক বা দু'জন বা তিন। তদন্তের চূড়ান্ত পর্বে হয়তো সন্দেহভাজনের সংখ্যা দাঁড়াবে বড়জোর পাঁচ কিংবা ছয়ে, তবু কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট জনকে একই প্রশ্ন করে যেতে হয়। যাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তাঁর খুনের সঙ্গে কোনও যোগ থাকার সম্ভাবনা শূন্য, এটা জেনেও। এটা জেনেও, বাড়তি কোনও তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনাও হয়তো শূন্যেরই কাছাকাছি।

উদ্দেশ্য একটাই। 'Process of elimination', দুধের থেকে জলটা আলাদা করা। অপ্রয়োজনীয় তথ্য একটা একটা করে ছেঁটে ফেলা। মাঠটাকে ছোট করে আনা।

এই আলাদা করার প্রক্রিয়ায় বিস্তর খাটাখাটনি করলেন মলয়। একতলায়, গেট দিয়ে ঠিক ঢোকার মুখে 'ইলেকট্রোক্রাফট' বলে একটা দোকান ছিল। ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের যে দোকান রোজ সকাল সাড়ে আটটায় ঝাঁপি খুলত, সেই দোকানের সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন মলয়। পাশেই পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান ছিল একটা। সেখানেও তথ্যতালাশ। রোজকার চেনামুখের বাইরে অন্য কাউকে ঢুকতে দেখছিলেন? কেউই মনে করতে পারলেন না বলার মতো কিছু।

কী করেই বা পারবেন? ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, খুনটা হয়েছে ন'টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। এমন একটা সময়ে, যখন বাসিন্দারা কাজে বেরচ্ছেন একের পর এক। কাজের লোকদের যাতায়াতও লেগেই আছে। রোজকার সকাল-সন্ধে-দুপুর-বিকেল কে আর অত মনে রাখে আলাদা করে, কে-ই বা খেয়াল করে খুঁটিয়ে?

—কী দাঁড়াচ্ছে তা হলে?

মলয়কে প্রশ্ন করেন ওসি হোমিসাইড। লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগে পর্যালোচনা চলছে মামলার অগ্রগতির। দিন সাতেক পেরিয়ে গেছে খুনের পর। ‘ক্লু’ বা ‘লিড’ এখনও অধরা।

—স্যার, পসিবল সাসপেক্টদের একটা লিস্ট করেছি। তবে এর বাইরেও হতে পারে অন্য কেউ।

—শুনি।

—এক নম্বরে সুমিত রায়। ডলি-শেখরের ছেলে। আমি খোঁজ নিয়েছি স্যার। ওই ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা মোটেই ভাল চলছিল না। টাকার দরকার ছিলই।

—‘মোটিভ’ বুঝলাম, কিন্তু ‘অ্যালিবাই’?

—আছে, তবে দুর্ভেদ্য কিছু নয়। বলেছেন, পৌনে দশটা নাগাদ অফিস গেছিলেন। সেটা সত্যিই বলেছেন, ভেরিফাই করেছি। কিন্তু সময়টা ভাবুন স্যার। খুনটা হয়েছে সকাল ন'টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। সুমিতবাবু অফিস যাওয়ার পথে কাজটা করে রোজকার মতো বেরিয়ে গেছেন, একেবারে অসম্ভব নয়।

—অসম্ভব নয়....

—আরও একটা জিনিস স্যার, খুনটা যে পরিচিত কেউ করেছে এটা তো পরিষ্কার। যদি দুটো চায়ের কাপ থেকে ধরে নিই, আততায়ী দু'জন ছিল, তা হলেও দু'জনের একজনকে পরিচিত হতেই হবে। না হলে দরজা খুলতেন না মঞ্জুদেবী।

—বুঝলাম, কিন্তু...

—বলছি স্যার। একটা ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার, ডলির ফ্ল্যাটের আলাদা কলিংবেলটা, যা দিয়ে মঞ্জুর ফ্ল্যাটের বেল বাজানো যায়, সেটা কিন্তু ইচ্ছে করলেই সুমিতও বাজাতে পারতেন। অ্যাকসেস ছিল।

—হুঁ!

—ধরুন স্যার, উনি বেলটা বাজালেন অফিস বেরনোর আগে। মঞ্জু এসে দাঁড়ালেন দরজার বাইরে। অন্য কাউকে, সে ফ্ল্যাটেরই হোক বা অন্য কোনও লোক, হয়তো আগে থেকে সুমিত বলে রেখেছিলেন। সে-ও ওই সময়ে ঢুকল বাড়িতে। উঠল দোতলায়। সুমিত নেমে এলেন। মঞ্জুকে হয়তো কোনও দরকারি কথার ব্যাপারে বললেন। সঙ্গের বন্ধুকেও ডেকে নিলেন, চা খাওয়ার পর দু'জনে মিলে খুনটা করলেন।

—থিয়োরেটিকালি অসম্ভব নয়, প্র্যাকটিক্যালিও হয়তো নয়, হতেই পারে। আর, সুমিত এবং তার সঙ্গী করেছে বলে ধরে নেওয়াটাও ঠিক নয়, হয়তো করিয়েছে। ভাড়াটে লোক দিয়ে। যারা অপেক্ষায় ছিল নীচে। নির্দিষ্ট সময় বলা ছিল। যারা সময়মতো উঠে এসে বেল বাজিয়েছে। আর মঞ্জু কিছু বোঝার আগেই সুমিত ভিতর থেকে খুলে দিয়েছেন দরজা, এবং খুলে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন সঙ্গীকে নিয়ে, ভাড়াটে খুনিরা ‘অ্যাকশন’ করে বেরিয়ে গেছে।

—পসিবল স্যার...

—কিন্তু সুমিতই হোক বা অন্য কেউ, লাভ তো কিছু হল না। ওই তো কয়েকটা গয়না, যা পরে থাকতেন। বেচে বড়জোর দশ হাজার। আর ব্যাগে ট্যাগে হয়তো কিছু টাকা ছিল। সেটা নিয়ে গেছে। কতই বা হবে? হাজার দুই-তিন খুব বেশি হলে। তার বেশি টাকা তো বাইরে থাকার কথা নয়।

—সেটা অপরাধীদের ব্যাড লাক স্যার। ভদ্রমহিলা এবং ওঁর স্বামী, দু'জনেই সরকারি চাকরি করেছেন দীর্ঘদিন। টাকাপয়সার অভাব ছিল না। যে কেউ ভাববে, আলমারি ভাঙতে পারলে ভালই আমদানি হবে। আলমারির চাবি মঞ্জু রাখতেন রান্নাঘরে একটা শিশির মধ্যে। ওটা খুঁজে পায়নি খুনিরা।

—হুঁ।

—সাসপেক্ট নাম্বার টু, জগদীশ। সুইপার। পেটানো চেহারা।

ওসি হোমিসাইড হেসে ফেলেন।

—মলয়, চেহারা গুন্ডার মতো হলেই যে গুন্ডা হতে হবে, এমন কথা নেই কিন্তু।

মলয়ও মৃদু হেসেই উত্তর দেন।

—সে তো জানি স্যার। কিন্তু এর ক্ষেত্রেও ওই ফ্যাক্টর দুটো অ্যাপ্লিকেবল। টাকা এবং পরিচিত হিসেবে প্রবেশাধিকার।

—কিন্তু উষা তো বলছেন, কাজ সেরে বেরিয়ে গিয়েছিল জগদীশ!

—উষা বেরিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসেনি কাউকে নিয়ে, কী গ্যারান্টি আছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু সুইপারকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে চা খাওয়ায় কেউ?

—রাইট স্যার, ওখানেই খটকা।

—ব্যাক গ্রাউন্ড চেক করেছ জগদীশের?

—করেছি স্যার। বলার মতো কিছু পাইনি। রাত্রে মদ-টদ খায়, এই পর্যন্ত। ক্রিমিনাল রেকর্ড কিছু নেই। লোক লাগানো আছে। টাকা ওড়াচ্ছে কিনা, খবর রাখতে বলেছি।

ওসি হোমিসাইড বুঝতে পারেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়, মলয় দিনরাত খাটছে ঠিকই, কিন্তু তদন্ত এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে সম্ভাব্যতার গণ্ডিতে। নির্দিষ্ট 'ক্লু' এখনও নেই। নেই প্রমাণ।

—আর কোনও সাসপেক্ট?

—সে-অর্থে সাসপেক্ট বলব না স্যার, কিন্তু মঞ্জুদেবীর জামাই দীপঙ্করের আর্থিক অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল এমন নয়। আরও খোঁজ নিচ্ছি স্যার। ক্লিন চিট দেওয়ার জায়গায় কেউই নেই।

—গুড। আমরা যখন ট্রেনিং-এ ছিলাম, কী বলা হত জানো? তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। 'Believe nobody, trust nobody'। সব কিছু বারবার যাচাই করে তবেই বিশ্বাসের প্রশ্ন, সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন। সে যে-ই হোক না কেন। মৃতের মা-বাবাই হোক বা স্ত্রী-পুত্র, বা মেয়ে-জামাই। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট ভরদ্বাজ ফ্যামিলি? যারা চারতলায় থাকত?

—মিস্টার ভরদ্বাজের ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও আর্থিক সমস্যা ছিল না। মধুবালার সঙ্গে, আই মিন মিসেস ভরদ্বাজের সঙ্গে মঞ্জুদেবীর সুসম্পর্ক ছিল। ওঁদের মেয়ে প্রীতিকে মঞ্জু খুবই ভালবাসতেন। প্রতি পুজোয় জামাকাপড় কিনে দিতেন। ঘটনার সঙ্গে এই ফ্যামিলির কোনওরকম ইনভলভমেন্টের সম্ভাবনা দেখছি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত।

—বেশ ...

—রইল বাকি উষারানি। ট্র্যাক রাখছি মহিলার। মঞ্জুদেবীর মেয়ে মানসীকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছি উষারানির ব্যাপারে।

—কী বললেন?

—বললেন, 'উষাদিকে দশ বছর ধরে দেখছি। নিজের মায়ের মতো ভালবাসত মা-কে। আমাকে ভালবাসে মেয়ের মতো। এর সঙ্গে উষাদি জড়িত, দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। উষাদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছিলেন।'

—হুঁ... উষার বাড়িতে কে কে আছেন?

—স্বামী মারা গেছেন। একা থাকেন ক্যানিং-এ। এক মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই।

—সোর্সকে তবু বলে রেখো।

—বলেছি স্যার। এমন তো কতই হয়, দীর্ঘদিনের কাজের লোক বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বাইরে কাউকে খবর দিয়ে দিল...

—হ্যাঁ, ভেরি কমন। ট্র্যাক রাখো।

—ইয়েস স্যার।

মলয় উঠে পড়ার মুখে থামান ওসি হোমিসাইড।

—আর হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক সারভেল্যান্স...কাউকে বাদ দিয়ো না কিন্তু... সে যে-ই হোক... কাউকেই না...

—ওটা চলছে স্যার। ফ্ল্যাটের সমস্ত বাসিন্দাদের কল ডিটেল রেকর্ডস চেয়েছি। কে কার সঙ্গে কখন কথা বলেছে বা বলছে, আপডেট রাখছি।

পরের দিন বিকেল। হন্তদন্ত হয়ে মলয় ঘরে ঢুকলেন গোয়েন্দাপ্রধানের। হাতে 'কল ডিটেলস'-এর শিট একটা।

—স্যার, এই দেখুন!

—কী হল মলয়?

মলয় 'কল ডিটেলস'-এর একটা পাতা মেলে ধরেন।

—গত রাতে সুমিত রায় একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলেছে। মোস্ট প্রবাবলি অ্যান্টিসিপেটরি বেল মুভ করবে কাল-পরশুর মধ্যে।

গোয়েন্দাপ্রধান নড়েচড়ে বসেন।

—কী করে বুঝছ, অ্যান্টিসিপেটরি বেল মুভ করবে?

—অ্যাডভোকেটের নম্বর তো কল রেকর্ডসেই আছে। একটু আগে ফোনে কথা বললাম ওঁর সঙ্গে। আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। উনিই বললেন।

—হুঁ, সুমিতকে নিয়ে এসো লালবাজারে। এখনই।

—রাইট স্যার।

'ইন্টারোগেশন রুম' বলতে সাধারণত যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটা আধো-অন্ধকার ঘর। সিলিং থেকে অল্প পাওয়ারের একটা বালব ঝুলছে। গা-ছমছমে একটা পরিবেশে সন্দেহভাজনকে হাড়হিমকরা গলায় জেরা করছেন অফিসার।

লালবাজারের 'ইন্টারোগেশন রুম'-এ ওই 'সিনেমায় যেমন হয়' জাতীয় ব্যাপারই নেই কোনও। সাদামাটা ঘর, খুব বেশি হলে আট ফুট বাই ছয়। একটা টেবিল, যার দু'দিকে দুটো চেয়ার পাতার মতোই জায়গা আছে শুধু। একটায় তদন্তকারী অফিসার বসেন। উলটোদিকে সন্দেহভাজন।

পরিবেশ আপাতদৃষ্টিতে নিরীহই। কিন্তু যত সময় যায়, সন্দেহভাজনের পক্ষে 'নিরীহ' থাকে না আর তেমন। লালবাজারের একটা স্থানমাহাত্ম্য আছে। গোয়েন্দাবিভাগের তো আরও। একতলার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চোখে পড়ছে পোশাকে বা প্লেন ড্রেসে পুলিশকর্মীদের ওঠানামা। চোখে পড়ছে বিভিন্ন শাখার বোর্ড। গুন্ডাদমন শাখা, ব্যাংক ফ্রড সেকশন, ডাকাতি-ছিনতাই দমন শাখা, হোমিসাইড... একটার পর একটা। হয়তো কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে কোনও আসামিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে করিডর দিয়ে, কোনও নির্দিষ্ট ঘরে। যে আসামির চুপসে যাওয়া চোখমুখ দেখে মনে হবে, ঝড় নয়, শরীর-মনের উপর দিয়ে সুনামি বয়ে গেছে। মায়া হবে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম লোকেরও।

আবহটাই এমন, কোনওরকম বলপ্রয়োগ বা 'আদরযত্ন' ছাড়াই অধিকাংশের স্নায়ু বিদ্রোহ করতে শুরু করে, চোখে চোখ রেখে ওই একচিলতে ঘরে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঠান্ডা গলায় ছুটে আসতে থাকে। কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দেয়, ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরতে থাকা সত্ত্বেও। থানায় বা অন্যত্র জিজ্ঞাসাবাদে কিছুতেই চিড় ধরানো যায়নি রক্ষণে, অথচ লালবাজারে এসে পোড়খাওয়া অভিযুক্তের যাবতীয় প্রতিরোধ অদৃশ্য হয়ে গেছে একঘণ্টার জেরায়, এমন যে কত দেখেছি আমরা।

সুমিত রায়কে অবশ্য বিচলিত দেখাচ্ছিল না বিশেষ। মলয়ের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

—হ্যাঁ, কথা বলেছি অ্যাডভোকেটের সঙ্গে। গত সাতদিনে আপনারা পাঁচবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। বাড়িতে দু'বার, থানায় ডেকে তিনবার। আমার ধারণা হয়েছে, আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করার

প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই উকিলের কাছে গিয়েছিলাম।

—আমরা তো অন্য অনেককেও একাধিকবার ডেকে কথা বলেছি। প্রয়োজনে আবার বলব। কারও মাথায় আগাম জামিনের কথা এল না, উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন শুধু আপনারই হল? এর থেকে কী বোঝা যায় বলুন তো?

—কী?

—ঠাকুরঘরে কে জিজ্ঞেস করতে না করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রমাণ করতে, আপনি কলা খাননি।

সুমিতকে একটুও প্রভাবিত দেখায় না মলয়ের খোঁচায়। চুপ করে থাকেন, এবং মলয় বলে যান একটানা।

—মোটিভ ছিল আপনার। ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না। ভেবেছিলেন মঞ্জুদেবীকে মেরে টাকাপয়সা পাবেন বিস্তর। কপাল মন্দ, অল্পই জুটল। বেলটা আপনিই বাজিয়েছিলেন, তারপর নেমে এসেছিলেন। ঘরে ঢুকে চা খেয়েছিলেন, তারপর বয়স্কা মহিলাকে কুপিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। ঠিক বলছি? শুধু সঙ্গে কে ছিল সেটা জানি না এখনও। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বলুন, অনেক সময় আছে।

সুমিত নির্বিকার। থেমে থেমে উত্তর দেন।

—দেখুন মি. দত্ত, আপনি যা শুনতে চাইছেন, সেটাই বলব বলে যদি ভাবেন, ভুল ভাবছেন। আপনি যা যা বললেন, সেটা আপনার থিয়োরি, আপনার কল্পনা। খুনটা আমি করিনি। আগেও বলেছি, এখনও বলছি। প্রমাণ আছে কোনও? সারাদিন ধরে এখানে বসিয়ে রাখলেও একই কথা বলব। খুনটা করিনি আমি।

পুলিশ প্রশিক্ষণের সময় জেরার যা যা পদ্ধতি শেখানো হয়, সবই প্রয়োগ করলেন মলয় কয়েক ঘণ্টা ধরে। সুমিত ভাঙলেন না, মচকালেনও না। স্রেফ সন্দেহের বশে কাউকে খুনের মামলায় গ্রেফতার করা যায় না। হয় এমন প্রমাণ লাগে যা সন্দেহভাজনের সামনে ফেললে স্বীকারোক্তি আসা অবধারিত, নয় সোজাসাপটা স্বীকারোক্তি দরকার হয় জেরার মুখে। প্রমাণ সংগ্রহ পরে, বয়ান অনুযায়ী।

কোনওটাই হাতে নেই সুমিতের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার করে আদালতে তুললে হাসির খোরাক হতে হবে। হতাশ লাগে মলয়ের। সুমিতকে অনুমতি দেন বাড়ি যাওয়ার।

—বেশ সুমিতবাবু, আজকের মতো এটুকুই। আবার ডাকতে হতে পারে আপনাকে। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম, এমন ভাবার কারণ নেই, এটুকু বলে রাখলাম।

সুমিত উঠতে যাবেন, মলয় বসিয়ে দেন হাত ধরে।

—চা খেয়ে যান অন্তত। না হলে লালবাজারের বদনাম হবে। এতক্ষণ কথা বললাম, আর এক কাপ চা-ও অফার করলাম না!

লালবাজারের চায়ে বা সুনাম-বদনামে এতটুকু আগ্রহী দেখায় না সুমিতকে।

—নাহ, তার দরকার নেই। আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক।

—আচ্ছা, চা নয়, জল তো এক গ্লাস খেয়ে যান। না হলে ওই যে কথায় বলে না, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

সুমিতকে এইবার রাগত দেখায়। পুলিশের এই 'গৃহস্থপনা' অসহ্য ঠেকে। একে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ছোট্ট ঘরে বসিয়ে চাপ দিচ্ছে, মুখের উপর 'খুনি' বলছে। তারপর 'জল খেয়ে যান, চা খাবেন?'-এর ন্যাকামি। নেহাত এটা লালবাজার আর এই অকালপক্ক মলয় ছোকরাটা পুলিশ অফিসার। না হলে ...।

কিছু বলতে গিয়েও সুমিত সংবরণ করেন নিজেকে। জলের গ্লাস এলে ঢকঢক করে খেয়ে বেরিয়ে যান।

এবং বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'সায়েন্টিফিক উইং'-এর অফিসারদের ডাকেন মলয়। গ্লাসে আঙুলের ছাপ পড়েছে সুমিতের। 'ডেভেলপ' করে মঞ্জুদেবীর ফ্ল্যাটে আলমারি আর চায়ের কাপে পাওয়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে 'ম্যাচ' করানোর জন্য টিম রওনা হয়ে যায় ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে। ডিসি ডিডি ফোন করেন ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে, 'রিপোর্টটা একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়।'

তাড়াতাড়িই পাওয়া গেল, এবং মলয়কে হতাশায় ডুবিয়ে সেই রিপোর্ট জানাল, 'ম্যাচ' করেনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট। মিলছে না সুমিতের আঙুলের ছাপ ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া ছাপের সঙ্গে।

এবার? অপরাধ স্বীকার করছেন না সুমিত। প্রমাণও হাতে নেই। আঙুলের ছাপও মিলল না। এবার? খুনটা তা হলে কে বা কারা করল? একদম অচেনা চোর-বদমাইশ কেউ? কিন্তু তা-ই বা হয় কী করে? সকালে কেউ করে এসব এভাবে? আর ঘুরেফিরে সেই পরিচিতির তত্ত্ব, অচেনা কাউকে দরজা খুলবেনই বা কেন মঞ্জু?

খুনটা তা হলে আনডিটেকটেড থেকে যাবে? দশ দিন হয়ে গেল। কিনারা করা গেল না, 'এখনও অন্ধকারে পুলিশ' জাতীয় স্টোরি তো প্রায় রোজই বেরচ্ছে খবরের কাগজে। অন্ধকারে আর কতদিন থাকতে হবে?

হতোদ্যম মলয় যখন বাড়ি ফিরছেন ১৮ নভেম্বরের রাতে, ভাবতেও পারেননি অন্ধকার কাটতে চলেছে দ্রুত। আলোর ফুলকি দেখতে পাবেন খুব শিগগিরই।

রুটি, আলু-গোবি, বেগুন ভর্তা।

অর্ডার দিয়ে অন্যমনস্ক বসে ছিলেন মলয়। বীরভূমে গ্রামের বাড়িতে শেষ গিয়েছেন প্রায় চার মাস হয়ে গেল। সেই জুলাইয়ে। পুজোয় ছুটিছাটার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তারপরেও কাজের চাপে আর যাওয়া হল কই? বিজয়ার প্রণামটাও এখনও সারা হয়নি। ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দেবেন-দেবেন করছিলেন, তার মধ্যেই এই মহিলার খুন। এখন আর কিনারা হওয়ার আগে মুখ ফুটে বলাও যাবে না ছুটির কথা। এদিকে বাড়ি থেকে রোজই ফোন আসছে মা-বাবার, 'কবে আসবি?'

আর আসা! সপ্তাহদুয়েক হতে চলল, তদন্ত আর এগোল কই? রোজ প্রায় একডজন সোর্সের সঙ্গে কথা বলছেন। মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। যা যা করা সম্ভব, করছেন সাধ্যমতো। অথচ না আছে ক্লু, না আছে কিছু।

খাবার এসে গেছে। চেতলার এক সোর্সের সঙ্গে দেখা করতে ভোর ভোর মলয় চলে এসেছিলেন কালীঘাট এলাকায়। তখনকার চা-টোস্ট হজম হয়ে গিয়ে এখন খিদে পেয়েছে বেজায়। রাসবিহারী মোড়ের ধাবায় ঢুকেছেন লাঞ্চ সারতে।

খাবার মুখে দিয়ে খিঁচড়ে থাকা মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে যায় মলয়ের। একটা অদ্ভুত মশলা দেয় এরা এইসব ধাবাগুলোয়। সবজির স্বাভাবিক স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির রান্নার মতো হবে না ঠিকই, কিন্তু তা বলে এই?

—আর দুটো রুটি বলি?

ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তরে বিরক্তি লুকোতে পারেন না মলয়।

—আরে না মশাই, রান্নার যা ছিরি আপনাদের...

—কেন?

—সবজিটা খেয়ে দেখলেই বুঝবেন, কেন। কোনও স্বাদই নেই।

—কেন, সবজি তো ফ্রেশই ইউজ় করি আমরা।

ডিপার্টমেন্টে মলয় ঠান্ডা স্বভাবের ছেলে হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু সময় খারাপ গেলে যা হয়, স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই হঠাৎ মেজাজ হারালেন।

—আমি গ্রামের ছেলে মশাই। এখনও বাড়ি গেলে চাষের কাজে হাত লাগাই। আমাদের ভীমগড় বাজারের সবজি খেলে বুঝতে পারতেন, কোনটা টাটকা আর কোনটা নয়। ফ্রেশ সবজি চেনাবেন না আমাকে।

ম্যানেজার আর থাকতে পারেন না।

—কিছু মনে করবেন না। রান্নার এদিক-ওদিক হতে পারে, কিন্তু বাসি মাল আমাদের এখানে পাবেন না। এখানেও টাটকা সবজিই আসে। ক্যানিং থেকে, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে, বজবজ থেকে। ট্রেনে করে এসে লোক দিয়ে যায়। আশেপাশের ভাতের হোটেলেও দেয়। অনেক বাড়িতেও দেয়।

মলয় আর কথা বাড়ান না। খারাপই লাগে একটু। সামান্য ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে খিটখিট না করলেই হত। বিল মিটিয়ে কাউন্টার থেকে মৌরি—মিছরি মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাস্তুহারা বাজারে একজন সোর্স অপেক্ষা করছে।

কিছুটা হাঁটার পরই থমকে যান মলয়, মস্তিষ্কে হঠাৎই বিদ্যুৎঝলক। কী যেন বললেন ম্যানেজার ভদ্রলোক? ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সবজি আসে? আর সেই সবজি আশেপাশের বাড়িতেও সাপ্লাই হয়? ক্যানিং... ক্যানিং... উষারানির বাড়ি তো ক্যানিং-এ। আর, খুনের দিন মঞ্জুদেবীর রান্নাঘরে ঝুড়িভরতি সবজি তো এখনও ভাসছে চোখের সামনে। তা হলে কি ...

প্রায় ছুটেই ধাবায় ফেরেন মলয়। ম্যানেজার একটু অবাকই হন সামান্য হাঁফাতে থাকা মলয়কে দেখে।

মলয় বোঝেন, এবার আইডেন্টিটি কার্ডটা বার করা দরকার। লালবাজারের গোয়েন্দা, পরিচয় পেয়ে ম্যানেজারের ব্যবহার বদলে যায় নিমেষে। কেজো ভদ্রতার জায়গা নেয় সমীহ।

—কী ব্যাপার স্যার, কিছু ফেলে গেছেন?

—না, আচ্ছা ওই ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সবজি আসে বলছিলেন না? ক্যানিং থেকে কারা আসে?

—এক-দু'জন নয় স্যার, পাঁচ-ছ'জন আসে। রোজ রোজ একই লোক তো আসে না। কোনওদিন দু'জন এল, কোনওদিন হয়তো তিন বা চার। কেন স্যার? কী ব্যাপার?

—ক্যানিং থেকে সবজি শেষ কবে এসেছিল এখানে?

—পরশু, বা তরশু হবে।

—তার আগে?

—তার আগে... তার আগে... সপ্তাহখানেক আগে বোধহয়... দাঁড়ান রেজিস্টারে তো লেখা থাকে কবে কোথাকার মাল ঢুকল।

—সপ্তাহখানেক আগে যারা সবজি দিয়ে গিয়েছিল, তাদের চেহারা মনে আছে?

—না স্যার, ডেলিভারি কর্মচারীরা নেয়, আমার তো কাউন্টারে বসেই কাটে বেশিরভাগ সময়টা...

—আপনি রেজিস্টারটা বের করে রাখুন, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি ঘুরে। ডেলিভারি যারা নেয়, তাদের সঙ্গে কথা বলব।

ম্যানেজার আঁচ করতে পারেন, গুরুতর কিছু একটা ব্যাপার আছে ক্যানিং-এর সবজি নিয়ে। জিজ্ঞেস করে ফেলেন, স্যার, শুধু ক্যানিং, না লক্ষ্মীকান্তপুর-বজবজও দেখে রাখব?

—আপাতত শুধু ক্যানিং। আসছি ঘুরে।

ঘুরে আর এলেন না মলয়। প্রয়োজন পড়ল না। উষারানিকে কালীঘাট থানায় ডেকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন সাড়ে চারটে নাগাদ। প্রাথমিক জেরায় উষা বলেছিলেন, এক মেয়ে তাঁর। বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তেমন। এবারও একই কথা বললেন। কিন্তু মলয় এবার আর সেই ভুল করলেন না, যেটা প্রথমবার করেছিলেন। মঞ্জুদেবীর মেয়ে মানসী এককথায় উষারানিকে 'ক্লিনচিট' দেওয়ার পর সেভাবে আর গভীরে গিয়ে নাড়াচাড়া করেননি ওঁর পরিবারের দিকটা। এবার করলেন।

—কোথায় থাকে আপনার মেয়ে-জামাই?

—ক্যানিং লাইনেই থাকে। বারুইপুরের দিকে। গ্রামের নামটা জানি না।

—মেয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না?

—না স্যার, ন'মাসে ছ'মাসে একবার।

—শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

—মাস ছয়েক আগে স্যার। টুম্পার, মানে আমার মেয়ের বাচ্চা হওয়ার সময়। বাচ্চাটা বাঁচেনি। হাসপাতালেই মারা গিয়েছিল।

মলয় আর দুটো প্রশ্ন করেন শুধু।

—জামাইয়ের নামটা বলুন। আর বাচ্চা হওয়ার সময় কোন হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল টুম্পা?

—সুশীল সর্দার। ক্যানিং সদর হাসপাতাল।

সন্ধেয় আর বাড়ি ফেরা হয় না উষারানির। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বসিয়ে রাখা হয় থানায়, মহিলা পুলিশের জিম্মায়।

বাড়ি ফেরা হয় না মলয়েরও। যাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, ক্যানিং-কানেকশনেই লুকিয়ে আছে রহস্যের চাবিকাঠি। ওসি হোমিসাইডকে জানালেন সব। সাত-আটজন অফিসারের টিম পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছল কালীঘাট থানায় এবং রওনা দিল পত্রপাঠ। গন্তব্য, ক্যানিং সদর হাসপাতাল।

যেতে যেতেই মোবাইলে মানসীকে ধরলেন মলয়।

—মায়ের বাজার তো আপনিই করে দিতেন, না?

—হ্যাঁ, সপ্তাহে একবার। সাত-আটদিনের বাজার করে দিয়ে আসতাম। হয় আমি, নয়তো হাজ়ব্যান্ড।

—সবজি কেনাকাটার আলাদা লোক ছিল?

—না তো! আমিই যা কেনার, কিনে দিয়ে আসতাম। কেন?

—এমনিই। অন্য কেউ তরিতরকারি দিতে আসত না, শিয়োর আপনি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তেমন কেউ থাকলে আমি জানব না, হয়?

—আচ্ছা, মায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে বাজার, আই মিন, সবজি-বাজার করে দিয়ে এসেছিলেন?

একটু ভেবে মানসী উত্তর দেন, 'দিনপাঁচেক আগে হবে। কেন বলুন তো?'

—না, তেমন কিছু না। থ্যাঙ্ক ইউ।

কৌতূহলী মানসী আর কোনও প্রশ্ন করার আগেই ফোন রেখে দিয়েছিলেন মলয়। গাড়ি ছুটছিল ক্যানিং-এর দিকে, আর ধমনীতে অ্যাড্রিনালিনের বাড়তি ক্ষরণ দিব্যি টের পাচ্ছিলেন মলয়। সেই অনুভূতি, যা শব্দ খরচ করে বোঝানো দুঃসাধ্য। যা তদন্তকারী অফিসারমাত্রই অনুভব করেন কোনও জটিল মামলার সম্ভাব্য কিনারার অতর্কিত আভাসে। মানসী বলছেন, খুনের পাঁচ দিন আগে বাজার করে দিয়ে এসেছিলেন। আর কোন লোক ছিলও না তরিতরকারি সাপ্লাই করার। তা হলে পাঁচদিন পরও ঝুড়িভরতি সবজি থাকে কী করে? কারা দিয়ে গিয়েছিল সবজি? কবে? কখন?

ডিসি সাউথ ফোন করে রেখেছিলেন ক্যানিং হাসপাতালের সুপারকে। সুপার নিজেই উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার নিয়ে। হ্যাঁ, মাসছয়েক আগে একটি সদ্যোজাতা শিশুকন্যা মারা গিয়েছিল প্রসবের পরেই। মায়ের নাম টুম্পা সর্দার। বাবার নাম সুশীল সর্দার। ঠিকানা, বারুইপুর থানার মাঝেরহাট গ্রাম।

মলয় যখন টিম নিয়ে মাঝেরহাট গ্রামে সুশীলের বাড়িতে কড়া নাড়লেন, রাত প্রায় ন'টা। সুশীল পুলিশ দেখে হকচকিয়ে গেলেন। মলয় সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'গয়নাগাটি যা কালীঘাট থেকে পেয়েছিলেন, বার করুন, আর যেটা দিয়ে খুনটা করেছিলেন, সেটাও।'

সুশীল 'কোন খুন? আমি কিছু জানি না!' জাতীয় প্রতিরোধের রাস্তায় গেলেনই না। কবুল করলেন সোজাসাপটাই, 'বলছি স্যার, সব বলছি। তবে আমি একা করিনি। কাকাও ছিল।'

—কাকা?

—স্বপন সর্দার, কাছেই থাকে।

—নিয়ে চলুন কাকার বাড়ি।

—বাড়িতে পাবেন না স্যার। বাজারে কাকার অনেক ধারদেনা। পাওনাদারদের জ্বালায় বাড়িতে থাকে না। আমি জানি কোথায় থাকে। চলুন।

স্বপনকে গ্রেফতার করা হল সুশীলের দেখিয়ে দেওয়া ডেরা থেকে। কাকা-ভাইপোকে নিয়ে গোয়েন্দাবিভাগের টিম কলকাতা রওনা দেওয়ার পর গাড়িতে গা এলিয়ে দেন মলয়। যাক, ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা এবার করে ফেলতে হবে। আর রাসবিহারীর ধাবার ম্যানেজার ভদ্রলোককেও একটা থ্যাঙ্কস দিয়ে আসতে হবে কাল। ভাগ্যিস সবজিটা অমন বিস্বাদ হয়েছিল, ভাগ্যিস উঠেছিল ক্যানিং-এর কথা। আছে আছে, মলয় দত্তের টেলিপ্যাথির জোর আছে!

বারুইপুর থেকে কলকাতায় ফেরার পথে মলয়কে খুনের বৃত্তান্ত খুলে বললেন সুশীল-স্বপন। জানা গেল, ঠিক কী ঘটেছিল।

সুশীলের বয়স বাইশ-তেইশ। স্বপনের মধ্যতিরিশ। দু'জনেরই রুজিরোজগার অন্যের জমিতে চাষবাস করে। মাঝেমাঝে সবজি বেচতে আসতেন কলকাতায়, হোটেল-ধাবায়।

ঘোর অর্থাভাব ছিল দু'জনেরই। সুশীলের বাবা ছিলেন প্রতিবন্ধী। মা-ও ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রান্নাঘরে পড়ে গিয়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন মাথায়। সংসার চালানোর পুরো দায়িত্বই ছিল সুশীলের উপর। যে দায়িত্ব দুর্বহ হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। চাষবাসের কাজ করে কতটুকুই বা আয় হয়? তবু কষ্টেসৃষ্টে চলে যেত কোনওরকমে। মায়ের অসুস্থতার পর অর্থসংকট গভীর হয়েছিল। চিকিৎসার খরচেই মাসিক উপার্জনের অর্ধেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছিল। বছর দুয়েক আগে বিয়ে করার পর এমনিই খরচ বেড়েছিল সংসারের। টুম্পার ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারতেন আগে। এখন সে পাটও চুকেছে। বউয়ের মুখ আজকাল গোমড়াই থাকে সারাক্ষণ।

এভাবে আর কতদিন? রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতেন সুশীল। ঘটিবাটি বন্ধক রাখতে হবে এবার। কিন্তু তা দিয়েই বা কী হবে? বাড়িতে কী-ই বা আছে তেমন দামি কিছু? খেয়েপরে বাঁচতে গেলে, মায়ের চিকিৎসা চালাতে গেলে, টাকার দরকার। বেশ কিছু টাকার। কে দেবে? ধার নিলে আর এক বিপদ। শোধ তো দিতে হবে সুদসহ। না পারলে কাকার মতো অবস্থা হবে।

'কাকার মতো অবস্থা' মানে পাওনাদারদের তাগাদায় ভিটেছাড়া হওয়া। স্বপন সর্দারের জুয়ার নেশা ছিল দুরারোগ্য পর্যায়ের। যা রোজগার করতেন, পুরোটাই উড়িয়ে দিতেন জুয়ার ঠেকে। ফলে অবধারিত আর্থিক অনটন এবং পেট চালাতে ধার করা। পাওনাদাররা সকাল-সন্ধে হানা দিত স্বপনের বাড়িতে। ধার শোধ দিতে অপারগ স্বপন বাধ্য হয়েছিলেন বাড়ির মায়া ত্যাগ করতে। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু সেখানে, এ-ভাবেই কাটত।

কাকার মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো অসম্ভব মা-বাবা-বউকে ছেড়ে। তার চেয়ে

চুরি-ডাকাতি করাই বোধহয় ভাল। যা হবে, দেখা যাবে। আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতেই একদিন মাথায় এল কালীঘাটের 'দিদার' কথা। টুম্পার মা ওই বাড়িতে অনেক বছর ধরে কাজ করেন। বিয়ের পর টুম্পাকে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার ওই ফ্ল্যাটে। শাশুড়িই নিয়ে গিয়েছিলেন মেয়ে-জামাইকে। ওই দিদার কাছে টাকা ধার চাইলে কেমন হয়? কিন্তু যদি না দেয়? কথা নেই বার্তা নেই, এতদিন পরে হুট করে গিয়ে টাকা চাইলে না দেওয়ারই কথা। না দিলে? সুশীল মনস্থির করে ফেলেন।

পরের সন্ধেয় কাকা-ভাইপোর দেখা হয়। সুশীল খুলে বলেন প্ল্যান।

—কালীঘাটে এক বুড়ি দিদার বাড়ি চিনি আমি। দাদু মারা গেছে। দাদু-দিদা দু'জনেই ভাল চাকরি করত। গিয়ে টাকা চাইব। না দিলে কেড়ে নেব। যাবে?

না গিয়ে উপায়ও ছিল না স্বপনের। আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পেতে তিনিও একই রকম মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। স্বপন রাজি হয়ে গেলেন। এবং ৬ নভেম্বর ভোরের ট্রেনে চড়ে বসলেন কাকা-ভাইপো। খুন-জখম বাদ দিন, ছিঁচকে চুরি বা পকেটমারিরও কোনও পূর্বইতিহাস ছিল না যাঁদের।

সুশীল একটা ছুরি নিলেন সঙ্গে। আর একটা চটের ব্যাগ মাঝারি সাইজের। যাতে রইল টাটকা সবজি কিছু।

মঞ্জুর ফ্ল্যাটে বেল বাজল ন'টা নাগাদ। উষা এবং জগদীশ তখন কাজ সেরে বেরিয়ে গেছেন। মঞ্জু বাড়িতে একা। ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

—দিদা, আমি সুশীল। উষার জামাই। আপনার জন্য একটু টাটকা সবজি নিয়ে এসেছি। এদিকে কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

অচেনা লোক নয়, উষার জামাই। আগেও এসেছে একবার। মঞ্জু দরজা খুলে দিলেন। সুশীল ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কাকাকে নিয়ে।

—দিদা, এঁর নাম স্বপন। আমার কাকা।

চটের ব্যাগ থেকে সবজি বার করলেন সুশীল। মঞ্জু রেখে এলেন রান্নাঘরের ঝুড়িতে। এতদূর থেকে সবজি নিয়ে এসেছে, এক কাপ চা না খাওয়ালে খারাপ দেখায়। উষাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন। তার জামাইকে চট করে বিদায় করে দেওয়া যায় না। সুশীল-স্বপনকে নিজের ঘরে বসিয়ে চা তৈরি করতে রান্নাঘরে ঢুকলেন মঞ্জু। নিজের জন্যও বানালেন এক কাপ।

চা খেতে খেতে এটা-সেটা কথার মধ্যেই সুশীল পাড়লেন টাকার কথা। বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, কিছু টাকা ধার পেলে ভাল হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শোধ দিয়ে দেবেন। মঞ্জু এবার বিরক্ত হলেন। এ যে দেখি খেতে পেলে শুতে চায়! সটান বলে দিলেন, 'টাকা দিতে পারব না। আর উষা জানে, তোমরা এসেছ আজ?' সুশীল যেটা সত্যি, সেটাই বললেন। উষা সত্যিই জানতেন না জামাই এবং তার কাকার এই প্ল্যানের বিন্দুবিসর্গও।

'তোমরা এখন যাও' বলে ডাইনিং টেবিলের চেয়ার ছেড়ে মঞ্জু উঠে দাঁড়ানো মাত্রই তাঁর হাত চেপে ধরলেন সুশীল। বাকিটা রইল সুশীলেরই বয়ানে।

—দিদার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। দিদা চিৎকার করতে যেতেই কাকা ডাইনিং টেবিলের কোণে পড়ে থাকা একটা কাপড় দিয়ে মুখ চেপে ধরল। তারপর মুখে ঘুসি মারল খুব জোরে। আমি ছুরিটা বার করলাম। আমাদের তো চিনেই গেছে। মেরে ফেলা ছাড়া উপায়ও নেই। না হলে জেলের ঘানি টানতে হবে। গলায় চালালাম ছুরি। তারপর পেটে।

দিদা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমি ছুরিটা দিদার নাইটিতে মুছে নিলাম। রেখে দিলাম ব্যাগে। অনেক চেষ্টা করেও আলমারিটা খুলতে পারলাম না। চাবিই পেলাম না। ক্যাশ বলতে পেলাম বাইরে এদিক-ওদিক যা ছিল ব্যাগে-ট্যাগে, হাজার দুয়েক মতো। দিদার গলা থেকে সোনার চেন আর হাত থেকে চুড়ি খুলে নিলাম। যখন এসব চলছিল, তখন একবার বেল বেজেছিল। আমরা খুলিনি। একটু পরে চুপচাপ দরজা খুলে ফাঁক করে যখন দেখেছি কেউ নেই, তখন চট করে নেমে গিয়েছি।

মলয় বোঝেন, ওই যে একবার বেল বেজেছিল, ওটা শুভঙ্কর বাজিয়েছিলেন। আনন্দবাজারের কর্মী।

সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল ঠাসবুনোট। যে ব্যাগে ছুরি নিয়ে এসেছিলেন, ফেরার ট্রেন ধরার সময় বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন সুশীল। বয়ান অনুযায়ী উদ্ধার হল সেই ছুরি। লুঠ করা গয়না বারুইপুরের এক দোকানে বন্ধক রেখেছিলেন স্বপন। উদ্ধার হল সেগুলোও, দোকানি আদালতে চিহ্নিত করলেন স্বপনকে। আর মানসী শনাক্ত করলেন মায়ের গয়না।

বিচারসিদ্ধান্তের অংশ

আলমারি আর চায়ের কাপে পাওয়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেল আততায়ীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট। স্বপন একটা আংটি পরতেন ডান হাতে। যে হাতে মঞ্জুকে ঘুসিটা মেরেছিলেন, গাল ছড়ে গেছিল মঞ্জুর। ওই 'abrasive wound' যে আংটির আঘাতে হওয়া সম্ভব, তারও উল্লেখ ছিল ফরেনসিক রিপোর্টে। সর্বোপরি

আদালতে স্বপন স্বেচ্ছায় জবানবন্দিও দিয়েছিলেন, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে।

২০১৭-র সেপ্টেম্বরে রায় বেরিয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত করে সুশীল-স্বপনকে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত করেছিলেন বিচারক।

পরিচিত ভেবে মঞ্জু দরজা খুলেছিলেন, বিশ্বাস করে। চা খাইয়েছিলেন। তারপর খুন হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো যেমন পাপ, কখনও কখনও মানুষকে বিশ্বাস করাও? শেষ বিচারে তা হলে কী দাঁড়ায় এ মামলার নির্যাস?

বিশ্বাসই বিশ্বাসঘাতক।

ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন

একবার দেখলে আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে হয়।

মহিলা সত্যিই চোখ টানার মতো সুন্দরী। দেখে মনে হয় বয়স মাঝতিরিশ। ববকাট চুলে আঙুল চালাচ্ছেন ট্যাক্সি থেকে নেমে। যেটা এসে থেমেছে বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল গেটের ঠিক সামনে।

প্রি-পেইড ট্যাক্সি বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলোচ্ছিলেন সৌম্য। দেখার মতো কিছু থাকে না এয়ারপোর্টে। কী বাইরে, কী ভিতরে। সব শহরেই একই ছবি। একই ধাঁচের বিল্ডিং। একের পর এক গাড়ি এসে থামছে বাইরের রাস্তায়। হয় অ্যারাইভালে, নয় ডিপার্চারে।

যাঁরা উড়ে যাবেন অন্য শহরে, তাঁরা লাগেজ ট্রলি টেনে এনে মালপত্তর রাখছেন। এগোচ্ছেন এন্ট্রি গেটের দিকে। যাঁরা ঝাড়া হাত-পা, তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে আরও আগে পৌঁছে যাচ্ছেন গেটে। যন্ত্রও লজ্জা পাবে, এমন মুখ করে টিকিট চেক করছেন বিমানবন্দরের কর্মী। সজাগ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করছেন পাশে দাঁড়ানো সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী।

যাঁদের উড়ান এই শহরমুখী, বেরনোর গেটে তাঁদের জন্য ভিড়। আত্মীয়স্বজন যত, তার থেকে বেশি জটলা ড্রাইভারদের। একটু পরেই যাঁরা আরোহী হবেন পার্কিংয়ে থাকা গাড়িগুলোর, তাঁদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষমাণ। চোখ ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে। যার লেখাগুলো ঘনঘন পালটাচ্ছে। অমুক ফ্লাইট ইজ় ডিলেইড। তমুক ফ্লাইট হ্যাজ় জাস্ট ল্যান্ডেড।

এয়ারপোর্ট বড্ড একঘেয়ে লাগে সৌম্যর। শহরের নামটা শুধু বদলে দিলেই হল। বাকি সব মোটামুটি উনিশ-বিশ। বাইরের ভিড়ের মধ্যেও একটা দমবন্ধ শৃঙ্খলা। চলো নিয়মমতে। এর থেকে স্টেশন ভাল। তুমুল ভিড়ভাট্টা আছে। পারিপাট্যের অভাব আছে। হকারের হইহই আছে। কিন্তু চরিত্র আছে। প্রাণ আছে। এক এক শহরে এক এক রকমের স্থাপত্য। শুধু নাম বদলায় না। বাড়িও বদলে যায়।

এলোমেলো ভাবনায় ছেদ পড়ে সঙ্গী অফিসারের কনুইয়ের গুঁতোয়।

—স্যার... ওই দেখুন.. লিন্ডা!

সতীর্থের দৃষ্টিপথ অনুসরণ করেন সৌম্য। ববকাট চুলের সুন্দরী দাঁড়িয়ে পড়েছেন বেরিয়ে আসার গেটের সামনে। একবার চোখ রাখলেন কবজিতে বাঁধা ঘড়িতে। তাকালেন ডিসপ্লে বোর্ডে।

কোন ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছেন মহিলা, জানা ছিল সৌম্য এবং সঙ্গীদের। দুবাই টু কলকাতা, এমিরেটস-এর উড়ান কলকাতার মাটি ছুঁল আধঘণ্টার মধ্যেই। অন্য অনেকের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন এক সুগঠিত চেহারার যুবক। যাঁকে বেরতে দেখেই এগিয়ে গেলেন মহিলা। জড়িয়ে ধরলেন আলতো। এবং আলিঙ্গনপর্ব শেষ হতে না হতেই দেখলেন, দুই মহিলা সহ চারজন ঘিরে ধরেছেন আচমকা। যাঁদের একজন সরাসরি যুবকের হাত চেপে ধরেছেন, কোনও ভূমিকা না করেই অল্প কথায় বলেছেন, যা বলার ছিল।

—ইয়োর গেম ইজ় আপ..

—হোয়াট? হোয়াট গেম আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? আই ডোন্ট গেট দিস ...

কৌতূহলী ভিড় জমার আগেই পকেট থেকে আই কার্ড বার করেন সৌম্য, মেলে ধরেন দুবাই থেকে সদ্য কলকাতায় আসা যুবকের সামনে। সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা পুলিশ।

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যা অবধারিত, চোখমুখ নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে যায় যুবকের। মহিলারও।

মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা টাটা সুমো এসে থামে গেটের সামনে। যাতে দু'জনকে চাপিয়ে গাড়ি বেরয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে।

গন্তব্য? কোথায় আর? গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার!

গোওওওল! বল জড়িয়ে গেছে জালে। তারপর যা হয়, গোলদাতাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস এক দলের। গোলকিপারকে নিয়ে হা-হুতাশ বিপক্ষের।

শীতশেষের ফেব্রুয়ারিতে ফুটবলের তেমন চল নেই কলকাতা ময়দানে। ব্যাটে-বলেরই দাপট থাকে ওসময়টা। ময়দানের এই মাঠটায় ছেলেগুলো তবু দিব্যি ফুটবল পেটাচ্ছে। অফ সিজ়ন প্র্যাকটিস?

মাঠের বাইরে একটা চেয়ারে বসে লাল-কালো ট্র্যাকসুট পরিহিত যিনি নজর রাখছেন ছেলেগুলোর উপর, তাঁর দিকে এগিয়ে যান দুই যুবক। নিয়মরক্ষার আলাপ-পরিচয়ের পর সোজাসুজি আর্জি জানান।

—দাদা, আমাদের একটা ভাল স্ট্রাইকার চাই। বলটা যে মোক্ষম সময়ে তিন কাঠির মধ্যে রাখতে পারবে। গোল করার লোক নেই আমাদের টিমে।

লাল-কালো ট্র্যাকসুট চুপ করে শুনলেন। এবং তারও মিনিটখানেক পর সামান্য হাসলেন। সে হাসি দেখে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মনে পড়ে যায় দুই যুবকের। শুণ্ডির রাজা মেয়ের জন্য পাত্র হিসেবে গুপীকে ভেবে রেখেছেন শুনে বাঘার মাথায় বজ্রাঘাত। উদভ্রান্ত বাঘাকে আশ্বস্ত করে হল্লারাজার টিপ্পনী, 'রাজকন্যা কি কম পড়িতেছে?' অবিকল সেই হাসি ভদ্রলোকের মুখে। শুধু 'রাজকন্যা'-র বদলে 'ফুটবলার' বসিয়ে দিতে হবে, এই যা। শেষ দৃশ্য 'আর কম পড়িতেছে?'—মার্কা হাসি।

—স্ট্রাইকার? পাচ্ছেন না? তা বাজেট কত আপনাদের?

—আপনিই বলুন মিল্টনদা, কত দিতে হবে? আসলে সঞ্জয়ের হঠাৎ চোট হয়ে গেল। সঞ্জয়, আমাদের টপ গোলস্কোরার। লিগামেন্ট টিয়ার, মাঠে ফিরতে ফিরতে বেশ কয়েক মাস তো বটেই। এদিকে পাঁচ দিন পরে ফাইনাল... ভাল স্ট্রাইকার ছাড়া কোনও চান্স নেই আমাদের।

—খেলা কোথায়? কত মিনিটের?

—পাইকপাড়ায়। এই খেপ টুর্নামেন্টটা প্রতি বছর এ সময়েই হয়। সত্তর মিনিট। থার্টিফাইভ — থার্টিফাইভ।

—হুঁ, বিদেশি ছেলে আছে একটা। বেনসন। গত বছর কলকাতা লিগের সেকেন্ড ডিভিশনে খেলেছে। তেরোটা গোল করেছে। দু'পায়েই ভাল শট আছে। হেডটাও ভাল। সিক্স ফিট প্লাস... হাইটটা কাজে লাগাতে জানে।

হাতে যেন চাঁদ পান দুই যুবক।

—ওর কথা আমরাও শুনেছি। ওকে পেলে তো কথাই নেই কোনও... ইন ফ্যাক্ট, ওর জন্যই আসা... দিন আমাদের ছেলেটাকে... প্লিজ় দাদা... আমরা জানি, আপনি যেখানে খেলতে বলেন, সেখানেই খেলে ও।

তৃপ্তির হাসি হাসেন 'দাদা'। মধ্যপঞ্চাশের মিল্টনদা। 'প্রাচীন ময়দান প্রবাদ' অনুযায়ী যিনি এখানে-ওখানে ছোটখাটো 'খেপ' টুর্নামেন্টে ফুটবলার সাপ্লাইয়ে ডক্টরেট করে ফেলেছেন।

—ম্যাচ প্রতি পাঁচ হাজার নেয়। পোষাবে?

সোজাসাপটা কথা। তেল মাখতে গেলে কড়ি ফেলতে হবে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন দুই যুগল।

—পাঁচ? একটা ম্যাচের জন্য একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে... কিন্তু আপনি যখন বলছেন গোলটা ভাল চেনে, তখন না হয় পাঁচই দেব। ফাইনালটা জিততেই হবে যে ভাবে হোক। প্রেস্টিজের ব্যাপার..

ফের একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন মিল্টনদা।

—আমি যখন বলছি মানে? না ভাই .. আমি বলছি বলে দিতে হবে না। নিজেরাই দেখে নিতে পারেন। পরশু বেনসন একটা খেপ খেলতে যাবে। ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখে নেবেন। টাকাপয়সার কথা না হয় তারপর হবে।

—না... মানে... আমরা ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি... আসলে অনেকগুলো টাকা তো... কোথায় খেলা পরশু?

—হাওড়ায়। সাঁতরাগাছি পেরিয়ে। বিকেল তিনটেয়।

হাওড়ার মাঠটা ঠিক কোথায়, মিল্টনের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে হাঁটা দেন ওঁরা দু'জন। যাঁদের একজন প্রশ্ন করেন অন্যকে, 'সেভেন্টি মিনিটের ম্যাচে পাঁচ হাজারটা একটু বাড়াবাড়ি না!'

উত্তরও আসে চাঁচাছোলা, 'ওটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। দশ চাইলেও দিতে হত, বিশ চাইলেও দিতে হত, জানিসই তো!'

—আমরা জাস্ট ক্লুলেস স্যার... এমন তো কখনও হয়নি আগে!

শুনতে শুনতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে নগরপালের। এটা তো নতুন ধরনের ক্রাইম। এ শহরে অন্তত এর আগে হয়নি। বাকি দেশেও হয়েছে কি? মনে তো হয় না।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের RCU (Risk Containment Unit, গ্রাহক এবং ব্যাংক, আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া যাতে দুই তরফেই থাকে যথাসম্ভব ঝুঁকিহীন, সেই শাখা)-এর প্রধান রীতিমতো ঘামছিলেন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে।

—আমরা বুঝতে পারছি না কী করব ... ফিনান্সিয়াল লস কুড়ি লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। হেড অফিস থেকে রোজ ফোন, রোজ মেল। পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, টেকনিক্যাল কোনও প্রবলেম, যেটা ইন্টারন্যালি সর্ট আউট হয়ে যাবে। কিন্তু হচ্ছে না... প্লিজ় ডু সামথিং স্যার।

—কী ব্যাপার? কীসের লস?

—সংক্ষেপে, বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকদের এটিএম কার্ডের তথ্য কোনওভাবে জেনে যাচ্ছে জালিয়াতরা। ধরুন, আমেরিকার ব্যাংকে মার্কিন নাগরিক রামের টাকা রাখা আছে। রামের কাছে সেই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড আছে। সেই কার্ডের যাবতীয় তথ্য চুরি হয়ে ঢুকে যাচ্ছে এদেশের কোনও ব্যাংকের গ্রাহক শ্যামের ক্রেডিট কার্ডে। রামের কার্ডের ব্যালান্স নিয়ে শ্যাম দেদার কেনাকাটা করে চলেছে। এইভাবেই যদুর টাকা নিয়ে মধু।

এবার রাম যখন জানতে পারছে যে তার টাকা অন্য কেউ হাওয়া করে দিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই দ্বারস্থ হচ্ছে ব্যাংকের। ফেটে পড়ছে ক্ষোভে। ব্যাংকের কাছে দাবি করছে লোপাট হয়ে যাওয়া টাকার ক্ষতিপূরণ। মার্কিন ব্যাংক তখন আর কী করবে? ভারতের যে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জালিয়াতিটা হয়েছে, তাদের কাছে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সহ চিঠি পাঠাচ্ছে, 'আমাদের গ্রাহকের হকের টাকা ফেরত দাও।' ফেরত না দিয়ে উপায় নেই। দিতে হচ্ছে, এবং ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

আইসিআইসিআই ব্যাংক শিকার হয়েছে এই জালিয়াতির। যার ব্যাপ্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। দশ-বিশ হাজারের ব্যাপার নয়। ক্ষতির অঙ্ক লাখ ছাড়িয়ে কোটি ছুঁয়ে ফেলবে এভাবে চললে।

নগরপাল প্রশ্ন করেন ব্যাংককর্তাকে, 'আপনাদের ইন্টারন্যাল এনকোয়ারি কী বলছে?'

—সেটা তো চলছেই স্যার। কিন্তু ট্র্যাক পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। গত পরশু অবশ্য একটা জিনিস ঘটেছে।

—কী?

—শহরের যেখানে যেখানে আমাদের EDC (Electronic Data Counter) আছে, সবাইকে আমরা অ্যালার্ট করে দিয়েছিলাম। বউবাজারের একটা দোকানে একটা ছেলে গতকাল বেশ দামি একটা সোনার চেন

কিনে ক্রেডিট কার্ড দিয়েছিল। কার্ড দেখে দোকানের লোকের একটু সন্দেহ হয়। ছেলেটার কাছে আইডি প্রুফ দেখতে চাওয়া হয়। তখন এটা দিয়েছিল। এই যে...

পকেটে হাত ঢুকিয়ে যে কাগজটা বার করে আনেন ভদ্রলোক, সেটা একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জেরক্স। মুখের অবয়ব আবছা।

প্রথম সূত্র, সেই জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স

—স্যার, আমরা ভেরিফাই করেছি মোটর ভেহিকলস থেকে। এটা জাল।

নগরপাল চোখ বুলোন জেরক্সটায়। লাইসেন্সে নাম, মহম্মদ সিকন্দর।

—ঠিক আছে। একটা লিখিত অভিযোগ করুন লোকাল থানায়। রেজিস্টার্ড হয়ে যাক কেসটা।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার পর ইন্টারকমে ডিসি ডিডি-কে ধরেন সিপি।

—Anti Bank Fraud সেকশনের অফিসারদের নিয়ে বসতে চাই একবার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কার্ড স্কিমিং(Card Skimming)। শব্দ দুটো এখন শুধু পুলিশ নয়, প্রায় সবাই জেনে গেছেন। খবরের কাগজের দৌলতে স্কিমিং নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণাও হয়ে গেছে অনেকেরই। কয়েকমাস আগে এটিএম জালিয়াতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল কলকাতায়। বহু মানুষের টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছিল। মূল চক্রী ছিল কয়েকজন রোমানিয়ান নাগরিক। খুব দ্রুত যাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধরা গিয়েছিল বলে রক্ষে। না হলে আরও কত মানুষের কষ্টের টাকা যে বেমালুম উধাও হয়ে যেত, ঠিকঠিকানা নেই।

এ কাহিনি আজ থেকে আট বছর আগের। তখন 'কার্ড স্কিমিং' ব্যাপারটা যে কী, খায় না মাথায় দেয়, খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না অফিসারদের। শব্দ দুটো শোনা ছিল বড়জোর, এই পর্যন্তই। 'Anti Bank Fraud' বিভাগটাই চালু হয়েছিল মাত্র বারো বছর আগে। ২০০৬ সালে।

ব্যাংকের তরফে শেক্সপিয়র সরণি থানায় যে মামলাটা দায়ের করা হল, তার তদন্তভার পড়ল সাব-ইনস্পেকটর সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বর্তমানে বড়বাজার থানার ওসি) উপর। সিপি অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বুঝিয়ে বললেন স্কিমিংয়ের ব্যাপারে। এবং স্পষ্ট জানালেন, দ্রুত কিনারা করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এই জালিয়াতি চলতে থাকলে একটা সময় ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের টাকা আর নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং চাই অঙ্কুরেই বিনাশ।

অঙ্কুরে বিনাশ বললেই তো আর হল না। অপরাধের কী-কেন-কখন জানলে তবেই না অপরাধীর খোঁজ! ইন্টারনেট ঘেঁটে, বইপত্র পড়ে স্কিমিং সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করলেন সৌম্য। যথাসাধ্য বোঝালেন সতীর্থদেরও।

ক্রেডিট কার্ডের পিছনে যে বাদামি রঙের রেখাটা থাকে, তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে ঢোকানো থাকে কিছু তথ্য। যা সাধারণ ব্যাংক কর্মচারীদেরও জানার কথা নয়। সেই তথ্য চুরি করল কেউ। এবং প্রযুক্তির সাহায্যে অন্য ক্রেডিট কার্ডের পিছনের বাদামি রেখাটার ভিতর ঢুকিয়ে সেই কার্ড ব্যবহার করল। এটাই 'স্কিমিং'। কিন্তু চুরিটা হয় কী করে?

আপনি এটিএম কাউন্টারে গেলেন। কম্পিউটার স্ক্রিনের নীচে যেখানে একটা সবুজ রঙের যন্ত্রে লেখা থাকে, 'Insert your card here', সেখানে নিয়মমতো কার্ড ঢোকালেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না যে ওই যন্ত্রটির ওপরে লাগানো একটা অন্য যন্ত্রে (স্কিমিং ডিভাইস) মুহূর্তে রেকর্ড হয়ে গেল কার্ডে সঞ্চিত তথ্য। এরপর কি-বোর্ডে টাইপ করলেন গোপন পিন নাম্বার। কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি-বোর্ডের উপর নিখুঁত লাগানো আরেকটা কি-বোর্ডের মতোই দেখতে যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড হয়ে গেল আপনার পিন নাম্বার।

এটিএম ছেড়ে আপনি বেরিয়ে গেলে বাকিটা 'এসো ভাই, বোসো ভাই, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'-এর মতো সোজা। জালিয়াতরা কাউন্টারে ঢুকে খুলে নিয়ে গেল সেই স্কিমিং ডিভাইস, যেটা তারা আগে থেকে

লাগিয়ে রেখে গিয়েছিল। এবার চুরি করা তথ্যের মাধ্যমে ডামি কার্ড তৈরি করা এবং অন্যের টাকা আত্মসাৎ করা কোনও ব্যাপারই না।

আইসিআইসিআই ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছিল, নগরপালকে যা সংক্ষেপে বলেছিলেন ব্যাংককর্তা, সেটা আরও বিশদে জানালেন সৌম্য। কী? ধরা যাক, আজকের বাজারে ভারতীয় মুদ্রায় ১ ডলারের বিনিময়মূল্য ৭০ টাকা। এবার ধরুন, কোনও মার্কিন ভদ্রলোকের ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করল কেউ। তথ্য চলে এল ভারতে, শাগরেদের কাছে। ভুল ঠিকানা দিয়ে একটা ভারতীয় ক্রেডিট কার্ড যে আগেই তুলে রেখেছিল। যাতে ব্যালান্স ছিল জিরো।

এবার শাগরেদ কী করল, সোনার দোকানে গিয়ে ১০০ ডলার খরচ করে গয়নাগাটি কিনল। মানে, সাত হাজার টাকার গয়না। মার্কিন ভদ্রলোকের কার্ড থেকে ১০০ ডলার লোপাট হয়ে গেল। এবং চোর গয়না নিয়ে চম্পট। দোকানের মালিক জানলেন না, অমুকের কার্ডের তথ্য নিয়ে তমুককে গয়না বেচে দিলেন। বেচার সময় কার্ডটা দোকানে রাখা ছোট্ট মেশিনটায় ঘষে একটা 'চার্জস্লিপ' নামের যে চিরকুট বেরল, সেই স্লিপ ব্যাংকে জমা দিয়ে পরের দিন সাত হাজার টাকা তুলেও নিলেন দোকানি।

টনক নড়ল কখন? যখন সেই মার্কিন ভদ্রলোক নিজের ব্যাংকে গিয়ে হইচই করলেন। এটা কী ব্যাপার? আমার কার্ড থেকে সাত হাজার টাকার গয়না কেনাকাটার খরচ দেখানো হয়েছে। তা-ও আবার ভারতে গিয়ে। ইয়ার্কি নাকি? ভারতে যাইই নি কখনও! সত্যিই যাননি, পাসপোর্ট জানান দিচ্ছে স্পষ্ট। আমেরিকার ব্যাংক এবার ভারতীয় ব্যাংকের কাছে ১০০ ডলার চেয়ে পাঠাল অকাট্য তথ্যপ্রমাণ সমেত। ভারতীয় ব্যাংক নিজের কোষাগার থেকে টাকা দিতে বাধ্য হল। অথচ গয়নার দোকানদারকে সেই টাকাটা আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে চার্জস্লিপ অনুযায়ী। গয়না কেনার নথি তো কার্ডে ঠিকঠাকই ছিল। দোকানে খোঁজ নেওয়া হল। দোকানি বললেন, কোনও বিদেশি ওই গয়না কেনেনি। তা হলে?

'তা হলে'-র একটাই উত্তর। বিদেশি ভদ্রলোকের কার্ডের তথ্য চুরি করে ভারতীয় কার্ডে সেই তথ্য ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্কিমিং! যার জেরে আইসিআইসিআই ব্যাংককে লক্ষ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হচ্ছিল।

দেশের কোথাও তখনও, সেই ২০১০ সালে, এমন কোনও ঘটনা লিপিবদ্ধ নয়, যেখানে 'কার্ড স্কিমিং' করে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে। সাম্প্রতিক এটিএম জালিয়াতিতে রোমানিয়ার নাগরিকরা জড়িত ছিল। ভারতীয়দের কার্ডের তথ্য চুরি করে দুষ্কর্মটা ভারতীয় ব্যাংকের এটিএম-এই হয়েছিল। কিন্তু দশ বছর আগের এই মামলায় অবশ্য দেখা যাচ্ছিল, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকের কার্ডের তথ্য চুরি করে 'স্কিমিং' করা হয়েছে ভারতে। মানে, চক্র বিস্তৃত আমেরিকা পর্যন্ত!

ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল লালবাজারের। এক তো এ ধরনের অপরাধ ঘটেছে প্রথম। তদন্তের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। দুই, চক্রের একাংশ যদি থাকে বিদেশে, আর বাকিটা এদেশে, একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়ে যায় পুরো ব্যাপারটা। কিন্তু তা বলে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। এই গ্যাংটাকে ধরতে তো হবে।

'ধরতে হবে' ভাবা এক, আর 'ধরা' আরেক। 'লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে!' চেনা ছকের বাইরে অপরাধ। কাজে আসবে না সোর্স নেটওয়ার্ক। পুলিশই ভাল করে জানত না, কীভাবে এই জালিয়াতিটা করা যায়। সোর্স কী করে জানবে? অপরাধীদের সম্পর্কে কিছু 'ক্লু' পেলে তবেই সোর্সকে কাজে লাগানোর প্রশ্ন। আপাতত হাতে তথ্য কী? শুধু ওই জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের জেরক্স। আবছা মুখাবয়ব। নাম মহম্মদ সিকন্দর।

শহরের থানাগুলোকে সতর্ক করা হল। খবর পৌঁছে দেওয়া হল এলাকার সেই সমস্ত দোকানগুলোতে, যেখানে কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটার ব্যবস্থা রয়েছে। বলে দেওয়া হল, কেনাবেচার সময় চোখ-কান খোলা রাখতে। কোনও কার্ডের ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ হলেই পুলিশকে জানাতে সঙ্গে সঙ্গে। এবং মামলা রুজু

হওয়ার দিনদশেক পরে প্রথম খবর এল পার্ক স্ট্রিট থানায়।

‘খবর’ বলতে, একটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস-এর দোকানে দু’জন অল্পবয়সি ছেলে এসেছিল ল্যাপটপ কিনতে। সঙ্গে কার্ড। কিন্তু কার্ড ‘সোয়াইপ’ করার পর দেখা যায়, কার্ডের নম্বরের সঙ্গে প্রিন্ট স্লিপের কিছু তফাত আছে। একটি ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যজন? গেছে অন্য কার্ড আনতে।

থানা থেকে ‘ব্যাংক ফ্রড’ সেকশনে খবর আসতেই সঙ্গী অফিসারদের নিয়ে ছুটলেন সৌম্য। সুরাহা বোধহয় হয়েই গেল তদন্তের। আর সুরাহা! বছর বিশেকের যে ছেলেটি কাঁচুমাচু মুখে দোকানে বসে ছিল, তার নাম অঙ্কুশ তেওয়ারি। কলেজের গণ্ডি সবে ছাড়িয়েছে। বেকার। বাড়ি মানিকতলায়। আটক করা হল। জেরার পর্বটা তুলে রাখা হল লালবাজারে ফেরা পর্যন্ত। যে ছেলেটির অন্য কার্ড নিয়ে ফিরে আসার কথা, তার জন্য অপেক্ষা করা হল অনেকক্ষণ। কিন্তু সেই ছেলেটা সেই যে গেল, গেল তো গেল, আর এল না।

কে ছেলেটি? লালবাজারে রাতভর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে অঙ্কুশ জানাল, ছেলেটির সঙ্গে অল্প দিনেরই পরিচয়। নাম, মণিময় আগরওয়াল। আলাপ মিডলটন স্ট্রিটের এক চায়ের দোকানে। ছেলেটি দিনকয়েক আগে অঙ্কুশকে অনুরোধ করে, ‘তুই তো ভাই বেশ টেকস্যাভি, আমি একটা ল্যাপটপ কিনব ঠিক করেছি, দোকানে যাবি আমার সঙ্গে? স্পেসিফিকেশনগুলো জাস্ট বুঝিয়ে দিস কেনার সময়। যাতে ঠকে না যাই।’

—কোথায় থাকে মণিময়?

— ঠিকানা জানা নেই, তবে বলেছিল, আলিপুরের দিকে।

—মোবাইল নম্বর?

— মোবাইল আছে মণিময়ের, কিন্তু নম্বর জানি না।

—নম্বর জানা নেই মানে?

—সত্যি জানি না স্যার! আমার নিজের মোবাইল নেই। ওর মোবাইল নম্বর নেওয়ার দরকার পড়েনি সেভাবে।

উৎসাহিত হওয়ার মতো সূত্র একটাই। ড্রাইভিং লাইসেন্সে যে মহম্মদ সিকন্দরের ছবি ছিল, সেটা অঙ্কুশকে দেখানো হল। এবং অঙ্কুশ জানাল, এই ছবির সঙ্গে মণিময়ের মুখের প্রায় হুবহু মিল।

অঙ্কুশকে পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ ছেড়ে দিলেন গোয়েন্দারা। কুড়ি বছরের ছেলেটি লালবাজারের গেট থেকে বেরিয়ে যখন হাঁটা দিল, জানতেও পারল না, সাদা পোশাকে দু’জন অফিসার নিঃশব্দে অনুসরণ করছেন নিরাপদ দূরত্ব থেকে। যাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, মানিকতলার বাসিন্দা অঙ্কুশ দক্ষিণ কলকাতাগামী মিনিবাসে উঠে বসলেন। নিমেষের মধ্যে একই বাসে সহযাত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দুই অফিসার।

পার্ক সার্কাসের কাছে নামল অঙ্কুশ। কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঢুকল Ice Skating Rink—এর উলটোদিকের এক নামকরা কফিশপে। বেরিয়ে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। ফের হাঁটা দিল পার্ক সার্কাসের দিকে। এবং উঠে পড়ল উত্তরমুখী বাসে। কফিশপের সার্ভিস বয়ের সঙ্গে কথা বললেন অফিসাররা। অঙ্কুশ কিছুই অর্ডার করেনি। শুধু বলে গেছে, ‘আমার নাম অঙ্কুশ। আমার এক বন্ধুর একটু পরে এখানে আসার কথা। দু’জনে একসঙ্গে কফি খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমার একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় পুলিশে যেতে হবে। বাড়িতে ক’দিন আগে একটা চুরি হয়ে গেছে। কেস হয়েছে। পুলিশ ডেকেছে লালবাজারে। তাই থাকতে পারছি না। কেউ এসে আমার নাম করে খোঁজ করলে বলে দেবেন, আমি আজ আর আসব না।’

আরও জানা গেল, অঙ্কুশ মাসে এক-দু’বার এখানে আসে কফি খেতে। কখনও একা, কখনও সঙ্গে দু’-তিনজন বন্ধু থাকে। এই বন্ধুদের মধ্যে একজন ছ’ফুটের উপর লম্বা নাইজেরিয়ানও আছে। যাকে ‘বেনসন’ বলে ডাকে অন্যরা। বেশিরভাগ সময় ফুটবলের জার্সি আর শর্টস পরেই আসত বেনসন। সার্ভিস বয় কথায় কথায় জানতে পেরেছিল, বেনসন ফুটবলার। কলকাতা ময়দানে খেলে।

এটুকু বোঝা যাচ্ছিল, অঙ্কুশকে যতটা চালাক ভাবা গিয়েছিল, বাস্তবে তার থেকে একটু বেশিই চতুর।

কফির দোকানে যাওয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তার বন্ধু বা বন্ধুদের কাছে ওই সার্ভিস বয়ের মাধ্যমে খবর পৌঁছনো, পুলিশ 'ট্র্যাক' করছে। সাবধান!

যে বন্ধুর সঙ্গে অঙ্কুশের কথা ছিল কফিশপে দেখা করার, সে কে? মণিময় আগরওয়াল, যে কার্ড বদলে আনছি বলে পার্ক স্ট্রিটের দোকান থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল? না কি অন্য কেউ? কেউ আসেনি অঙ্কুশের খোঁজে। কোনওভাবে খবর দিয়ে দিয়েছিল অঙ্কুশ বাড়ি ফেরার পথে? কোন পিসিও বুথ থেকে ফোন করে দিয়েছিল? কী-ই বা এমন কঠিন!

ডিসি ডিডি মিটিংয়ে বসলেন অফিসারদের নিয়ে। যা যা তথ্য হাতের কাছে ছিল, ঝালিয়ে নেওয়া হল।

এক, অঙ্কুশ ছেলেটা গোলমেলে। সেই জিজ্ঞাসাবাদের পরদিন থেকে মানিকতলার বাড়ি আর পাড়ার বাইরে বেরচ্ছেই না প্রায়। মোবাইল নেই বলে আরও মুশকিল। কার সঙ্গে কীভাবে কখন যোগাযোগ করছে, জানার উপায় নেই।

দুই, মণিময় চক্রের সঙ্গে যুক্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। 'মহম্মদ সিকন্দর'-ই যে মণিময়, তা নিয়েও সংশয়ের জায়গা নেই। কফিশপের সার্ভিস বয় ছেলেটি বিহারি। লাইসেন্সের ছবি দেখে চিহ্নিত করেছে মণিময়কে। এবং জানিয়েছে, মণিময় তাকে বলেছিল, মল্লিকবাজারে তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাপড়ের দোকান আছে। ছট পুজোর আগে সস্তায় জামাকাপড় কিনিয়ে দেবে।

সে না হয় হল, কিন্তু মল্লিকবাজারে অসংখ্য কাপড়ের দোকান। কোনটা মণিময়ের আত্মীয়ের, কী করে জানা যাবে? সিদ্ধান্ত হল মল্লিকবাজারে নজরদারির। জাল লাইসেন্সের ছবির প্রিন্টআউট সঙ্গে নিয়ে সোর্সরা মাঠে নামল।

তিন, বেনসন। নাইজেরীয় ফুটবলার। যাকে দ্রুত চিহ্নিত করা দরকার, কোথায় থাকে জানা দরকার। কী করে ফুটবল ছাড়া, জানতে হবে।

—স্যার, অঙ্কুশকে আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয় না? সৌম্য প্রশ্ন করেন ডিসি ডিডিকে।

—করাই যায়। কিন্তু লাভ হবে কি কিছু? নতুন কিছু বেরবে? যেটুকু বলেছে, তার বেশি বলবে বলে মনে হয় না। আর যতটা বলেছে, তার থেকে খুব বেশি জানে তারও তো গ্যারান্টি নেই।

—হুঁ...

—একটু তলিয়ে ভাবো... অঙ্কুশ বা মণিময় জালিয়াতি চক্রের অংশ হতেই পারে, কিন্তু এই গ্যাং-এর শিকড় বিদেশে। কলকাতার দুটো ছেলের পক্ষে এই মাপের চক্র চালানো মুশকিল। এরা বড়জোর টিম মেম্বার। আসল পান্ডাদের খুঁজে বার করতে হবে। অঙ্কুশকে আর ডাকার দরকার নেই। ওকে ভাবতে দাও, ব্যাপারটা মিটে গেছে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা শ্যাডো করো। কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে দেখা করছে, সব...

—আর বেনসন?

—ওটা ইমপরট্যান্ট, ভেরি ইমপরট্যান্ট। ফরেন কানেকশন বলতে আপাতত বেনসনই। ওর সম্পর্কে খোঁজ নাও ডিটেলে। কোথায় থাকে, সেটা জানতে পারলে লোক বসিয়ে দাও বাড়ির সামনে। ওর মুভমেন্টের ব্যাপারেও রাউন্ড-দ্য-ক্লক রিপোর্ট জরুরি।

—ওকে আইডেন্টিফাই করাটা খুব সমস্যা হবে না স্যার। পেয়ে যাব মনে হয়। পেলে তুলে আনব লালবাজারে?

—নো। বাই নো মিনস। আমরা তো এখনও জানিই না ওর কতটা ইনভলমেন্ট। বা আদৌ ইনভলমেন্ট আছে কিনা। কিছু প্রমাণও নেই। কী হবে তুলে এনে? একটা কফিশপে অঙ্কুশ-মণিময়ের সঙ্গে সময় কাটায়। তো? হোয়াট ডাজ় দ্যাট প্রুভ?

—রাইট স্যার...

—জিজ্ঞেস করার মতো কিছু তো নেই এখনও। তারপরও ডাকলে উলটো ফল হবে। আমাদের ছেড়ে

দিতে হবে ইন্টারোগেশনের পর। আর যদি সত্যিই ও এই চক্রের সদস্য হয়, তা হলে বেরিয়ে গিয়েই বাকিদের অ্যালার্ট করে দেবে। একটা ফোন, বা একটা ই-মেল, একটা টেক্সট মেসেজ, ব্যস। আপাতত লোকটাকে ট্র্যাক করে ওর উপর নজরদারি চালানো ছাড়া কিছু করার নেই।

ট্র্যাক করার জন্য যা করণীয় ছিল, করলেন সৌম্য। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) অফিসে পরের দিন দুপুর নাগাদ ঢুঁ মারলেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে।

নাইজেরিয়ান ফুটবলারদের লিস্ট পাওয়া যাবে? ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশনের? চলতি মরশুম এবং তার আগের দু'-তিন বছরের?

আইএফএ-র কর্মকর্তা ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে।

—কী দরকার? খেপ?

সৌম্য হাসেন অপ্রস্তুত।

—হ্যাঁ... মানে... কী করে বুঝলেন?

মধ্যবয়সি কর্মকর্তার ঠোঁটে একটা বিদ্রুপের হাসি খেলে যায়। যেন মাছকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ভাই সাঁতার শিখলে কী করে?

—ফেব্রুয়ারিতে নাইজেরিয়ান প্লেয়ারের খোঁজ করতে একটা কারণেই লোক আসে।

—দাদা, আমরা আসলে একজন ভাল স্ট্রাইকারের খোঁজ করছিলাম। বেনসন বলে একটা ছেলে শুনেছি ভাল খেলছে ইদানীং। কিন্তু ঠিকানা জানি না। যদি একটু যোগাযোগ করা যায়... সে জন্যই...

—বেনসন? এবার সেকেন্ড ডিভিশনে খেলেছে ছেলেটা। অনেক গোল-টোল করেছে শুনেছি। পরের রার হয়তো ফার্স্ট ডিভিশনে টিম পেয়ে যাবে।

সৌম্য আড্ডা জমানোর চেষ্টা করেন।

—বড় টিম? মানে মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল?

কর্মকর্তা ফের হাসেন। একটা সিগারেট ধরান।

—দুর মশাই। খেপেছেন? অত সোজা? সবাই কি চিমা ওকোরি বা এমেকা ইউজিগো নাকি? ছোট টিমগুলোও এখন বড় চেহারার বিদেশি খোঁজে। যারা অ্যাটাকিং থার্ডে গুঁতোগুঁতি করে গোলটা করে দেবে ঠিক সময়ে। অ্যাটাকিং থার্ড কাকে বলে জানেন তো?

সৌম্য মৃদু হাসেন। ফুটবল নিয়ে কর্মকর্তার কচকচি অসহ্য ঠেকলেও ধৈর্য হারান না। নিজে ভাল ফুটবল খেলতেন ছোট থেকেই। রাজ্য স্তরের ফুটবলে পুরুলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাত জেগে ফলো করেন লা লিগা, ইপিএল-এর প্রতিটা ম্যাচ। মাঠটার প্রতিটা অর্ধ-কে যে তিনটে ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়, ডিফেন্ডিং থার্ড, মিডল থার্ড আর অ্যাটাকিং থার্ড, এই কর্মকর্তার থেকে জানতে হবে?

—মোটামুটি জানি দাদা। তবে আপনার যা এক্সপিরিয়েন্স, আমরা তো নেহাতই বাচ্চা। বেনসনের একটা ছবি পাওয়া যাবে? মানে রেজিস্ট্রেশনের সময় ছবি তো দিতে হয়, সেখান থেকেই যদি... আর ঠিকানাটা...

—রেজিস্টার থেকে যা ছবি বেরয়, খুবই অস্পষ্ট। মুখাবয়ব পরিষ্কার করে বোঝার উপায় নেই। ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে, ওয়াইএমসিএ হস্টেল, ধর্মতলা।

তবে ওই হস্টেলে না-ও পেতে পারেন। এরা কলকাতায় এসে সবাই ওখানেই প্রথমে ওঠে। তারপর একটু পয়সাকড়ি হাতে পেলে হয় একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে নেয়। নয়তো 'পেয়িং গেস্ট' হয়ে থাকতে শুরু করে কোথাও।

—কিন্তু যোগাযোগ করব কী ভাবে? ধরুন ওয়াইএমসিএ—তে যদি না পাই...

কর্মকর্তা ভদ্রলোক এক মিনিট ভাবেন। সৌম্যর চোখমুখ দেখে বোধহয় একটু মায়াই হয়।

—সেক্ষেত্রে একটাই রাস্তা। মিল্টনদা।

—মিল্টনদা?

—হ্যাঁ, ময়দানের পুরনো লোক। মাঠই ধ্যানজ্ঞান। অফ সিজনে খেপ কে কোথায় খেলছে, কে কোথায় খেলবে, পুরোটা জানে। কন্ট্রোল করে। বাটা গ্রাউন্ডে সকাল থেকে পাবেন রোজ।

সঙ্গী অফিসারকে নিয়ে মিল্টনদার কাছে পৌঁছে গেলেন সৌম্য পরদিন সকালে। বেনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন, আশ্বস্ত করলেন মিল্টন। দরদাম নিয়েও কথা হয়ে গেল।

—আপনি যখন বলছেন গোলটা ভাল চেনে, তখন না হয় পাঁচই দেব। ফাইনালটা জিততেই হবে যেভাবে হোক।

—আমি যখন বলছি মানে? পরশু একটা খেপ খেলতে যাবে। ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখে নেবেন।

—কোথায় খেলা পরশু?

—হাওড়ায়। সাঁতরাগাছি পেরিয়ে।

সাঁতরাগাছি পেরিয়ে আরও বেশ কিছুটা। জায়গার নাম উনসানি। বেরতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল সৌম্য আর তাঁর সঙ্গীদের। তার উপর একটা গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়ে সাঁতরাগাছি ব্রিজ নট নড়নচড়ন। যখন গাড়ি গিয়ে মাঠের কাছাকাছি পৌঁছল, সেকেন্ড হাফ শেষ হতে বাকি মিনিট দশেক। ১-১। ম্যাচ শেষ হল ৩-১ স্কোরলাইনে। বেনসন দুটো গোল করল একাই। একটা হেডে। একটা গোলার মতো শটে। শেষ মুহূর্তে একটা শট বারে না লাগলে হ্যাটট্রিক হয়ে যায়। মিল্টন ভুল বলেননি। খেপ খেলায় এই বেনসনকে ম্যাচ পিছু পাঁচ হাজার দেওয়াই যায়।

টিমের বেশিরভাগ প্লেয়ার বাসে করে রওনা দিল কলকাতা। বেনসন চড়ে বসল একটা মারুতি ৮০০ গাড়ির পিছনের সিটে। খেপ-তারকার জন্য আলাদা ট্রিটমেন্ট। দ্বিতীয় হুগলি সেতু ধরে ছুটল মারুতি। পিছনে সামান্য দূরত্বে সৌম্যদের সাদা অ্যাম্বাসাডর।

বেনসনের গাড়ি যখন থামল তিলজলা এলাকার একটা একতলা ফ্ল্যাটের সামনে, সন্ধে নেমেছে কলকাতায়। সেই যে ফ্ল্যাটে ঢুকল, পরের দিন দুপুর অবধি বেরলই না বেনসন। নজরদারি চালু হল অষ্টপ্রহর। দেখা গেল রুটিন বলতে একটা মোটরবাইকে করে সকালে ময়দানে প্র্যাকটিসে যাওয়া আর মধ্য কলকাতার সদর স্ট্রিটে একটা ফ্ল্যাটে পেয়িং গেস্ট হিসেবে বসবাস। মাঝেমধ্যে নিশিযাপন তিলজলায় ওই ফ্ল্যাটে।

কার ফ্ল্যাট? লিন্ডা স্যামুয়েলস। মধ্য তিরিশের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতী। সুন্দরী, বিবাহবিচ্ছিন্না। এক ছেলে, নাম সেবাস্তিয়ান। পড়ে মধ্য কলকাতার এক নামী কনভেন্ট স্কুলে। ক্লাস নাইন। লিন্ডা কাজ করেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক স্টিল কোম্পানির অফিসে। রিসেপশনিস্ট। বেনসন ছাড়াও দু'-একজন নাইজেরিয়ান যুবক মাঝেমাঝে আসে। এক কি দু'দিন থাকে। তারপর চলে যায়। এক মাঝবয়সি নাইজেরীয় অবশ্য মাস দুয়েক অন্তর অন্তর আসেন। আর এলে থাকেন অন্তত দু'সপ্তাহ। এক-দু'দিনের জন্য নয়।

অতঃকিম? বেনসনের খোঁজ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে হদিশ মিলেছে মণিময়েরও। নজরদারিতে থাকা সোর্স খবর দিয়েছে, মণিময়কে দেখা গেছে মল্লিকবাজারে এক প্রৌঢ়ের দোকানে কিছুক্ষণ কাটাতে। কার দোকান? মহাবীর আগরওয়াল, মণিময়ের বাবা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মহাবীরের দুটো বিয়ে। থাকেন আলিপুরে। মণিময় দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সন্তান। এবং এলাকায় এই বয়সেই চিটিংবাজ হিসেবে দুর্নাম কুড়িয়েছে। মোবাইল নম্বর? পাওয়া গেল। ফোন বন্ধ। শেষ টাওয়ার লোকেশন হরিদ্বার। বেশ, ঘাপটি মেরে আছে। থাক। আজ নয় কাল, ফিরতে তো হবেই কলকাতায়। যাবে কোথায়?

অঙ্কুশের কী খবর? মানিকতলার বাড়ি থেকে বেরচ্ছেই না প্রায়। লিন্ডার গতিবিধিতেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। বেনসনও আছে নিজের মতো।

লিন্ডার বাড়িতে রেইড করে লাভ নেই। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার একাধিক নাইজেরীয় বন্ধু থাকতেই পারে। তারা লিন্ডার ফ্ল্যাটে রাত কাটাতেই পারে। তাতে কী প্রমাণ হল? আসল ব্যাপার তো কার্ড স্কিমিং এবং তার নেপথ্যের চক্র। সেই চক্রের সঙ্গে এই বিদেশিদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। সে থাকতেই পারে। কিন্তু আন্দাজের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে উলটো ফলই হবে। চক্রের চাঁই যে বা যারা, সে বা তারা সাবধান হয়ে যাবে।

আরেকটা মুশকিল, লিন্ডা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। ২০১০ সালে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা মহিলার মোবাইল ফোন নেই, ভাবাই যায় না। কেন নেই? মোবাইল না নেওয়ার পিছনে কোনও বিশেষ কারণ? কারণ সে যা-ই হোক, এই বেনসন-টেনসনের মতো নাইজেরীয় বন্ধুরা যোগাযোগ করে কী করে লিন্ডার সঙ্গে? ল্যান্ডফোন? রেকর্ড দেখা হল। সন্দেহজনক কিছু নেই।

একটাই রাস্তা পড়ে থাকে যোগাযোগের। ই-মেল। লিন্ডার অফিস থেকে ই-মেল আইডি জোগাড় করতে অসুবিধে হল না। এবার জানা দরকার কার কার সঙ্গে কী কী মেল চালাচালি হয়। জানার উপায়? হ্যাকিং। তদন্তের প্রয়োজনে ততদিনে ‘ethical hacking’ শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা সহ দেশের সর্বত্র। কয়েকজন তুখোড় হ্যাকারের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ ছিলই। যাঁদের একজন লিন্ডার পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করলেন মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে।

আজকের দিনে পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে আমি-আপনি অনেক সচেতন। সবাই জানি আমরা, অক্ষর-সংখ্যা-গাণিতিক চিহ্ন মিলিয়ে-টিলিয়ে একটা ভজঘট পাসওয়ার্ড তৈরি করা জরুরি। যেটা সহজে ভেদ করা যাবে না। সবাই জানেন, নিয়মিত পাসওয়ার্ড বদলানো দরকার। কিন্তু এ মামলা যখনকার, তখন সাইবার-সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতার মাত্রা ছিল অনেক কম।

লিন্ডাও ওই অসচেতনদের দলে পড়তেন। নিজের জন্মতারিখটা উলটে দিলে যা দাঁড়ায়, সেটা পাসওয়ার্ড হিসেবে রেখেছিলেন। যে তারিখটা লিন্ডার অফিস থেকে জানা হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দাদের। ‘চিচিংফাঁক’ হয়ে গেল লিন্ডার মেল।

গত কয়েক মাসের মেল ঘেঁটে বোঝা গেল, লিন্ডা পুরো ব্যাপারটা না-ই জানতে পারেন, কিন্তু তাঁর ফ্ল্যাটে যারা যাওয়া-আসা করে, তারা ধোয়া তুলসীপাতা নয়। পিটার বলে একজন প্রায়ই লিন্ডাকে নির্দেশ পাঠায় ই-মেলে। অমুক কাল কলকাতায় এক রাতের জন্য থেকে পরের দিন বাংলাদেশ যাবে, তাকে তোমার ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়ো। তমুকের দিল্লিতে কিছু পুলিশি সমস্যা হয়েছে, আগামীকাল কলকাতায় যাবে। তোমার ফ্ল্যাটে রাতটা থাকবে। এইসব।

পিটার

পিটারের মেলগুলোর প্রযুক্তিগত কাটাছেঁড়া করে জানা গেল, পাঠানো হয়েছে বিদেশ থেকে। কোন দেশ? নাইজেরিয়া!

হলই বা নাইজেরিয়া, কিন্তু জালিয়াতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ? হয় কিছু প্রমাণ ছাড়া? হতাশ লাগছিল সৌম্যর। তা হলে কি এরা অন্য কোনও ধরনের বেআইনি কাজে যুক্ত? কার্ড স্কিমিং-এ নয়? কিন্তু আপাতত হাতে তো অন্য কোনও লিডও নেই, যে অন্য কোনও গ্যাং-এর খোঁজখবর করা যাবে। এ যা অবস্থা, শুধু পেনাল্টি বক্সের বাইরে পাসের দেওয়া-নেওয়াই চলছে। গোলের মুখ আর খোলা যাচ্ছে কই?

গোলের মুখ খোলার সামান্যতম আভাস মিলল দিনকয়েক পর। রোজই পিটার-লিন্ডার মেল চালাচালিতে চোখ রাখতেন সৌম্য। এক রাতে নিয়মমাফিক ‘হাই-হ্যালো-লাভ ইউ ডিয়ার’-এর পাশাপাশি পিটারের তরফে একটা মেল, ‘Please keep Mr.Stanley Rodrigues safe.’

মানে? Stanley Rodrigues-টা আবার কে? এ তো নতুন মোচড় তদন্তে। যাকে বলে, ‘কাহানি মে

টুইস্ট'! কে স্ট্যানলি? সেই মাঝবয়সি, যে দু'মাস অন্তর আসে আর লিন্ডার ফ্ল্যাটে থাকে বেশ কিছুদিন? তা হলে স্ট্যানলিই কি নাটের গুরু? লিন্ডাকে মেল করে স্ট্যানলিকে 'সেফ' রাখতে বলছে কেন পিটার? 'সেফ' রাখার প্রয়োজন পড়ছে কেন? কী সম্পর্ক স্ট্যানলির সঙ্গে পিটারের? রাখতেই যদি হয়, স্ট্যানলিকে কোথায় 'সেফ রাখবেন লিন্ডা? এই ফ্ল্যাট ছাড়া অন্য গোপন আস্তানা আছে মহিলার? নজরদারি তো সমানে চলছে। অফিস-বাড়ি আর রোববারে চার্চ, এর বাইরে তো কোথাও যান না মহিলা। বেনসন ছাড়া আর যে নাইজেরীয়রা মাঝেমধ্যে লিন্ডার ফ্ল্যাটে আসে, তাদের মধ্যে কারও কথা বলছে? যদি তা-ই হয়, ঝুঁকি নিয়ে লিন্ডার বাড়িতে রেইড করতে হয়। আর করলেও তখন এই স্ট্যানলি থাকবে, কী গ্যারান্টি? বরং খুঁচিয়ে ঘা করলে হয়তো স্ট্যানলি, যাকে পিটার নিরাপদে রাখার নির্দেশ দিয়েছে লিন্ডাকে, আর এ তল্লাট মাড়ালই না। তখন?

'তখন' যে পুরো গ্যাংটাই হাতের বাইরে চলে যেতে পারে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না গোয়েন্দাদের। আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হচ্ছিল। এসব মামলায় 'ডিজিটাল এভিডেন্স' সংগ্রহ না করতে পারলে চার্জশিটটা দাঁড়াবেই না। আর সাইবার-ফুটপ্রিন্টস মুছে ফেলতে আর কতক্ষণ? সাবধানে পা ফেলা ছাড়া উপায় কী?

স্ট্যানলির খোঁজে ফের যাওয়া হল আইএফএ অফিসে। এই নামে কোনও নাইজেরীয় ফুটবলার আছে? নেই। নাইজেরীয় দূতাবাসে নেওয়া হল খোঁজখবর। এই নামের কেউ ভারতে এসেছেন সম্প্রতি? কোনও রেকর্ড আছে? পাওয়া গেল না। শহরের যেখানে যেখানে নাইজেরীয়দের বেশি দেখা যায়, সোর্স লাগানো হল সেখানে। স্ট্যানলি নামের কারও খোঁজ পেলেই যেন খবর পাওয়া যায়। সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, খবর এল না কিছু।

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবং ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির আরও টুকটাক অভিযোগ জমা পড়ছে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। অথচ তদন্তে যা যা করার, সবই তো করা হচ্ছে। মার্চের মাঝামাঝি একদিন কাজ সেরে অফিস থেকে যখন বেরচ্ছেন হতোদ্যম সৌম্য, রাতের লালবাজার শুনশান। বোসপুকুরে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছতে পৌঁছতে মাঝরাত হয়ে গেল সৌম্যর। ড্রয়িংরুমের সেন্টারটেবিলে 'ফেলুদাসমগ্র' রাখা। একমাত্র কন্যা ক্লাস সিক্সে পড়ে। গোয়েন্দাগল্পের পোকা। ফেলুদা বলতে অজ্ঞান। অবশ্য কে নয়? সময়-সুযোগ পেলে সৌম্য নিজেই পঞ্চাশবার পড়া ফেলুদা-কাহিনি আবার নিয়ে বসে যান পাতা উলটোতে। বইটায় বুকমার্ক দিয়ে শুতে গেছে মেয়ে। সৌম্য হাতে তুলে নেন। শোবার আগে 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' পড়ছিল। গল্পটার নাম শুনলেই অবধারিত মনে পড়ে যায় কালীকিঙ্করবাবুর সেই টিয়ার কথা, 'ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো'। সিন্দুকের কম্বিনেশন লকের কোড। ফেলুদার মগজাস্ত্র যে কোডের রহস্যভেদ করেছিল, 'থ্রি নাইন জিরো থ্রি নাইন এইট টু জিরো!'

ঘুম আসতে দেরি হবে আজ। মাথায় ঘুরছে Mr Stanley Rodriges। ফেলুদার বই রেখে দিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলেন সৌম্য। মগজাস্ত্রের প্রয়োগ যদি করা যেত ফেলু মিত্তিরের মতো! বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় উঠে পড়েন। কম্পিউটার খুলে বসেন। শূন্য থেকে শুরু করা যাক। কার্ড স্কিমিং-এর জালিয়াতি বিশ্বের কোথায় কোথায় কীভাবে হয়েছে, কীভাবে সমাধান হয়েছে, লিঙ্কগুলো আবার দেখা যাক। যদি দিশা পাওয়া যায় কিছু।

গুগল নিমেষে লিঙ্ক ভাসিয়ে দিল অসংখ্য। সৌম্য চোখ বোলাচ্ছিলেন। একটার হেডিং, 'All you need to know about MSR'। এটা আগেও পড়েছিলেন। MSR, অর্থাৎ 'Magnetic Stripe Readers'। দেখতে থাকেন সাব-হেডিং, "how to keep your card safe from MSR".. 'Magnetic Stripe Reader, a device used to read magnetic stripe cards such as credit cards.'

একবার পড়েন, দু'বার পড়েন। বারবার তিনবার পড়েন। তৃতীয় বারের পড়ায় শুধু দুটো শব্দে চোখ চুম্বকের মতো আটকে যায়। 'Safe' আর 'MSR'। কেন চোখ সরছে না? কেন স্নায়ু আচমকাই চঞ্চল হয়ে

উঠছে? কেন মস্তিষ্কে উত্তেজক তরঙ্গ টের পাচ্ছেন হঠাৎ?

সংকেত? কোড? 'ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন' -এর মতো? M ফর Mr, S ফর Stanley, R ফর Rodrigues? MSR? যাকে 'safe' রাখতে সাংকেতিক নির্দেশ পাঠিয়েছে পিটার? হতেই হবে.. এটা কোডই ... কোড না হয়ে যায় না... Magnetic Stripe Reader? এ ছাড়া আর কোনও সম্ভাবনা পড়ে থাকে না। সৌম্য বুঝতে পারেন, রাতে ঘুম আসবেই না আর। ফোনে ধরেন ওসি ব্যাংক ফ্রড-কে, 'স্যার, Mr. Stanley Rodrigues...!'

লিন্ডার বাড়িতে এখন 'রেইড' করাটা মূর্খামি হবে, সিদ্ধান্ত হল সর্বসম্মত। MSR পাওয়া গেলেও পিটারকে আর পাওয়া যাবে না। দিন পনেরোর মধ্যেই যে কলকাতায় আসবে বলে লিন্ডাকে জানিয়েছে মেলে। ঘটনার বিশ্লেষণ করে যা বোঝা যাচ্ছে, পিটার অন্যতম নাটের গুরু। এখন আছে নাইজেরিয়ায়। লিন্ডার ভাড়ার ফ্ল্যাটটা তার কলকাতার আস্তানা। বেনসন-মণিময়-অঙ্কুশরা, যেমন ভাবা গিয়েছিল, স্রেফ চুনোপুঁটি স্তরের শাগরেদ।

অপেক্ষা করা শুরু হল পিটারের শহরে আসার। বেনসনের খেলাধুলো আর লিন্ডার বাড়ি আসা-যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই চলছে। অঙ্কুশও আর আগের মতো ঘরবন্দি থাকছে না। এবং যেমন ভাবা হয়েছিল, পুলিশি খোঁজখবর একটু থিতিয়ে যেতেই কলকাতায় ফিরে এসেছে মণিময়। মেট্রোপ্লাজার একতলার একটা রেডিমেড কাপড়ের দোকানে বসছে নিয়মিত। এদের ধরা তো জলভাত। ঠিক সময়ে তুলে নেওয়া যাবে।

অবশেষে লিন্ডার ইনবক্সে ঢুকল কাঙ্ক্ষিত বার্তা। 'Sweetheart, arriving tomorrow...'। লাগোস থেকে দুবাই হয়ে কলকাতায় আসছে পিটার। এমিরেটস-এর ফ্লাইটে।

তিনটে টিম করা হল। একটা যাবে এয়ারপোর্টে, পিটারকে ধরতে। একটা কিড স্ট্রিটের ডেরা থেকে বেনসনকে তুলবে। আর তৃতীয় দলের দায়িত্ব থাকবে অঙ্কুশ-মণিময়কে তুলে আনার।

এর পরের ঘটনাপ্রবাহ শুরুর অনুচ্ছেদে লিখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরনোর পর লিন্ডা পিটারকে জড়িয়ে ধরা মাত্র ঘিরে ধরলেন অফিসাররা।

—ইয়োর গেম ইজ় আপ...

—হোয়াট? হোয়াট গেম আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? আই ডোন্ট গেট দিস...

স্বীকারোক্তি আদায়ে বিশেষ অসুবিধে হল না। লিন্ডা আর পিটারকে একসঙ্গে বসিয়ে মেল চালাচালির প্রিন্ট আউটগুলো মেলে ধরা হল সামনে। তার আগেই পিটারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন নামের গোছা গোছা কার্ড। পিটার-লিন্ডা কবুল করলেন দ্রুত, হ্যাঁ, Mr. Stanley Rodrigues আসলে 'Magnetic Stripe Reader'—এর সংকেতই। লিন্ডার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল টিম, আলমারির মধ্যে থেকে উদ্ধার হল MSR 205 মেশিনটি। যা দিয়ে তৈরি করা হত জাল কার্ড।

বেনসনের কাছ থেকেও পাওয়া গেল বেশ কয়েক গোছা জাল কার্ড। এবং তার পাসপোর্টটা ভাল করে দেখার পর বোঝা গেল, ভারতে থাকার ভিসার কাগজটাও জাল।

পিটারের ব্যাগ থেকে একটা ল্যাপটপ পাওয়া গেল। সেটা বাজেয়াপ্ত করার আগে ডেটা কপি করে নেওয়া হল একটা হার্ড ডিস্কে। ডিস্কটার আদ্যোপান্ত ঘেঁটে দেখা গেল, পিটার মার্কিন নাগরিকদের কার্ডের তথ্য পেত একটা মেল আইডি থেকে। man-t-2@yahoo.com। কথাবার্তা হত yahoo messenger-এ।

কে এই man-t-2? পিটার জানাল, man-t-2-র নাম জেমস। নাইজেরীয়, ভারতেই থাকে। একসময় আমেরিকাতে ছিল। মার্কিন বন্ধুবান্ধব আছে বেশ কিছু। তা হলে আসল লোক পিটার নয়, জেমস?

জেমস

Yahoo Messenger-এর লগ ডিটেলস নিয়ে বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে বোঝা গেল, জেমসের বর্তমান অবস্থান পুনেতে। ভোঁসারি থানার অন্তর্গত গণেশওয়াড়ি নামের এক জায়গায়। অতএব চলো পুনে।

গণেশওয়াড়ি। মহল্লার আয়তন ছোট নয় খুব একটা। দিনভর এলাকা চষে ফেললেন সৌম্য এবং সহযোগী অফিসাররা। দোকানে-পাড়ায়-রকের আড্ডায় স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে জানার চেষ্টা করলেন, কালো চামড়ার লোক থাকে নাকি আশেপাশে? সন্ধের দিকে এক চায়ের দোকানের মালিকের কাছে হদিশ মিলল।

—আপনারা কি কালো ইংরেজদের কথা জিজ্ঞেস করছেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, গায়ের চামড়া কালো, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলে? জানেন?

—হ্যাঁ, কালো ইংরেজ থাকে একটা বাড়িতে। এই রাস্তাটা ধরে সোজা গিয়ে একটা মোড় পড়বে, সেখান থেকে বাঁ দিকে...

—একটু দেখিয়ে দিন না প্লিজ... সেই কলকাতা থেকে এসেছি।

দেখিয়ে দিলেন চা-দোকানি। সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য যোগাযোগ করলেন ভোঁসারি থানায়। 'রেইড' করা হল প্রায় মাঝরাতে। বেল বাজানোর পর দরজা খুললেন স্কার্ট-টপ পরিহিতা এক তরুণী। ভারতীয়। যিনি কিছু বোঝার আগেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল পুলিশ। এবং দু'কামরার ছিমছাম ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরে আবিষ্কার করল এক নাইজেরীয় তরুণকে। টি-শার্ট আর শর্টস পরে একমনে ঝুঁকে ল্যাপটপের স্ক্রিনে।

পিঠে হাত পড়তে মুখ তুলে তাকালেন তরুণ। সৌম্য সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'How is life James?'

—I am not James. Myself Christopher.

—And who is she?

—She's Noa. Lives in Chennai. We are going to be married soon and shall leave for Dubai.

পাসপোর্ট দেখালেন যুবক। নাম সত্যিই ক্রিস্টোফার। নোয়া নামক তরুণীকে বিয়ে করে পাড়ি দেওয়ার কথা দুবাই। ভিসাও হয়ে গেছে। কাগজপত্র দেখা হল। মিথ্যে নয়। পাসপোর্ট-ভিসায় গরমিল নেই কোনও। তা হলে?

'জেমস' শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে নোয়ার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল আচমকা, লক্ষ করেছিলেন এক অফিসার। কেন, সেটা বোঝা গেল বসার ঘরে পড়ে থাকা একটা চামড়ার ব্যাগ তল্লাশি করার পরেই। যাতে পাওয়া গেল বেশ কিছু জামাকাপড় আর কিছু ফটো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক মাঝবয়সি নাইজেরীয়কে। এই ক্রিস্টোফারের সঙ্গে কোনও মিল নেই ছবির।

—ফটোর লোকটা কে? এক মহিলা অফিসারের ধমকে নোয়া ভেঙে পড়লেন।

—জেমস। তোমরা যাকে খুঁজছ। Egbe Dakun James Taino। এই ফ্ল্যাটটা ওর ভাড়া করা। ক্রিস্টোফার ওর বন্ধু। ক্রিস্টোফার আর আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে জেমস। আজ বিকেলের ফ্লাইটে মুম্বই হয়ে দিল্লি গেছে। তবে কয়েকদিন পরই ফিরবে। আমরা এর বেশি কিছু জানি না স্যার।

শর্ত দিলেন সৌম্য। দুবাইও যাওয়া হবে, আর বিয়েও ভণ্ডুল হয়ে যাবে না, যদি জেমস এই ফ্ল্যাটে ফেরার পর ওঁরা ফোন করে জানিয়ে দেন কলকাতায়। আপাতত ওঁদের পাসপোর্টগুলো জমা রইল পুলিশের কাছে। জেমসের খবর পেলে পুলিশ আবার আসবে। তখনই ফেরত দেওয়া হবে পাসপোর্ট।

প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না ওঁদের। সৌম্যরা ফিরে এলেন কলকাতায়। ভোঁসারি থানার অফিসাররা নজরদারির ব্যবস্থা করলেন ফ্ল্যাটে।

বহুপ্রতীক্ষিত ফোন এল দিনদশেক পরে। সাতসকালে সৌম্যর মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠল, 'Noa Calling'।

—স্যার, জেমস গত কাল রাতে এসেছে। ঘুমচ্ছে এখন। কাল সকালের ফ্লাইটে আবার মুম্বই চলে যাবে।

মানে দাঁড়াচ্ছে, আজই পৌঁছতে হবে, যে ভাবেই হোক। তদন্তে এমন হয় কখনও কখনও, এক সেকেন্ডও দেরি করা চলে না। যেটা করতে হবে, সেটা তখনই করতে হবে।

করা হল। গোয়েন্দাপ্রধানকে জানানো হল। যাঁর নির্দেশে দুপুরের ফ্লাইটে মুম্বই রওনা দিলেন অফিসারেরা। মুম্বই-পুনে হাইওয়ে ধরে রওনা দিলেন সড়কপথে। যখন গণেশওয়াড়ি পৌঁছনো গেল, ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা ছাড়িয়ে ন'টার পথে রওনা দিয়েছে।

মাঝবয়সি নাইজেরীয়, James Taino, Yahoo messenger-এ চ্যাট করছিলেন ফ্ল্যাটে বসে। আইডি? man-t-2।

ল্যাপটপের দু'-একটা ফোল্ডার এলোমেলো চেক করতেই বেরিয়ে পড়ল অজস্র কার্ডের ডিটেলস। Track-1 এবং Track-2, যেগুলো থাকে কার্ডের পিছনের ম্যাগনেটিক স্ট্রিপের মধ্যে। খালি চোখে যা দেখতে পাওয়ার কথাই নয়। ডেটা বোঝাই হয়ে আছে ল্যাপটপে। যা দিয়ে চলছিল লক্ষ লক্ষ টাকার জালিয়াতি, 'ইধার কা মাল উধার'।

লেনদেনের মেল পিটারের ইনবক্সে

পরের দিন জেমসকে স্থানীয় কোর্টে হাজির করে 'Transit Remand' নিয়ে ফের রওনা দেওয়া। সড়কপথে ফের মুম্বই। সেখান থেকে কলকাতার উড়ান।

অঙ্কুশ-মণিময়-লিন্ডা রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। পুরো ঘটনা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছিলেন বিচারকের সামনে। জানিয়েছিলেন, তাঁরা স্রেফ বোড়ে ছিলেন, জানতেন না কিস্তিমাতের আসল ছক। লিন্ডা অকপটে বলেছিলেন আদালতে, জেমসের সঙ্গে আলাপ মধ্য কলকাতার এক চার্চে। জড়িয়ে পড়েছিলেন গভীর সম্পর্কে। যা বলতেন জেমস, অন্ধের মতো মেনে চলতেন।

জেমসের থেকে পাওয়া গেল আমেরিকা-প্রবাসী দুই নাইজেরীয় বন্ধুর খুঁটিনাটি। যারা সরবরাহ করত কার্ডের তথ্য। এবং জেমস ভারতে বসে লোপাট করে দিত লক্ষ লক্ষ টাকা। ভাগবাঁটোয়ারা হত অনলাইনে। FBI (ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন)-এ বিস্তারিত জানিয়ে মেল করে দেওয়া হল লালবাজারের তরফে।

তিন বছর লেগেছিল বিচারপর্ব শেষ হতে। রাজসাক্ষী লিন্ডা-অঙ্কুশ-মণিময়কে সাজা দেননি আদালত। দশ বছরের কারাদণ্ড বরাদ্দ হয়েছিল তিন চক্রীর জন্য। বেনসন-জেমস-পিটার।

শাস্তি যেদিন ঘোষণা হয়েছিল, আদালত থেকে বেরনো মাত্রই ফোনে মেসেজ এসেছিল সৌম্যর। ডিসি ডিডি লিখেছিলেন, 'Well done. The reward of a good job done is to have done it.'

সেই মেসেজ আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন সৌম্য। ভাল কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কী হতে পারে? ভাল কাজটাই তো!

পুনশ্চ: লিন্ডা, অঙ্কুশ এবং মণিময়, তিনটি নাম পরিবর্তিত ওঁদের সামাজিক বিড়ম্বনা এড়াতে।

দ্য পারফেক্ট ক্রাইম

ক্রিং ক্রিং...

কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে যা হয়, মেজাজটা খিঁচড়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের। অনেক রাত অবধি একটা কেস ডায়েরি দেখেছেন। ডাকাতির মামলা। ঘটনার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ধরা পড়ে গিয়েছিল ডাকাতরা। তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে আড়াই মাসের মধ্যেই তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট তৈরি করে ফেলেছেন বিস্তর খেটেখুটে। কাল-পরশুর মধ্যেই জমা পড়বে আদালতে। কোথাও কোনও ফাঁকফোকর যাতে না থাকে, একবার তাই খুঁটিয়ে দেখতেই হত। ফাইলটা বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ডিনারের পরে বসেছিলেন কেসটা নিয়ে। চার্জশিটের খুচরো ভুলগুলো লাল পেনে মার্ক করে যখন শুতে গিয়েছিলেন, ঘড়ির কাঁটা দুটো ছাড়িয়েছে। জমাট ঘুমের মধ্যপথে ছন্দপতন পৌনে পাঁচটা নাগাদ ..ক্রিং ক্রিং..।

কথায় বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়, সে ভাল হোক বা মন্দ। ভোরের স্বপ্নের সত্যি-মিথ্যে জানা নেই। তবে পুলিশের চাকরিতে কাকভোরের ফোন অশনিসংকেতই বয়ে আনে সচরাচর। দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর কেউ ভোরে সিনিয়র অফিসারের ঘুম ভাঙাতে বাধ্য হচ্ছে মানে, অবধারিত কোথাও ডাকাতি, নয়তো খুন। কিংবা দাঙ্গা, বা আরও খারাপ কিছু। ঘুমচোখেই বেডসাইড টেবলে রাখা ফোনের রিসিভারটা তুললেন গোয়েন্দাপ্রধান। অন্য প্রান্ত থেকে যে উদ্বিগ্ন আওয়াজটা ভেসে এল, সেটা দীর্ঘদিনের পরিচিত। ওসি হোমিসাইড।

—নমস্কার স্যার, আবার!

আবার! শুনেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসেন গোয়েন্দাপ্রধান।

—মানে?

—আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের কাছে স্যার.. সিইএসসি-র ট্রান্সফর্মার আছে একটা ...

—কখন হল?

—খবরটা থানায় এসেছে মিনিট দশেক হল, আমি থানার ফোনটা পেয়েই...

—তুমি শিয়োর? আই মিন মোডাস অপারেন্ডি...

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার.. যা শুনলাম .. জাস্ট দ্য সেম..

—হুঁ .. তোমরা বেরও.. পৌঁছও অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল..আসছি।

ফোনটা কেটে দেওয়ার পর মিনিটখানেক থম মেরে বসে থাকেন গোয়েন্দাপ্রধান। আবার? তা হলে যে অস্বস্তিটা কাঁটা হয়ে বিঁধছিল মাসখানেক ধরে, সেটাই সত্যি হল? ইংরেজিতে বলে না.. 'worst fears coming true?'

সিপি-কে এখনই জানানো দরকার। বেরনোর জন্য তৈরি হতে হতেই ফোনে ধরলেন। সিপি শুনলেন এবং একটিই শব্দ খরচ করলেন, ওসি হোমিসাইডের একটু আগের ফোনে 'নমস্কার স্যার'-এর পর যে শব্দটা ছিটকে এসেছিল।

—আবার!

গোয়েন্দাপ্রধানের গাড়ি যখন মৌলালির কাছাকাছি, আলো আলতো আঁচড় কাটতে শুরু করেছে আকাশে। রাত তখন ভোরপ্রবণ।

—স্যার, সুভাষবাবুর পরের সভাটা কখন কোথায়, বলবেন প্লিজ়?

সুদূরতম কল্পনাতেও উলটোদিকের চেয়ারে বসে থাকা মাঝবয়সি লোকটির থেকে এ প্রশ্ন আশা করেননি ওসি হোমিসাইড। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন যুবকের মুখের দিকে। ভুল শুনলেন না তো? জিজ্ঞেস করেন ঠান্ডা গলায়, 'কার সভা?'

উত্তর আসে নির্বিকার।

—সুভাষবাবুর স্যার, নেতাজি সুভাষ।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন গোয়েন্দারা। ইয়ার্কি করছে? লালবাজারে এসে মশকরা করবে, তা-ও হাতেনাতে ধরা পড়ার পর? না কি সেয়ানা পাগলের ভেক ধরেছে মার এড়াতে?

এক অফিসার কলার চেপে ধরেন মাঝবয়সির।

—চ্যাংড়ামি হচ্ছে? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? নেতাজি? সোজাসুজি সবটা খুলে বলুন, একটা একটা করে। আদরযত্ন তো এখনও শুরুই করিনি। শুরু করলে একটা মারও বাইরে পড়বে না, গলগল করে বেরিয়ে আসবে সব। যত্নআত্তি করব, না এমনিই বলবেন? ব্যাটা বলে কিনা সুভাষবাবু!

অবাক হয়ে অফিসাররা লক্ষ করেন, কোনও ভাবান্তর নেই লোকটির। শরীরী নড়াচড়ায় না আছে কোনও উদ্বেগের আভাস, না আতঙ্কের। মৃদু হেসে জবাব দেয় পুলিশি হুমকির, 'হ্যাঁ স্যার, নেতাজি। কী অপূর্ব বললেন আজ! বললেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব! মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। পরের সভাটা কোথায় হবে স্যার?'

ধৈর্য বিপদসীমা অতিক্রম করে ওসি হোমিসাইডের। হাড়মাস কালি হয়ে গেছে এই লোকটার জন্য। চাকরিটাই যেতে বসেছিল প্রায়। আর ধরা পড়ার পর টাইমমেশিনে নেতাজির আমলে ফিরে যাওয়ার অভিনয় করে চলেছে আধঘণ্টা ধরে। এখনই একটি প্রবল চপেটাঘাত প্রয়োজন। এমন একটি বিরাশি সিক্কা, যা দ্রুত বর্তমানে ফিরিয়ে আনবে শ্রীমানকে।

থাপ্পড়টা অসমাপ্তই থেকে যায় গোয়েন্দাপ্রধানের হন্তদন্ত আবির্ভাবে। যিনি খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন পড়িমরি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ওসি, 'আসুন স্যার.. বসুন..।'

বসেন না গোয়েন্দাপ্রধান। একদৃষ্টে স্থির তাকিয়ে থাকেন চেয়ারে বসা স্মিতহাস্য লোকটির দিকে। এই লোকটা? এ-ই স্টোনম্যান? যে শুধু লালবাজার নয়, পুরো শহরের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গত ন'মাস ধরে? শান্তভাবে প্রশ্ন করেন মাঝবয়সিকে, 'কী নাম আপনার?'

ফিরে দেখা সেই মামলাকে, প্রায় তিন দশক পেরিয়েও যা নিয়ে আমজনতার ঔৎসুক্যের পারদ কণামাত্র নিম্নগামী হয়নি, কৌতূহলের তীব্রতার নিরিখে যা কলকাতা পুলিশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসে আজও তর্কাতীত শীর্ষবাছাই।

১৯৮৯-এর চৌঠা জুনের সাতসকাল। হেয়ার স্ট্রিট থানার ডিউটি অফিসার ফোনটা ধরলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন, দিনটা খারাপ ভাবে শুরু হতে যাচ্ছে। খুন হয়ে গেছে একটা। কোথায়? লালবাজারের নাকের ডগায়।

'নাকের ডগা' বলতে বিবাদী বাগের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা। মধ্যতিরিশের মহিলা পড়ে আছেন প্রাণহীন। গভীর ক্ষতচিহ্ন মৃতার মাথার ডান দিকে। মাথার পাশেই পড়ে রয়েছে একটা বড় পাথর। যাতে রক্তের লাল-কালচে ছিটে জানান দিচ্ছে, খুনির হাতিয়ার ছিল ওই পাথরটাই। যার ওজন প্রায় সাড়ে নয় কেজির মতো। ফরেনসিক পরীক্ষা ছাড়াই বোঝা যাচ্ছিল সাদা চোখে, একেবারে কাছ থেকে খুনি পাথরটা আছড়ে ফেলেছে মহিলার মাথায়। অত ভারী পাথর মাথায় সজোরে আঘাত করলে যা হয়, ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু এসেছে অনিবার্য। ডাক্তারি পরিভাষায়, 'Death was due to the effects of injuries, ante-mortem and homicidal in nature.'

মৃতার পরিচয়? আলেয়া বিবি, ফুটপাথবাসিনী। স্থায়ী আস্তানা বলতে কিছু ছিল না। স্বামী মোহন সাউয়ের খুচরো বিক্রিবাটার কাজে টুকটাক সাহায্য করতেন। রাস্তাতেই দম্পতির দিন গুজরান, রাস্তাতেই নিশিযাপন। রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়েছিলেন রোজকার মতো। ভোরে আবিষ্কৃত হল মৃতদেহ। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানাল, খুনটা হয়েছে রাত চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। শরীরের অন্য কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, চিহ্ন নেই কোনওরকম বলপ্রয়োগের। মৃতা তিন মাসের সন্তানসম্ভবা ছিলেন।

কে খুনটা করল-র থেকেও 'কেন করল'-টাই ধন্দে ফেলল হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দাদের। মোহন সাউ স্ত্রী আলেয়াকে নিয়ে বিহারের দ্বারভাঙা থেকে জীবিকার খোঁজে কলকাতায় এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। দিন আনি দিন খাই-এর চালচুলোহীন সংসার। ঠিকানা ফুটপাথ। আলেয়াকে খুন করে অর্থলাভের সম্ভাবনা শূন্য। মোটিভ হিসাবে অন্য যে সম্ভাবনাটা মাথায় আসবেই, যৌন-ঈর্ষা? স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্কে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবজনিত টানাপোড়েন? খোঁজখবর নেওয়া হল যতটা তলিয়ে সম্ভব, কিন্তু মোহন-আলেয়ার সম্পর্কে ন্যূনতম অশান্তি-অস্থিরতার আঁচ পাওয়া গেল না। তা হলে?

'তা হলে?'-র উত্তর অমিলই থাকল প্রায় মাসদেড়েক। তার পরেও যে ধাঁধার জবাব পাওয়া গেল, এমন নয়। বরং ঘটল উলটোটা। ১৯ জুলাইয়ের রাত রাতারাতি অন্য মাত্রা দিল পঁয়তাল্লিশ দিন আগের আলেয়া-হত্যাকে, যাকে স্রেফ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করার বিলাসিতা আর রইল না লালবাজারের। থাকবেই বা কী করে? এবার তো জোড়া খুন!

প্রথমটা তালতলা থানা এলাকায়। জিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র উত্তরমুখী গেটের অদূরে, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে ঢোকার সিঁড়ির মুখে। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের নিথর রক্তাক্ত দেহটা ছ'টা-সোয়া ছ'টা নাগাদ নজরে আসে পথচারীদের। ছেঁড়াখোঁড়া জামাপ্যান্ট, শীর্ণ চেহারায় অপুষ্টির ছাপ প্রকট। মাথার ডান দিকটা তীব্র আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে প্রায়। যা দিয়ে আঘাত, সেটা পড়ে আছে মাথার পাশে। পাথর, প্রমাণ সাইজের। ওজন? তা কুড়ি কেজি তো হবেই।

গোয়েন্দারা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছবি তুলছেন নিহতের, ওসি হোমিসাইড যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দ্রুত ফরেনসিক পরীক্ষার আয়োজনে, কন্ট্রোল রুম মারফত ওয়ারলেস বার্তা এল, 'সাসপেকটেড মার্ডার ইন মুচিপাড়া পিএস এরিয়া... নিয়ার শিয়ালদা স্টেশন সাবওয়ে... ভিকটিম আ টিনএজার ..।'

গোয়েন্দাপ্রধান কিংবা নগরপাল স্বয়ং, সকাল-সকাল জোড়া খুনের খবরে বিচলিত হননি কেউই। গড়পড়তা পুলিশি রোজনামচার মাঝে হয় কখনও কখনও এমন। আসে, এমন এক-একটা দিন আসে, কোনও এক অদৃশ্য ষড়যন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে যাবতীয় খারাপ যেন একসঙ্গে ঘটতে থাকে।

বিচলিত হওয়ার কারণ ঘটল ওসি মুচিপাড়ার বার্তায়, 'স্যার.. বাচ্চা ছেলে ... বয়স এই চোদ্দো-পনেরো হবে .. আইডেন্টিটি এস্ট্যাব্লিশড হয়নি এখনও... যেটুক পাচ্ছি, স্টেশনের ফুটপাথে থাকত .. ভিক্ষে করত ... হেড ইনজুরি মাথার বাঁ দিকে.. একটা বড় পাথর দিয়ে মাথায় মারা হয়েছে .. পাথরটায় ব্লাড স্টেইনস আছে...।'

মানে? আবার পাথর? দুটো খুনই পাথর দিয়ে মাথায় মেরে? দুটোই ফুটপাথে? আলেয়া বিবির খুনের মোডাস অপারেন্ডির সঙ্গে হুবহু মিল? তা হলে কি ..? কী-কেন তো পরে, ঘটনার ঘনঘটায় গোয়েন্দারা দিব্যি বুঝতে পারছিলেন নির্যাস— 'নিশ্চিন্ত আর থাকা গেল না রে তোপসে!'

আধঘণ্টার মধ্যে ফের বার্তাবাহকের ভূমিকায় কন্ট্রোল রুম, 'সিপি ডিজায়ার্স টু মিট ডিসি ডিডি অ্যান্ড অফিসার্স অফ দ্য হোমিসাইড স্কোয়াড অ্যাট টেন ইন দ্য লালবাজার কনফারেন্স রুম। ডিসি সেন্ট্রাল শ্যাল অলসো রিমেইন প্রেজেন্ট উইথ দ্য ওসি-জ় অফ তালতলা, মুচিপাড়া অ্যান্ড হেয়ার স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনস।'

ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে তিনটে খুন নিয়েই কাটাছেঁড়া করলেন নগরপাল। অফিসারদের প্রত্যেকের মতামত জানতে চাইলেন। শুনলেন ধৈর্য ধরে। অল্পসময়ের ব্যবধানে একই ধাঁচের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে যা আশু জরুরি হয়ে ওঠে, আলোচনা হল তা নিয়েই।

এক, ‘ডিটেকশন’। ঘটে যাওয়া খুনগুলোর কিনারা করা যত দ্রুত সম্ভব। দুই, ‘প্রিভেনশন’। যতক্ষণ না সমাধানসূত্র পাওয়া যাচ্ছে, একই ধরনের খুন আর ঘটতে না দেওয়া।

সিপি এবং ডিসি ডিডি তো বটেই, অন্য অফিসাররাও টের পাচ্ছিলেন, আলোচনা করা এক, আর তার সফল প্রয়োগ আরেক। ‘ডিটেকশন’-এর দিক থেকে ভাবলে, আলেয়া বিবির খুনে আপ্রাণ চেষ্টা করেও সামান্যতম ‘লিড’ও অধরা এখনও। তার মধ্যেই এই জোড়া খুন।

নিহত তিন। একজন মহিলা, পুরুষ একজন, তৃতীয়জন নেহাতই কিশোর। মহিলার পরিচয় জানা গেছে। বাকি দু’জনের এখনও নয়। হয়তো জানা যাবে কয়েকদিনের মধ্যে। কিন্তু পরিচয় সে যা-ই হোক, তিনটে খুনেই কমন ফ্যাক্টরগুলো তীব্র অস্বস্তি উৎপন্ন করছে। খুনির হাতিয়ার তিনটে ক্ষেত্রেই পাথর। তিনটে ঘটনারই সময়কাল শেষ রাত থেকে ভোরের মধ্যবর্তী। এবং ‘ভিক্টিম প্রোফাইল’ তিনটে ক্ষেত্রেই সমগোত্রীয়। আততায়ী বেছে নিয়েছে নিরাশ্রয় ফুটপাথবাসী কাউকে। যাদের খুন করে অর্থাগমের সম্ভাবনা নেই কোনও।

পদ্ধতি এক। টার্গেট-চরিত্র এক। আঘাত হানার সময়টাও এক। ‘ক্রাইম প্যাটার্ন’-এ এত যখন মিল, আততায়ীও এক? যদি আশঙ্কাই সত্যি হয়, যদি একই লোক হয়, তা হলেও নাগাল পাওয়ার মতো সূত্র কই? পার্ক স্ট্রিট মেট্রোর কাছে খুন হওয়া মাঝবয়সি এবং শিয়ালদায় নিহত কিশোরের পরিচয় জানতে পারলে দিশা মিলবে কিছু? যোগসূত্র কোনও?

এ তো গেল ‘ডিটেকশন’-এর সাতসতেরো। কিন্তু ‘প্রিভেনশন’? কী করে হবে ‘প্রিভেনশন’? অত সোজা? এ শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, হাজার হাজার মানুষ ফুটপাথে রাত্রিযাপন করেন এখানে-ওখানে-সেখানে। সম্ভব পাহারা দেওয়া?

সংকট যখন চোখ রাঙায়, সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে মাথা ঘামানোর অত সময় থাকে না। অগ্রাধিকার পায় যে ভাবেই হোক মুশকিল আসানের রাস্তা খোঁজা। সিদ্ধান্ত হল, নৈশ নজরদারি বাড়ানো হবে শহরে। তিনটে খুনই হয়েছে সেন্ট্রাল ডিভিশনে, মধ্য কলকাতায়। ঠিক হল, মধ্য কলকাতার সব ওসি নিয়ম করে থাকবেন রাতপাহারায়, চলবে টহলদারি। শুধু গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটেও চালু হবে নৈশ-নজরদারি। শহরের বাকি এলাকার ডিসি-ওসি-দেরও শোনানো হল সতর্কবার্তা, বলা হল রাতের শহরে পুলিশি উপস্থিতি বাড়াতে।

মিটিংয়ের শেষে গোয়েন্দাপ্রধান অর্থাৎ ডিসি ডিডি-কে ঘরে ডেকে নিলেন নগরপাল। কথাচালাচালি হল খানিক।

—কী বুঝছ... খোলাখুলি বলো...

ডিসি ডিডি কয়েক সেকেন্ড ভাবার পর উত্তর দিলেন।

বিবাদী বাগের কাছে নৈশপ্রহরায় পুলিশ

—লুকস কোয়াইট স্ট্রেঞ্জ স্যার ... কোনও কানেক্ট এখনও পাওয়া যাচ্ছে না.. অথচ তিনটে খুনই একই ভাবে ... সিমিলারিটিটা ...

মাঝপথে থামিয়ে দেন নগরপাল।

—সেজন্যই তো বললাম খোলাখুলি বলতে। কী মনে হচ্ছে... সিরিয়াল কিলিং?

উত্তর দেন না গোয়েন্দাপ্রধান। স্রেফ তাকান সিপি-র দিকে। নগরপালও নিরুত্তরই থাকেন।

আশঙ্কা আর উদ্বেগ কবেই বা আর শব্দের তোয়াক্কা করেছে?

আশঙ্কা সত্যি হল আপাদমস্তক, উদ্বেগ ঊর্ধ্বগামী হল মাসখানেকের মধ্যেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খুনে নিহতদের পরিচয় মেলেনি তখনও, অফিসারদের জানকবুল চেষ্টা সত্ত্বেও। চলছে নৈশপ্রহরা পরিকল্পনামাফিক। তবু ২৭ অগস্ট ফের খুন, ফের ফুটপাথ, ফের পাথর! শিয়ালদা ফ্লাইওভার থেকে নেমে সাবওয়ের পথে এবার, টার্গেট এবারও রাস্তায় ঘুমন্ত, হা-ক্লান্ত, আশ্রয়হীন। মধ্যতিরিশের ভবঘুরে ভিক্ষুক।

হননকাল, ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

যে সময়ের কথা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপট তখনও মাথাচাড়া দেয়নি। একচেটিয়া আধিপত্য ছাপার অক্ষরের। লেখালেখি হচ্ছিল বটে তিনটে একই ধাঁচের খুন নিয়ে, কিন্তু উদ্বাহু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপকরণ ছিল না পর্যাপ্ত। যে সমস্যা রইল না একই কায়দায় চতুর্থ খুনের পর। খবরের কাগজ যা যা ছিল শহরে, একযোগে মাঠে নামল। শিরোনামে চলে এল পুলিশি ব্যর্থতা, ফ্রন্ট পেজ দখল করল রাতের শহরের রহস্যময় ঘাতক। একটি জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক লিখলেন, 'Stoneman Strikes Again!'

সেই প্রথম ব্যবহৃত হল 'স্টোনম্যান' শব্দটা। যা সমার্থক হয়ে গেল মামলার সঙ্গে, এবং তার চেয়েও ঢের জরুরি, আতঙ্কের আহ্বায়ক হিসাবে দেখা দিল শহর কলকাতার মননে-মানসে।

লালবাজারে বৈঠক হল ফের। কিন্তু প্রয়োজন হল না মিটিং-শেষে কর্তাদের একান্ত আলাপচারিতার। সত্যিটা তখন পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টার মতো বাজতে শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের 'ভিতর-বাহিরে অন্তরে অন্তরে'।

সিরিয়াল কিলিং! সিরিয়াল কিলার!

স্ট্র্যাটেজি তৈরি হল নতুন করে। 'নতুন' বলতে 'প্রিভেনশন মেকানিজ্‌ম'-কে ঢেলে সাজানো। হাজার চেষ্টাতেও যখন 'ডিটেকশন' এখনও দূর অস্ত, উপায় কি আর? নৈশ প্রহরার জাল আরও বিস্তৃত করা ছাড়া আর কী-ই বা এই পরিস্থিতিতে করণীয়?

'করণীয়'-র তালিকার সংক্ষিপ্তসার?

এক, শহরের বিভিন্ন থানার অফিসারদের এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট-এর গোয়েন্দাদের যার যেখানে যা সোর্স আছে, সবাইকে পত্রপাঠ মাঠে নামতে হবে। 'ডিটেকশন'-এর জন্য শহরজুড়ে সোর্স লাগানো হয়েছিল আগেই, লাভ হয়নি। এবার কাজে লাগাতে হবে, 'প্রিভেনশন'-এর জন্যও। সোর্সদের উপর নির্দেশ থাকবে রাত দশটা থেকে ভোর ছ'টা অবধি রাতপাহারার। এলাকা ভাগ করে দেওয়া হবে প্রত্যেককে। হাতে দিয়ে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট এলাকার ম্যাপ। 'নির্দিষ্ট এলাকার ম্যাপ' মানে শহরের যে যে জায়গায় ফুটপাথবাসীদের সম্মিলিত রাত্রিবাস, সেই জায়গাগুলোর হাতে আঁকা ভূগোল। রাস্তায় কাউকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে সোর্স খবর দেবে পুলিশকে। নজরদারিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে মধ্য কলকাতা, যা এখনও পর্যন্ত স্টোনম্যানের বিচরণভূমি।

দুই, সোর্স তো নজরদারির সহায়ক-শক্তি মাত্র, আসল কাজটা তো পুলিশকেই করতে হবে। কী ভাবে? ত্রিমুখী রাতপাহারা, সিদ্ধান্ত নিল লালবাজার। গাড়িতে, পায়ে হেঁটে এবং সাইকেলে। শহরের সমস্ত ওসি এবং এসিপি-দের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল এলাকা। তৈরি হল এলাকাভিত্তিক 'পেট্রোলিং চার্ট'। ফোকাস, ফুটপাথ। কিন্তু কোন ফুটপাথ? ফুটপাথ তো অসংখ্য। 'যত মত তত পথ', আর 'যত পথ তত ফুটপাথ', শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। স্টেশন চত্বর, বাস টার্মিনাস, হাসপাতালের বাইরের রাস্তা, এমন কিছু জায়গায় তবু একত্রে রাত্রিবাস করেন ফুটপাথবাসীরা। কিন্তু তার বাইরেও পড়ে থাকে হাজার হাজার অলিগলি, পড়ে থাকে অগুনতি আনাচকানাচ। সর্বত্র সম্ভব নজরদারি? অসম্ভবকে যতটা সম্ভব করা যায়, ঝাঁপাল কলকাতা পুলিশ। হেঁটে, গাড়িতে, সাইকেলে।

তিন, জিআরপি-র (গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ) সঙ্গে সমন্বয়ে হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে-ভিতরে নৈশপ্রহরায় সামান্যতম ঢিলে দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে শিয়ালদায়। এমন হতেই পারে, ঘাতক আসছে শহরের বাইরে থেকে রেলপথে। কাজ হাসিল করে চম্পট দিচ্ছে রেলপথেই, ভোরের ট্রেনে। কাকভোরের ট্রেনগুলোর যাত্রীদের উপর নজরদারির তীব্রতা থাকতে হবে বিরামহীন।

চার, নজরদারির উপর নজরদারি। প্ল্যানমাফিক প্রহরা চলছে কিনা, তার সরেজমিন তদারকির দায়িত্বে প্রতি রাতে রাস্তায় থাকবেন একজন ডিসি পদমর্যাদার অফিসার। এবং নৈশ অভিযানের খুঁটিনাটি সমন্বয়ের ভার সামলাবেন আরেকজন ডিসি, লালবাজারের কন্ট্রোল রুম থেকে।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা আর হল কই? মুচিপাড়া এলাকায় চতুর্থ খুনটা হয়েছিল ২৭ অগস্ট। তার ঠিক দশদিনের মাথায়, ৬ সেপ্টেম্বর, ফের লালবাজারের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিল স্টোনম্যান। হাওড়া ব্রিজে ওঠার মুখে উত্তরদিকের ফুটপাথে অজ্ঞাতপরিচয় বছর পঁয়ত্রিশের যুবক খুন। চেহারা ভবঘুরে প্রকৃতির, মাথায় বাঁ দিকটা থেঁতলানো প্রায় কুড়ি কেজি ওজনের পাথরের আঘাতে। যে পাথরটা, অন্য খুনগুলোর মতোই, পড়ে মৃতদেহের পাশে। দেহ আবিষ্কৃত হল ভোরের দিকে। ময়নাতদন্ত জানাল, হত্যার সময় রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে।

পঞ্চম খুনের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই খুন নম্বর ছয় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ৮ সেপ্টেম্বর। ঘটনাস্থল এবার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে, লালবাজার থেকে বড়জোর সাত-আটশো মিটার দূরত্বে। নিহত দৃশ্যতই ভিক্ষে করে জীবিকানির্বাহ করতেন। বয়স তিরিশের কোঠায়। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনই, তবু লিপিবদ্ধ থাক তথ্যের স্বার্থে, খুন একই কায়দায়, খুনির হাতিয়ারও একই। পাথর।

শহর জুড়ে ততদিনে ত্রাসের নাম স্টোনম্যান। আতঙ্কের ঠিকানা ফুটপাথ। খবরের কাগজ না হয় ছেড়েই দিলাম, পথেঘাটে-বাসে-ট্রামে-পাড়ার রকের সান্ধ্য আড্ডায় চর্চার বিষয় একটাই। স্টোনম্যান। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে আমবাঙালির কথাচালাচালি।যাতে উদ্বেগ যত না,স্বীকার করা ভাল, তার চেয়েও বেশি ধরা পড়ছে রহস্যযাপন, ধরা পড়ছে কিছুটা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' মার্কা মধ্যবিত্ত স্বস্তিও।

—মারছে তো ফুটপাথে শুয়ে থাকা লোককে। মোদ্দা কথা, মাথার উপর ছাদ আছে যাদের, তারা সেফ। তোর-আমার রিস্ক নেই।

—সেলফিশ মিডলক্লাস মাইন্ডসেট একেই বলে! ফুটপাথের লোকগুলো মানুষ নয়? ওদের জীবনের দাম নেই কোনও?

—তা তো বলিনি। স্টোনম্যানের টার্গেট গ্রুপ যে ফুটপাথে রাত কাটানো লোকজন, এতে তো কোনও ডাউট নেই আর। আমি শুধু ভাবছি, একটা লোক খুনের পর খুন করে যাবে এভাবে, আর পুলিশ আঙুল চুষবে, অপেক্ষা করবে পরের খুনটার জন্য?

—কাগজে তো পড়লাম স্পেশ্যাল নাইট পেট্রোলিং শুরু হয়েছে...

—তাতে লাভ তো কিছু হচ্ছে না! খুন তো করেই যাচ্ছে ইচ্ছেমতো। টিকিটাও ছোঁয়া যাচ্ছে না খুনির। লালবাজারের সঙ্গে নাকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তুলনা করা হয়। এই তো নমুনা!

—তা যা বলেছিস! এদের একজন ফেলুদা বা ব্যোমকেশ দরকার, বুঝলি? না হলে কিস্যু হওয়ার নয়।

ছিছিক্কার চলছিল খবরের কাগজেও দিনের পর দিন। 'ছ'টি খুনের পরও অন্ধকারে পুলিশ', 'লালবাজারের জবাবদিহি চাইল মহাকরণ', 'স্টোনম্যানকে ধরতে ল্যাজেগোবরে কলকাতা পুলিশ'... এই জাতীয় হেডিংসংবলিত খবর তখন নিত্যনৈমিত্তিক।

পড়তে-শুনতে খারাপ লাগলেও স্বীকার্য, সমালোচনা প্রাপ্যই ছিল। একটা লোক একই কায়দায় রাতের শহরে খুন করে যাচ্ছে একের পর এক, আর কিস্যু করতে পারছে না কলকাতা পুলিশ, জটিল থেকে জটিলতর মামলার সফল কিনারার জন্য যাদের দেশজোড়া নাম, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' অভিধাপ্রাপ্তি?

অথচ চেষ্টায় তিলমাত্র খামতি ছিল না লালবাজারের। রাতের শহরে একাকী পথচারী দেখলেই পথ আটকে জেরা করছিল পুলিশ। উত্তরে সামান্যতম অসংগতি পেলেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লালবাজারে, চলছিল জিজ্ঞাসাবাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জনাপঞ্চাশ ভবঘুরে প্রকৃতির লোককে আটক করেও তবু সূত্র থাকছিল নাগালের বাইরে। তদন্ত যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আটকে থাকছিল স্থাণুবৎ। পুলিশে ক্রমশ ভরসা হারাচ্ছিল রাতের কলকাতা।

এবং ভরসাহীনতার মরিয়া প্রতিফলন ঘটছিল, দিন যাচ্ছিল যত। পুলিশ যখন পারছে না, নিজেদের সুরক্ষা-বলয় ফুটপাথবাসীরা নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছিলেন যথাসাধ্য। পালা করে চলছিল রাত জাগা। একদল ঘুমোচ্ছিলেন রাত দশটা থেকে দুটো। তখন বাকিরা তাস খেলছিলেন। দুটো থেকে অন্যদের জাগার

পালা, বাকিদের ঘুমের। ভবঘুরে জাতীয় কাউকে দেখলেই রে রে করে তেড়ে যাচ্ছিলেন ওঁরা। চলছিল দেদার চড়থাপ্পড়, ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখে প্রশ্নবাণ এবং কিলঘুসি।

—বল, এত রাতে এখানে কেন?

—বলবে আবার কী, নির্ঘাত এই শালাই স্টোনম্যান! মার ব্যাটাকে!

—হ্যাঁ, মেরে তক্তা করে দি চল...

—কিন্তু পাথরটা কোথায়? বল বল... পাথরটা কোথায় রেখেছিস? না বললে তোর মাথাতেই আজ পাথর ভাঙব।

কত পথচারীকে যে সে-সময় গণপিটুনির হাত থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ, হিসেব নেই। মেরে মুখচোখ ফাটিয়ে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা, ‘বিশ্বাস করুন, আমি স্টোনম্যান নই’-এর আকুল আর্তি উপেক্ষা করেই। খবর পেয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপে প্রাণে বেঁচেছেন একাধিক নিরপরাধ মানুষ। আর ক্ষোভে-বিদ্রুপে-সমালোচনায় জেরবার পুলিশ ভেবেছে প্রতিটি মুহূর্তে, এর শেষ কোথায়? কী আছে শেষে?

রাতের কলকাতার ফুটপাতে তখন পালা করে চলত রাত জাগা

‘শেষ কোথায়’-এর ভাবনার মাঝেই সপ্তম ঘটনা। অকুস্থল, ফের মুচিপাড়া থানা এলাকা। এবার বৈঠকখানা রোড। শিকার এবার তেগা রাই নামের এক অনূর্ধ্ব তিরিশ যুবক। বাড়ি বাড়ি দুধ সরবরাহ করার কাজ করতেন। রাত কাটাতেন ফুটপাথে। রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য পড়ে থাকা তেগাকে যখন পাওয়া গেল রাত তিনটে-সোয়া তিনটে নাগাদ, তখনও প্রাণ আছে দেহে। পাথরের আঘাতে মাথার বাঁ দিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। চুঁইয়ে পড়ে লাল হয়ে গেছে ফতুয়া। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল কলেজে। জ্ঞান তো হারিয়েইছিলেন, প্রাণ হারাতে লাগল আটচল্লিশ ঘণ্টা। সাত নম্বর খুন।

প্রথমটা ৪ জুন। জোড়া খুন ১৯ জুলাই। তারপর ২৭ অগস্ট, ৬ সেপ্টেম্বর, ৮ সেপ্টেম্বর, ১১ সেপ্টেম্বর। একশো দিনের মধ্যে একই ‘মোডাস অপারেন্ডি’-তে সাত-সাতটা খুন। হয়নি, কখনও এমনটা হয়নি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে। এতগুলো খুনের পরও ‘লিড’ পেতে ব্যর্থ হয়েছে লালবাজার, এমনটা ঘটেনি কখনও। প্রশ্ন উঠল বিধানসভায়, লোকসভাতেও আলোচিত হল কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের সংবাদমাধ্যমেও জায়গা করে নিল স্টোনম্যান। বিলেতের ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকাতে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হল কলকাতার মধ্যরাতের সিরিয়াল-কিলারকে নিয়ে।

সিরিয়াল-কিলিং। ঠিক কী উপাদানে তৈরি হয় একজন সিরিয়াল-কিলারের অন্তরমহল, সে নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিবিধ গবেষণা হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। কোন ব্যক্তিবিশেষের সিরিয়াল-কিলার হয়ে ওঠার নেপথ্যে কয়েকটি কারণকে সচরাচর নির্দিষ্ট করে থাকেন অপরাধ-বিজ্ঞানীরা।

‘স্টোনম্যান’ সন্দেহে এক ভবঘুরেকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ রাতের শহরে

এক, সম-অনুভূতির অভাব। সহানুভূতির অভাব নয়, অভাব সম-অনুভূতির, পরিভাষায় যাকে আমরা বলি ‘empathy’। মনোজগতে ‘empathy’-র অস্বাভাবিক রকমের অভাব একটা পর্যায়ের পর একজন মানুষকে ‘psychopath’ বা মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে। যে বিকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কার্যকারণহীন নির্বিচার হত্যায়।

দুই, নিজের প্রতি বহির্বিশ্বের কৌতূহল উৎপন্ন করার উদগ্র বাসনা, পরিভাষায় ‘attention-seeking’।এবং নিজেকে যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতাবান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার মরিয়া প্রবণতা। পরিণতি, জন্ম নেয় বিকার। যে বিকারের উৎস সিংহভাগ ক্ষেত্রে নিহিত থাকে সমস্যাক্লিষ্ট শৈশবে-কৈশোরে। গবেষণালব্ধ তথ্য

বলছে, সিরিয়াল কিলারদের অনেকেই নানান যন্ত্রণার শিকার হয়েছে ছোটবেলায়। সে মানসিক হোক বা শারীরিক। কেউ হয়তো ছোট থেকেই সাক্ষী থেকেছে মা-বাবার অশান্ত দাম্পত্যের, সাক্ষী থেকেছে বিচ্ছেদের। কেউ হয়তো প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসাটুকু পায়নি অভিভাবকদের কাছে। কেউ হয়তো আবার শিকার হয়েছে পরিচিত কারও যৌন নির্যাতনের।

তিন, স্রেফ উত্তেজনা আহরণের জন্য খুন। বিজাতীয় আনন্দের জন্য খুন। অন্যকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট করার জন্য খুন। লক্ষ্য যেখানে অন্য কিছু নয়, 'থ্রিল'। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং নিরপরাধ কাউকে যন্ত্রণা দিয়ে শিরা-উপশিরায় বাড়তি অ্যাড্রিনালিনের আমদানি।

আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে 'সিরিয়াল কিলার' বলতেই প্রথম যে নামটা উঠে আসে অবধারিত, 'জ্যাক দ্য রিপার'! যিনি ১৮৮৮ সালে লন্ডনে অন্তত পাঁচজন দেহপসারিণীকে খুন করে শিরোনামে চলে এসেছিলেন রাতারাতি। হইচই পড়ে গিয়েছিল বিশ্বজুড়ে।

নাম আরও করা যায়। যেমন উনিশ শতকের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরপর ন'টা খুন করা H. H. Holmes কিংবা মোটামুটি সমসময়েই ফ্রান্সে ১১ জন মহিলা এবং শিশুকে উপর্যুপরি খুনের নেপথ্যে থাকা সিরিয়াল-ঘাতক Joseph Vacher, যিনি কুখ্যাত হয়েছিলেন 'The French Ripper' নামে।

এ তো গেল বিদেশের কথা। ভারতে? রমন রাঘবের কথা উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে

যাবে এই লেখা। ১৯৬৬ থেকে ৬৮—র মধ্যে মুম্বই শহরতলি এবং পুনেতে দু'দফায় অন্তত পঁয়ত্রিশটা খুনের পর গ্রেফতার হয়েছিল এই রমন রাঘব। প্রতিটি খুনেই শিকার ছিল হয় ফুটপাথবাসী, নয় বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্রতম শ্রেণিভুক্ত কেউ। চূড়ান্ত আতঙ্ক গ্রাস করেছিল বাণিজ্যনগরীকে। ধরা পড়ার পর মনোবিদরা রমনের সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সে সংশোধনের অযোগ্য মনোবিকারগ্রস্ত। মানসিক অসুস্থতার কথা ভেবেই নিম্ন আদালতের ফাঁসির রায় উচ্চতর কোর্টে বদলে গিয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসে।

সিরিয়াল-কিলারের আতঙ্ক ফের মুম্বইয়েই ফিরে এসেছিল আটের দশকের মাঝামাঝি। ১৯৮৩ থেকে '৮৬-র মধ্যে বারোটা খুন হয়েছিল একই কায়দায়। ফুটপাথবাসীদের মাথায় পাথর মেরে। ধরা যায়নি সেই 'স্টোনম্যান'-কেও। এক ডজন খুনের পর আচমকাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিধননাট্য। বারো নম্বরই শেষ।

তা হলে কি সেই 'স্টোনম্যান'-ই আবির্ভূত ফের কলকাতায়? গোয়েন্দা বিভাগের টিম পাড়ি দিল মুম্বইয়ে, তখনকার খুনগুলোর বিষয়ে আলোচনা করতে। এবং এতসবের মধ্যেই সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' দেখতে পেল লালবাজার। রাতের শহরের টহলদারি টিমগুলোর একটা শিয়ালদা স্টেশনের কাছ থেকে আটক করল এক সন্দেহভাজনকে।

সন্দেহভাজন তো প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ আটক হচ্ছিল। এক্ষেত্রে উৎসাহিত হওয়ার কারণ? ভবঘুরে প্রকৃতির লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ঘুরছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের পাশে ইতস্তত। পুলিশ আটকেছিল।

—নাম কী আপনার?

—দুনিয়া মালিক।

—মানে?

—দুনিয়া মালিক। মানে দুনিয়ার মালিক।

—ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? আসল নামটা বলুন।

—নামের আবার আসল-নকল? মা-বাবা নাম রেখেছিল মহম্মদ এক্রাম। কিন্তু ওটা নকল নাম। আসল নাম দুনিয়া মালিক।

—বেশ তো দুনিয়া মালিক, বাড়ি কোথায়? এত রাতে এখানে কেন?

—পুরো দুনিয়াটাই তো আমার বাড়ি। নিজের বাড়িতে ঘুরতে পারব না সাব?

অফিসাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ব্যাটা হয় মাথায়-ছিট আধপাগলা, নয় সাতসেয়ানার ক্যাপ্টেন। আন্দাজে ঢিল ছোড়েন এক সাব-ইনস্পেকটর।

—বেশ, বুঝলাম। রাতে থাকেন কোথায়? ঘুমোন কোথায়?

—ঘুমোই না স্যার, ফুটপাথে ফুটপাথে ঘুরি স্যার। দুনিয়ার মালিকের দুনিয়ায় কত লোকের মাথার ওপর ছাদ নেই, রাতে ঘুরে ঘুরে দেখি।

—ঘুরে ঘুরে দেখেন আর পাথর দিয়ে খুন করে বেড়ান, তাই তো?

ভাবলেশহীন উত্তর আসে।

—আমি দুনিয়ার মালিক। কেন খুন করতে যাব স্যার? তবে ফুটপাথে এইভাবে যারা রাত কাটায়, সেটা কোনও বাঁচা হল স্যার? ইয়ে ভি কোই জিন্দেগি হ্যায়?

—গাড়িতে উঠুন।

ভোররাত থেকে লালবাজারে শুরু হল 'দুনিয়া মালিক'-কে ম্যারাথন জেরা। কথাবার্তা কখনও এলোমেলো, অসংগতিপূর্ণ, কখনও সামান্য হলেও স্বাভাবিক। জানা গেল, বিহারের সীতামারি জেলার বাসিন্দা এই মহম্মদ এক্রাম। কলকাতায় এসেছিলেন বাবার সঙ্গে বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে। বাবা মহম্মদ ঈশা দিনমজুরের কাজ করতেন এদিক-ওদিক। বাবা মারা যাওয়ার পর ভবঘুরে জীবনযাপন। এই লোক স্টোনম্যান?

জেরাপর্ব শেষে নগরপাল বৈঠক সারেন গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে।

—তোমার 'গাট ফিলিং' কী বলছে?

নগরপালের প্রশ্নের জবাবে গোয়েন্দাপ্রধানকে দ্বিধাগ্রস্ত শোনায়।

—কনফেস তো করেনি এখনও। তবে 'ক্লিন চিট' দেওয়ার মতো জায়গাতেও নেই আমরা। আরও ডিটেইলড ইন্টারোগেশন দরকার স্যার......

—সে তো দরকারই। মেন্টালি আনস্টেবল একটু, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু সিরিয়াল কিলারদের 'মেন্টাল ইনস্টেবিলিটি' থাকেই নানা ধরনের। এই যে 'দুনিয়া মালিক' বলছে, একটা 'ইমাজিনড সেন্স অফ পাওয়ার' থেকে বলছে।

—আর সেই 'পাওয়ার' বা ক্ষমতা ফলানোর বোধ থেকেই এভাবে পরের পর খুন....

—অসম্ভব নয়... একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—কিন্তু স্যার... লোকটার চেহারাটা খেয়াল করেছেন?

—হ্যাঁ, আই ওয়াজ় কামিং টু দ্যাট... ওই ল্যাকপেকে চেহারায় পনেরো-কুড়ি কেজি ওজনের পাথর তুলে আছড়ে মারবে... এটা ঠিক...

—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমরা স্টোনম্যান-স্টোনম্যান ভাবছি, আসলে এটা একটা গ্যাং। স্টোনম্যান নয়, 'স্টোনমেন'। একাধিক লোক মিলে প্ল্যান করে কাজটা করছে।

—আমার যদিও মনে হচ্ছে একজনই, তবে তুমি যা বলছ, নট এন্টায়ারলি ইমপসিবল। যা অবস্থা এখন, সব অপশনই মাথায় রেখে এগোতে হবে। যেখানে যেখানে খুনগুলো হয়েছে, তার কাছাকাছি তো কোনও পাথরের স্তূপ ছিল না। যে মেরেছে, পাথরটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বা আগে থেকে কাছেপিঠে এনে রেখেছে।

—ফুটপাথ বলে আরও সমস্যা হচ্ছে স্যার। ধুলোবালি আর 'একস্টারন্যাল এলিমেন্টস'-এ একটা কেসেও কোনও ডেভেলপ করার মতো ফুটপ্রিন্টসও পাওয়া যায়নি। পেলে অন্তত এই 'দুনিয়া মালিকের' সঙ্গে মেলানো যেত। কোথাও কোনও চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না লোকটা।

—যা নেই, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আপাতত এই মহম্মদ এক্রামের একটা 'সাইকোলজিক্যাল এগজ়ামিনেশন' দরকার। মনস্তত্ত্ববিদদের পরামর্শ নেওয়াটাই জরুরি হয়ে পড়ছে।

—রাইট স্যার। কালই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তাতেও কি ডেড শিয়োর হওয়া যাবে... আই মিন... যতক্ষণ না নিজে কনফেস করছে...

—দেখাই যাক... আর মনে রেখো, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'The proof of the pudding is in the eating'... ডেডশিয়োর হওয়ার ওটাই উপায়। এই 'দুনিয়া মালিক'-ই যদি স্টোনম্যান হয়, তা হলে সাত নম্বর খুনটাই লাস্ট খুন। আর হবে না। যদি হয়, বুঝতে হবে, এক্রামকে মিথ্যে সন্দেহ করছি আমরা।

—স্যার...

নগরপালের ঘর থেকে বেরনোর পর গোয়েন্দাপ্রধানের কানে বাজতে থাকে কথাগুলো। এ-ই যদি স্টোনম্যান হয়, তা হলে শেষ খুনটাই 'শেষ'। না হলে বুঝতে হবে...

না হলে যা বুঝতে হবে, সেটাই বোঝা গেল অক্টোবরের ১৯ তারিখ। সপ্তম খুনের এক মাস আট দিন পরে যখন গোয়েন্দাপ্রধানের কাঁচা ঘুমে ছেদ ঘটাল মধ্যরাতের ফোন।

—ক্রিং ক্রিং!!

—নমস্কার স্যার, আবার!

—মানে?

—আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের কাছে স্যার... সিইএসসির ট্রান্সফর্মার আছে একটা...

—তুমি শিয়োর? আই মিন মোডাস অপারেন্ডি...

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার... যা শুনলাম... জাস্ট দা সেম...

—তা হলে আশঙ্কাই সত্যি হল? গত এক মাসের খচখচানিটাই দেখা দিল রূঢ়তম বাস্তব হয়ে? 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া?'

'ফিরিয়া যে এসেছে', মৃতদেহ দেখার পর সন্দেহ ছিল না আর একচিলতেও। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তার ত্র্যহস্পর্শ ফের গ্রাস করল লালবাজারকে। এবার?

তদন্তের বিজ্ঞান বলে, অপরাধীকে ধরতে হলে অপরাধীর মনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করো। এবং ভাবার চেষ্টা করো অপরাধীর মতো করে। কে স্টোনম্যান? 'কে', সেটা পরে হবে। আগে চিন্তা করা দরকার, কী ভাবে?

স্টোনম্যানের ভাবনা কোন খাতে বইছে, সেটা নিয়ে মাথা খাটানো বেশি জরুরি। কীভাবে পুলিশকে, ফুটপাথবাসী রাত-জাগা জনতার চোখে ধুলো দিয়ে নিরীহ মানুষকে মেরে যাচ্ছে লাগাতার? আগে থেকেই জরিপ করে নিচ্ছে, পুলিশ প্রহরা কোথায় কোথায়? তারপর খুঁজে নিচ্ছে নজরদারিহীন নির্জন কোনও ফুটপাথ? এটা বুঝে গেছে, হাজার হাজার ফুটপাথবাসীকে সারারাত পাহারা দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব? সেই মতো শিকার খুঁজে নিচ্ছে? এবং শিকার চিহ্নিত করার পর সম্ভাব্য শিকারের আশেপাশেই কি শুয়ে থাকছে পাথর নিয়ে? আর রাত গভীর হলে আঘাত হানছে নির্মম নৃশংসতায়?

আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা পুলিশ তখন যেভাবে পারল চেষ্টা করল অপরাধীর মনের হদিশ পাওয়ার। এবং ঘটতে থাকল অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড কিছু। স্টোনম্যান মামলার তদন্তের সঙ্গে শুরু থেকে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিলেন, এমন একজন অফিসারের স্মৃতিচারণ তুলে দিলাম।

'তখন পাগল পাগল লাগছিল নিজেদের। যার যা মনে হচ্ছে করছিলাম। রাতের পর রাত জাগছি, ভোরে ফিরছি। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে সারাদিন অফিস করে ফের রাতে বেরিয়ে পড়ছি। মাথা কাজ করছিল না বেশিরভাগ সময়। আট নম্বর খুনের পর এক রাতে যখন টহল দিচ্ছি শিয়ালদা স্টেশন এলাকার আশেপাশের ফুটপাথে, হঠাৎ দেখলাম চাদরমুড়ি দিয়ে একজন মুখ বার করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাকানোটা সন্দেহজনক। আরে এ ব্যাটা জেগে আছে কেন? ওভাবে আশেপাশে তাকাচ্ছেই বা কেন?

আমি করলাম কী, সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম চাদরমুড়ি দেওয়া লোকটার সামনে। চাদরটা টেনে সরিয়ে দিলাম গা থেকে। টর্চ ফেললাম মুখে। 'কে রে তুই?' জিজ্ঞেস করার আগেই থমকে গেলাম চেহারাটা দেখে।

আরে! এ তো বহুদিনের চেনা মুখ। ব্যাচমেট। একই সঙ্গে পুলিশ ট্রেনিং কলেজে কাটিয়েছি এক বছর। তারপর কর্মসূত্রে কলকাতা পুলিশে দীর্ঘদিনের সহকর্মী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এ তো ওসি মুচিপাড়া! এখানে কী করছে?

—কী আর করব বল? আমার এলাকাই তো স্টোনম্যানের বেশি পছন্দ। কী আর করব? শুয়ে আছি ফতুয়া-পায়জামা পরে। যদি ধরতে পারি হাতেনাতে! শুধু আমি নয়, বাঁদিকে চার-পাঁচটা লোকের পরে আমার এক সাব-ইনস্পেকটর শুয়ে আছে।

—এভাবে সারারাত থাকবি?

—উপায় কী আর? চাকরিটা বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করছি আর কী! তবে শুধু আমি নয়। মৌলালিতে যা, দেখবি ওসি এন্টালিও শুয়ে আছে ফুটপাথে।

—অ্যাঁ! সে কী রে!

—আরে ভাই হ্যাঁ! তুইও গিয়ে বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ফুটপাথে অন্যদের সঙ্গে শুয়ে পড়। রাস্তায় ঘুরে তো কিছু হল না, হবেও না আর। তাই স্ট্র্যাটেজি পালটেছি।'

স্ট্র্যাটেজি অবশ্য স্টোনম্যানও পালটে ফেলছিল নিঃশব্দে। চৌঠা জুন থেকে এগারোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাতটা খুন। গড় ধরলে প্রতি দু'সপ্তাহে একটা। মুচিপাড়ায় অষ্টম খুনটা ঘটেছিল সপ্তমের একমাস আটদিন পরে, যখন পুলিশ সামান্য স্বস্তির অবকাশ পেয়েছে, এবং মনে করছে স্টোনম্যান পর্বের হয়তো ইতি।

নয় নম্বর খুনটা করতেও মাসখানেকের বেশিই সময় নিল স্টোনম্যান। নজরদারি আর রাতপাহারা জারি থাকলেও যখন স্বাভাবিক নিয়মেই শৈথিল্য এসেছে কিছুটা, ঠিক তখন, নভেম্বরের ২৬ তারিখ। ফের শিয়ালদা ফ্লাইওভারের সাবওয়েতে, নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে ক্রিকেটবল-ছোড়া দূরত্বে। পাথরের আঘাতে ফের এক বছর চল্লিশের অজ্ঞাতপরিচয় ফুটপাথবাসীর ভবলীলা সাঙ্গ।

ফের শুরু তেড়েফুঁড়ে নজরদারি, এবং এবার দু'মাস কোনও সাড়াশব্দ করল না স্টোনম্যান। নিজের উপস্থিতি জানান দিল বছর পার করে, ১৯৯০-এর ২৯ জানুয়ারি, আচমকা। প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের কাছের ফুটপাথে শায়িতা এক মহিলার মাথা চুরমার হয়ে গেল পাথরের আছড়ানিতে। মৃতার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, নাম শান্তি মান্না। স্বামী মারা গিয়েছেন বেশ কিছুদিন হল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, পেশায় যৌনকর্মী। বেশিরভাগ রাত ফুটপাথেই কাটাতেন।

স্টোনম্যানের ধরা পড়ার আশা তখন প্রায় একরকম ছেড়েই দিয়েছে পুলিশ। মিডিয়াও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পুলিশি ব্যর্থতা নিয়ে নিউজপ্রিন্ট খরচা করতে করতে। 'কে স্টোনম্যান?', 'কেন স্টোনম্যান?' এসব প্রশ্নের থেকে তখন ঢের বেশি কৌতূহল পরের খুনটা নিয়ে। এরপর কবে-কখন-কোথায়?

খুন নম্বর এগারোয় চমকে দিল স্টোনম্যান। প্রথম দশটা খুন হয়েছিল মধ্য কলকাতায়। নজরদারি কেন্দ্রীভূত ছিল বউবাজার-মুচিপাড়া-বড়বাজার-পোস্তা-জোড়াসাঁকো-এন্টালি অঞ্চলে। একাদশতম খুনে নিজের অপরাধ-বৃত্ত বিস্তৃত করল স্টোনম্যান। পা রাখল দক্ষিণ কলকাতায়। দশম খুনের ঠিক একুশ দিন পরে। ২০ ফেব্রুয়ারি।

বেকবাগানের মোড়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের পশ্চিম ফুটপাথে আবিষ্কৃত হল আরেক হতভাগ্যের দেহ। যথারীতি ভারী পাথর দিয়ে মাথাটা থেঁতলানো। নিহতের স্থানীয় নাম 'মাস্তান', বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি। ভিক্ষা করেই দিনযাপন করতেন।

বেকবাগানের খুনের পর ঘটনাস্থল পরীক্ষায় নগরপাল

আগের দশটা খুনের সঙ্গে তফাত বলতে, পদচিহ্ন রেখে গেছে স্টোনম্যান। খুনে ব্যবহৃত পাথরটা পড়ে

ছিল মৃতদেহ থেকে চার গজ দূরে।একটা ড্রেনের মধ্যে। খুনের পরে আততায়ী স্পষ্টতই পাথরটাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং সরানোর সময়ই মৃতের রক্তস্রোতে পা পড়ে। ফুটপ্রিন্টস সংগ্রহ করতে ছুটে এলেন বিশেষজ্ঞরা বাঁ পায়ের ছাপ পাওয়া গেল তিনটে। ডান পায়ের ন'টা। পায়ে জুতো ছিল না। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল খানিক। বাঁ পায়ের তিনটে ছাপ পড়েছে অস্পষ্ট, বাকি মিলিয়ে গেছে। ডান পায়ের ছাপগুলো অক্ষত এবং মোটামুটি 'ডেভেলপযোগ্য'।

বিশেষজ্ঞরা পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দুটো সিদ্ধান্তে এলেন। এক, স্টোনম্যানের চেহারা মাঝারি গড়নের হওয়ারই সম্ভাবনা। খুব লম্বা-চওড়া সম্ভবত নয়। দুই, ঘাতকের ডান পায়ের বুড়ো আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা।

কিন্তু এটুকু 'লিড' আর কতটাই বা কাজে আসবে? ধরা পড়লে তবেই না পায়ের ছাপ মিলিয়ে নিঃসংশয় হওয়ার প্রশ্ন।

দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের পোড়খাওয়া অফিসাররা, অসংখ্য জটিল মামলার সমাধান যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছেন ঈর্ষণীয় পেশাদারি দক্ষতায়। এবং সর্বগ্রাসী হতাশা মনের দখল নিলে একটা পর্যায়ের পর যা স্বাভাবিক, যুক্তি-বুদ্ধিকে লাস্ট বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়ে সামনের সারিতে কেউ কেউ জায়গা দিলেন অন্ধ বিশ্বাসকে।

ওসি হোমিসাইড স্বয়ং ডেকে পাঠালেন এক পরিচিত জ্যোতিষীকে। জানতে চাইলেন, কবে হতে পারে এই যন্ত্রণামুক্তি? কবে ধরা পড়বে স্টোনম্যান? কেমন দেখতে হতে পারে স্টোনম্যান? কেমন হতে পারে চালচলন?

জ্যোতিষী বিস্তর গণনা-টননা করে রায় দিলেন, সুসংবাদ আসন্ন। স্টোনম্যান ধরা পড়বে শীঘ্রই। জানালেন আরও, স্টোনম্যান বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। এমন হাঁটার ধরন যাঁদের রাতের শহরে, তাদের চিহ্নিত করতে পারলে রহস্যভেদ নাকি স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

বিচারবুদ্ধিকে বন্ধক রাখলে যা ঘটতে পারে, তার বিবরণী থাকুক এক প্রত্যক্ষদর্শী অফিসারের বয়ানে।

'নিয়মমাফিক সারারাত টহল দিয়ে ফিরছিলাম লালবাজারে। সঙ্গী এক সাব-ইনস্পেকটর আর দুই কনস্টেবল। গাড়ি যখন আকাশবাণী পেরিয়ে এগোচ্ছে রাজভবনকে ডান হাতে রেখে, হঠাৎ সঙ্গী সাব-ইনস্পেকটরের পরিত্রাহি চিৎকারে হতচকিত হয়ে ব্রেক কষল ড্রাইভার। 'আরে, থামান থামান। ওই তো!'

'ওই তো!' মানে? মানে বোঝার আগেই এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিয়েছে তরুণ সহকর্মী, হাইকোর্টের সামনে শরৎ বসুর স্ট্যাচুর দিকে আপ্রাণ দৌড়ে জাপটে ধরেছে একজনকে। যাঁর মাঝারি গড়ন, গায়ে চাদর। এবং যিনি অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে চিলচিৎকার জুড়েছেন, 'বাঁচাও, মার ডালা......!'

কী হল ব্যাপারটা? গাড়ি থেকে নেমে আমরাও ছুটলাম। কাছে গিয়ে দেখি, তরুণ সাব-ইনস্পেকটরের চোখেমুখে উত্তেজনা ঠিকরে বেরচ্ছে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলছে, 'পেয়েছি স্যার! এই ব্যাটাই স্টোনম্যান! কেমন বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল! আমি ঠিক খেয়াল করেছি। বারে বারে ঘুঘু তুমি...'

থামিয়ে দিয়ে বকের মতো পা ফেলে হাঁটা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। এঁকে তো চিনি!

পোদ্দার কোর্টের কাছে একটা হার্ডওয়ারের দোকান চালান এই অবাঙালি ভদ্রলোক। নিতান্ত নিরীহ মানুষ। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দোষের মধ্যে, একটু লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটেন। বকের মতো।

ক্ষমা-টমা চেয়ে যখন ভদ্রলোককে বিদায় করছি চা খাইয়ে, তখনও তরুণ সহকর্মীর চোখেমুখে অবিশ্বাসের জ্যামিতি। এ-ও নয়?'

এ তো নয়ই, এখনও পর্যন্ত সন্দেহের বশে আটক হওয়া কেউই যে নয়, প্রমাণ মিলল বারো নম্বর খুনে। যেটা ঘটল এগারো নম্বরের ঠিক পাঁচদিন পরে, ২৬ ফেব্রুয়ারি। এবং এবার সমস্ত হিসেব উলটে দিয়ে ঘটনাস্থল তৃতীয় এবং নবম খুনের ঘটনাস্থলের গা ঘেঁষেই, শিয়ালদা ফ্লাইওভারের সাবওয়ের কাছে। ফের মুচিপাড়া থানা এলাকায়। একই জায়গায় সাধারণত বারবার আঘাত হানে না সিরিয়াল কিলাররা। সেই

ট্র্যাডিশন বদলে দিল স্টোনম্যান। নিহত এবার এক পনেরো-ষোলোর হতভাগ্য কিশোর, যার পেশা বলতে ছিল স্টেশন-চত্বরে ভিক্ষাবৃত্তি। খুনের সময় মধ্যরাতের কিছু পরে। পদ্ধতি এক। খুনের অস্ত্রও এক। মৃতদেহের কয়েক হাত দূরে পড়ে থাকা রক্তলাল পাথর।

দুঃসময় চললে যা হয়, উটকো উপদ্রবেরও শেষ ছিল না তখন। এক রাতে হেস্টিংস থানা এলাকায় যেমন রাত আড়াইটে নাগদ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার মুখে এক যুবককে বসে থাকতে দেখল 'পেট্রোলিং টিম'। বয়স তিরিশের নীচে। পরে আছেন দামি টি-শার্ট, ব্র্যান্ডেড জিন্স্। সুদর্শন চেহারা। সঙ্গে একটা ব্যাগ।

—এখানে কেন? এত রাতে কী করছেন?

—স্টোনম্যান-কে ধরতে বেরিয়েছি। সপ্তাহে অন্তত দুটো রাতে নিয়মিত বেরই। ইউ ক্যান কল মি 'stoneman catcher'.

বোঝো! স্টোনম্যানকে ধরতেই নাকানিচোবানির একশেষ। তার উপর স্টোনম্যানকে ধরতে বেরনো শখের গোয়েন্দাদেরও ধরতে হলে তো দুর্গতির বত্রিশকলা পূর্ণ। যুবকের সঙ্গের ব্যাগে পাওয়া গেল স্টিফেন হকিংয়ের 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'। এ ছাড়াও নাইলনের দড়ি-ক্ষুর-ছুরি, রুল, চওড়া বেল্ট এবং আরও কিছু ওষুধ টুকিটাকি।এগুলো কেন?

—বাহ্! স্টোনম্যানকে ধরতে গেলে এগুলো লাগবে না? তা ছাড়া স্টোনম্যানের আক্রমণে আহত কারও চিকিৎসাতেও তো লাগতে পারে।

কী আর বলার থাকে এর পর, নাম-ঠিকানা জেনে গাড়িতে তুলে দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা ছাড়া? বাড়িতে গিয়ে জানা গেল, যুবক মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন বেশ কিছুকাল। যুবকের মা-কে হাতজোড় করে হেস্টিংসের ওসি বলে এলেন, 'মাসিমা, আমরা খুবই চাপের মধ্যে আছি। ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাতে বাড়িতেই রাখার চেষ্টা করবেন প্লিজ়।' আর যুবককে দিয়ে এলেন সহৃদয় পরামর্শ, 'আমরা আর একটু চেষ্টা করি স্টোনম্যানকে ধরতে, না পারলে আপনার সাহায্য চাইব, কেমন?'

ন'মাসের মধ্যে এক ডজন খুন। কিনারাসূত্র অধরা। চেষ্টা তো হয়েছে সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে। কী করার থাকতে পারে আর? কিন্তু কে আর শুনতে চায় ব্যর্থ চেষ্টার ইতিবৃত্ত, কে শুনতে চায় 'ভাল খেলিয়াও পরাজিত'-র কষ্টকথা? আসল তো 'ফলেন পরিচয়তে।' পুলিশের কাজ অপরাধীকে ধরা। সেটাই যখন পারছে না ন'মাস ধরে, কার সময় আছে ক্লান্তি-শ্রান্তি-পরিশ্রমের সাতকাহন শোনার?

রাজ্য প্রশাসন যখন পৌঁছে গিয়েছে অস্বস্তির চরমসীমায়, যখন কলকাতা পুলিশের সর্বস্তরে ঢালাও রদবদলের আলোচনা জমাট বাঁধছে রাইটার্সের অন্দরমহলে, তখনই, মার্চের প্রথম সপ্তাহের এক মধ্যরাতে ওসি এন্টালির ওয়ারলেস বার্তা ছড়িয়ে পড়ল লালবাজারের কন্ট্রোল রুম মারফত, 'স্টোনম্যান কট রেড হ্যান্ডেড নিয়ার শিয়ালদা, বিইং ব্রট টু লালবাজার!'

স্টোনম্যান ধরা পড়েছে হাতেনাতে? অবশেষে? বারো পেরিয়ে তেরো নম্বর খুনের বেলায় খেল খতম? আনলাকি থার্টিন?

ফোন পাওয়া মাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে লালবাজার ছুটলেন গোয়েন্দাপ্রধান সহ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সমস্ত অফিসার। জানানো হল সিপি-কে। যিনি জানালেন, যত দ্রুত সম্ভব রওনা দিচ্ছেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছিলেন ওসি হোমিসাইড। গোয়েন্দাপ্রধানকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ওসি, 'আসুন স্যার, বসুন।'

বসেন না গোয়েন্দাপ্রধান। একদৃষ্টে স্থির তাকিয়ে থাকেন চেয়ারে বসা পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই স্মিতহাস্য মাঝারি গড়নের লোকটির দিকে। এ-ই স্টোনম্যান? এই লোকটা? যে শুধু লালবাজার নয়, পুরো শহরের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গত নয় মাসে, সেই জুন থেকে? শান্তভাবে প্রশ্ন করেন গোয়েন্দাপ্রধান।

—কী নাম আপনার?

—কালীপদ দাস।

—বাড়ি কোথায়?

—রায়দিঘি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

—কী করেন?

—রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্যার।

—কোন ডিপার্টমেন্ট?

—ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ।

—পোস্টিং কোথায়?

—রানিবাঁধ, বাঁকুড়া। কিন্তু স্যার, আপনারা আমাকে ধরে এনেছেন কেন? কী করেছি আমি?

আর থাকতে পারেন না ওসি এন্টালি, ডিসি-ডিডি-র জেরার মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠেন উত্তেজিতভাবে, কী করেছেন মানে? জানেন না কী করেছেন, জানেন না কী করতে যাচ্ছিলেন? হাতেনাতে ধরেছি স্যার, আর এখন বলছে কী করেছি...

হাতের ইশারায় ওসি-কে থামান গোয়েন্দাপ্রধান।

—অত উত্তেজনার কিছু নেই। কীভাবে ধরলেন এঁকে?

—স্যার, রোজকার মতো শিয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে টহল দিচ্ছিলাম। ঘুরে দেখছিলাম ফুটপাথগুলো। বৈঠকখানা বাজারের কাছের ফুটপাথে চোখে পড়ে এঁকে। এক মহিলা গোঁ গোঁ করে চিৎকার করছিলেন, আর ঠিক তার পাশে শুয়ে থাকা এই ভদ্রলোক একটা পাথর দিয়ে মারতে যাচ্ছিলেন মহিলার মাথায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরেছি। আর এখন বলছে, কী করেছি?

—পাথরটা কোথায়?

—এই যে স্যার...

একটা প্লাস্টিকের মোড়ক থেকে যেটা বার করলেন ওসি, সেটা পাথর নয়। খুব বেশি হলে একটু বড় সাইজের থান ইট। আগের খুনগুলোয় একটাতেও ইটের ব্যবহার হয়নি। বারোটা খুনেরই অস্ত্র ছিল বড় পাথর, অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি কেজি ওজনের। এই ইট দিয়ে মাথায় মারলে আঘাত লাগবে ঠিকই, কিন্তু প্রাণহানি একেবারেই নিশ্চিত নয়। তা হলে?

ফের জেরা শুরু করেন গোয়েন্দাপ্রধান।

—কলকাতায় কী করতে এসেছিলেন? পোস্টিং তো বললেন রানিবাঁধে। অফিসের কাজে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার... তবে সেটা আসল কারণ নয়।

—তবে?

—ভাষণ শুনতে এসেছিলাম।

—ভাষণ মানে? কার ভাষণ?

—সুভাষবাবুর। ওঁর পরের সভাটা কবে কোথায় বলবেন প্লিজ়?

—সুভাষবাবু মানে?

—সুভাষবাবু স্যার! সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি!

—নেতাজির ভাষণ?

—হ্যাঁ স্যার, শিয়ালদা স্টেশনের সামনে আজ নেতাজির সভা ছিল তো! অনেকদিনের ইচ্ছে, সামনে থেকে ওঁর ভাষণ শুনব। জীবন সার্থক হল আজ স্যার। 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও...... আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব...' শুনতে শুনতে অন্য জগতে চলে যাচ্ছিলাম স্যার। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

—বেশ তো! তা ভাষণ শেষ হওয়ার পর ফিরে গেলেন না কেন? শিয়ালদার ফুটপাথে রাত কাটাবেন বলে ঠিক করে এসেছিলেন?

—না না, তা কেন হবে স্যার? মিটিং শেষই তো হল রাত সাড়ে আটটায়। ট্রেনের গণ্ডগোল ছিল আজ। ফিরতে পারলাম না। ভাবলাম ভোরে ফিরব। রাতটা থেকে যাই রাস্তায়। এদিক-সেদিক ঘুরে ফুটপাথে শুয়ে পড়লাম। সবে ঘুমটা এসেছে, গোঁ গোঁ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি এক মহিলা উঠে বসে আমাকে ঠেলছে। এমন আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে, বাকিরাও জেগে গেল। আমি তখন থামানোর জন্য পাশে পড়ে থাকা ইট তুলে ভয় দেখাচ্ছিলাম, যাতে চুপ করে যায়...

কথার মাঝপথে ফের থামিয়ে দেন ওসি এন্টালি, 'গল্প দিচ্ছে স্যার। মহা শয়তান! নেতাজির ভাষণ শুনতে এসেছিল! ইয়ার্কি মারার জায়গা পায়নি! কানের গোড়ায় দুটো দিলেই...'

ওসি এন্টালির দিকে এবার কড়া দৃষ্টিতে তাকান গোয়েন্দাপ্রধান, 'আপনি থামবেন? আমি কথা বলছি তো!'

কালীপদকে নিয়ে লালবাজার থেকে গাড়ি রওনা দিল শিয়ালদায়, যেখান থেকে ওসি এন্টালি ধরেছিলেন 'হাতেনাতে'। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে উল্কাগতিতে, ওই মাঝরাতেও। 'স্টোনম্যান' ধরা পড়েছে! গোয়েন্দাপ্রধানের নেতৃত্বে যখন টিম পৌঁছল শিয়ালদায়, ভিড় জমে গেছে সাংবাদিকদের। ভিড় জমে গেছে অন্তত শ'তিনেক কৌতূহলী জনতার। কন্ট্রোল রুম থেকে বাড়তি ফোর্স পাঠানো হয়েছে পরিস্থিতি আন্দাজ করে।

তথ্যতালাশে জানা গেল, কালীপদ মিথ্যে বলেননি। সহজেই চিহ্নিত করা গেল সেই মহিলাকে, যাকে মারতে গিয়েছিলেন কালীপদ। স্থানীয়রা জানালেন, বছর তিরিশের ওই মহিলা জন্মাবধি মূক ও বধির। সম্পূর্ণ অচেনা এক পুরুষ পাশে শুয়ে আছেন, এটা হঠাৎ আবিষ্কার করার পর আতঙ্কে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। সেই আওয়াজে অন্য দু'-তিনজনেরও ঘুম ভেঙে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে মিলে গেল কালিপদর বয়ান।

'নেতাজি'-র সভা? সেদিন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সভা সত্যিই ছিল শিয়ালদা চত্বরে। শেষ হয়েছিল রাত আটটার পর। এবং সত্যিই সেদিন যান্ত্রিক গোলযোগে রাত সোয়া এগারোটা অবধি শিয়ালদা লাইনে ট্রেন বন্ধ ছিল।

লোকটা তা হলে গল্প বানাচ্ছে না? স্রেফ মনোবিকার গ্রস্ত? ভোরেই দুটো টিম রওনা দিল রায়দিঘিতে কালীপদর বাড়িতে এবং রানিবাঁধের অফিসে। বিস্তর খোঁজখবর করে যা জানা গেল, এরকম।

যখন যুবক, সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, তখন থেকেই মাথার ব্যামো দেখা দিয়েছিল কালীপদর। কখনও একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করতেন, কখনও আবার চলে যেতেন অন্য দুনিয়ায়। 'হ্যালুশিনেশনস' হত, টাইমমেশিনে পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে কখনও ভাবতেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য, কখনও বা বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনানী।

ডাক্তারবদ্যি দেখিয়েছিলেন বাড়ির লোকেরা। উন্নতি হয়নি বিশেষ। অফিসে হয়তো এক সপ্তাহ মন দিয়ে কাজ করলেন আর পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে, হঠাৎ পরের সপ্তাহে কাউকে কিছু না বলে দুম করে চলে গেলেন কলকাতা বা অন্য কোথাও। বাড়ির এবং অফিসের লোকেরা ক্রমে মানিয়ে নিয়েছিলেন এই খ্যাপাটে স্বভাবের সঙ্গে।

অফিসের হাজিরাখাতা খুঁটিয়ে দেখা হল গত ন'মাসের। খোঁজ নেওয়া হল গ্রামের বাড়িতেও, খুনগুলোর সঙ্গে দিন মিলিয়ে মিলিয়ে। এবং দেখা গেল, আগের খুনগুলোর দিন হয় অফিস করেছিলেন, নয় বাড়িতে ছিলেন। কোনওভাবেই কলকাতায় আসার সম্ভাবনা ছিল না।

আরও নিঃসংশয় হতে নেওয়া হল পায়ের ছাপ। মিলল না বেকবাগানের খুনের জায়গার থেকে সংগৃহীত ফুটপ্রিন্টের সঙ্গে। না, ইনি নন। স্টোনম্যান অধরাই।

এবং অধরাই রয়ে গেল কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে দগদগে ক্ষতচিহ্ন রেখে। তেরো নম্বর খুনটা আর হয়নি, কে জানে কীভাবে, হঠাৎই থেমে গিয়েছিল রাতের সিরিয়াল-কিলিং। 'স্টোনম্যান' কে, সেই রহস্যকে রহস্যাবৃতই রেখে।

কে ছিল স্টোনম্যান? ধরতে পারিনি আমরা। জানতে পারিনি আমরা। যেমন জানতে পারিনি, 'স্টোনম্যান' না 'স্টোনমেন'? এক, না একাধিক? একক বিকার, না কোন চক্রের অঙ্গুলিহেলন? তবে স্বাভাবিক বুদ্ধি যা বলে, তার সঙ্গেই সহমত ছিলেন তদন্তকারী অফিসারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'স্টোনম্যান' একজনই ছিল। খুনগুলো করে মনোবিকার চরিতার্থ করা ছাড়া কোনওরকম জাগতিক লাভ হয়নি ঘাতকের। একাধিক সদস্যবিশিষ্ট কোনও চক্রের জড়িত থাকার সম্ভাবনা এই জাতীয় সিরিয়াল-হত্যায় ক্ষীণতমই।

বলা হয়, অপরাধী সে যতই ক্ষুরধার মস্তিষ্কের হোক না কেন, হোক না যতই ধুরন্ধর, কিছু না কিছু চিহ্ন ছেড়ে যায়ই কোথাও না কোথাও, যা মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায় ভবিষ্যতে, আইন যার উপর ভর দিয়ে পৌঁছে যায় অপরাধীর দোরগোড়ায়। বলা হয়, 'পারফেক্ট ক্রাইম' বলে নাকি কিছু হয় না। ভুল। হয়, পারফেক্ট ক্রাইমও হয়।

স্টোনম্যান জানিয়েছিল।

পরিশিষ্ট ১
বিভিন্ন মামলার তদন্তকারী অফিসার

১। **ডক্টর জেকিল, না মিস্টার হাইড?**

রোশনলাল মামলা

একাধিক অফিসার যুক্ত ছিলেন। প্রাপ্ত নথি থেকে নিশ্চিতভাবে যাঁদের নাম জানা যায় না।

২। **মেলাবেন তিনি মেলাবেন**

উদয় সিং হত্যা

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়েন্দাবিভাগের সহ নগরপাল। ২০০৪ সালে ভারত সরকারের প্রদত্ত 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল'-এ সম্মানিত। ২০০৯ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'প্রশংসা পদক'। কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রশংসনীয় দক্ষতার জন্য 'রাষ্ট্রপতি পদক' পেয়েছেন ২০১৭ সালে।

৩। **'দরজা ভাঙলেই গুলি করব!'**

আকুঞ্জি মামলা

বিমল সাহা, অবসরপ্রাপ্ত সহ নগরপাল। যথাক্রমে ১৯৯৮ এবং ২০০৮ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল' এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত পদক।

আমিনুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সহ নগরপাল, ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল'।

রাম থাপা, বর্তমানে বড়তলা থানার ওসি, ২০০৪ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত 'সেবা পদক'।

তরুণকুমার দে, ইনস্পেকটর। গোয়েন্দাবিভাগ।

ইন্দ্রনীল চৌধুরী, বর্তমানে হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি। ২০০৪ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'সেবা পদক', ২০১৮ সালে সম্মানিত হয়েছেন ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল'-এ।

শাকিলুর রহমান, স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে সহ নগরপাল হিসাবে কর্মরত।

তপন সাহা, পোর্ট ডিভিশনে সহ নগরপাল পদে কর্মরত।

৪। **শরীর, শুধু শরীর?**

লীনা সেন হত্যা

বৈদ্যনাথ সাহা, উপনগরপাল, ষষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনী। ২০১৩ সালে ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল'-এ সম্মানিত।

৫। **এ কাহিনির শিরোনাম হয় না**

বীরেশ পোদ্দার মামলা

পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য, ইনস্পেকটর, গোয়েন্দাবিভাগ।

৬। **ফেলুদাং শরণং গচ্ছামি**

ললিতা গোয়েঙ্কা হত্যা

আশিক আমেদ, ওসি, মেটিয়াবুরুজ।

৭। **বিপুলা এ পৃথিবীর যতটুকু জানি**

বিনোদ বর্মণ হত্যা

সুশান্ত ধর, সহ নগরপাল, গোয়েন্দাবিভাগ। ২০০৪ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল'। ২০১১ সালে সম্মানিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'প্রশংসা পদক'-এ।

৮। **আংটি, তবে বাদশাহি নয়**

শ্যামপ্রসাদ রায় হত্যা

শুভজিৎ সেন, মেট্রো রেল পুলিশের ওসি।

৯। **বিশ্বাসই বিশ্বাসঘাতক**

মঞ্জু ঘোষাল হত্যা

মলয় দত্ত, সাব-ইনস্পেকটর, গোয়েন্দাবিভাগ। ২০১৬ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত 'সেবা পদক'।

১০। **ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন**

কার্ড ক্লোনিং মামলা

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়বাজার থানার ওসি। ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত 'প্রশংসা পদক'-এ সম্মানিত। ২০১৪ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল'।

১১। **দ্য পারফেক্ট ক্রাইম**

স্টোনম্যান

বারোটি মামলায় একাধিক তদন্তকারী অফিসার ছিলেন।

নির্দেশিকা